শায়খুল ইসলাম জাস্টিস আল্লামা
মুফতী তাকী উসমানী

Contents

শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী [দা. বা.]

ইসলাহী খুতুবাত

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মাদ উমায়ের কোব্বাদী

উস্তাযুল হাদীস ওয়াত্‌তাফসীর মাদরাসা দারুর রাশাদ
মিরপুর, ঢাকা।
খতীব বাইতুল ফালাহ্ জামে মসজিদ
মধ্যমণিপুর, মিরপুর ঢাকা।

সূচিপত্র

অর্থনীতির আধুনিক জিজ্ঞাসা

Contents

কুরআনের মর্যাদা

আত্মার বিভিন্ন ব্যাধি এবং আত্মিক চিকিৎসকের প্রয়োজনীয়তা

Contents

Contents

দুনিয়ার ভালোবাসায় মত্ত হয়ো না

Contents

অর্থ-সম্পদের নামই কি দুনিয়া?

মিথ্যা এবং বর্তমানে তার ব্যাপক রূপ

Contents

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের প্রচলিত দৃষ্টান্ত

Contents

খিয়ানত ও তার প্রচলিত রূপ

সমাজ সংস্কার পদ্ধতি

Contents

বড়দের মান্য করা এবং ভদ্রতার দাবি

Contents

ব্যবসায় দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ই রয়েছে

বিয়ের খুতবার তাৎপর্য

Contents

অর্থনীতির আধুনিক জিজ্ঞাসা

"অর্থনীতি ইসলামী শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ইসলামী শিক্ষার এ দিকটি বিস্তৃত, ইসলামী ফিক্বহ মন্থন করলেই আপনি তা অনুধাবন করতে পারবেন। যদি ইসলামী ফিক্বহের কোন গ্রন্থকে ভাগ করা হয়, তাহলে দু'ভাগই থাকবে অর্থসংক্রান্ত। কিন্তু সর্বদা মনে রাখতে হবে, ইসলামে অর্থনীতির গুরুত্ব থাকলেও এটা ইসলামের মূল বিষয় নয়। যেমন অন্যান্য মতবাদে অর্থনীতিই হচ্ছে মূল বিষয়, ইসলামে কিন্তু তেমন নয়। ইসলামের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি হলো, মানুষ পার্থিব জগতে বাস করলেও আসল ঠিকানা তার পার্থিবজগত নয়। বরং পার্থিবজগত হলো আসল ঠিকানায় পৌঁছার একটি সিঁড়ি—একটি স্টেশন। চলার পথে এ স্টেশনটিতে সবটুকু শক্তি—সামর্থ্য শেষ করে দেয়া ইসলামের মেযাজ পরিপন্থি।"

অর্থনীতির আধুনিক জিজ্ঞাসা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأَمِيْنِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ وَعَلٰى كُلِّ مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ۔ أَمَّا بَعْدُ

فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيْشَتَهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا۔

মুহতারাম সভাপতি ও সম্মানিত সুধী!

আজকের সেমিনারের আলোচ্য বিষয় 'ইসলাম ও অর্থনীতির আধুনিক জিজ্ঞাসা'। বিষয়টি সম্পর্কে আলোকপাত করার জন্য আমি না-চিজ আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি। এ সুবাদে কিছু মৌলিক কথা আপনাদেরকে শোনাব।

বিষয়টি মূলত বিস্তৃত ও ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। যার জন্য এক ঘন্টার আলোচনাও যথেষ্ট নয়। বরং 'যথেষ্ট নয়' শব্দটিও এখানে যেন যথেষ্ট নয়। তাই ভূমিকার পেছনে না পড়ে সরাসরি আলোচনা শুরু করার ইচ্ছা রাখি যেন এ অল্প সময়ে বিষয়টি সম্পর্কে কিছু ধারণা আপনাদেরকে দিতে পারি। বিষয়টি এতই ব্যাখ্যাসাপেক্ষ যে, এক ঘন্টা কেন, এক সেমিনারেও এর হক আদায় করা সম্ভব নয়। বিশাল বিশাল গ্রন্থ এ বিষয়ে রচিত হয়েছে এবং আরো হচ্ছে। তাই শুধু একটি সেমিনার আলোচনার হক পূরণ করতে পারবে কিনা সন্দেহ।

অর্থনীতির আধুনিক জিজ্ঞাসা এতটা ব্যাপ্তিময় ও শাখা-প্রশাখাপূর্ণ যে, কেবল তার একটি মাত্র দিক নিয়ে আলোচনা করাটাও একটা সমস্যা। তাই শাখা-প্রশাখার প্রতি আপাতত দৃষ্টি না দিয়েও সর্বপ্রথম ইসলামী অর্থনীতির মৌলিক কিছু দিক সম্পর্কে আলোকপাত করতে চাই। কারণ, আনুষঙ্গিক

বিষয়সমূহ- যার কিছুটা বিবরণের প্রতি ডা. আখতার সাঈদ ইঙ্গিতও করেছেন- অস্তিত্বমান হয় মূল বিষয়ের উপর। আনুসঙ্গিক বিষয়গুলোর প্রতিটি দিক মূল বিষয়ের সঙ্গে অবশ্যই সম্পর্কযুক্ত। সমাধান খুঁজতে হলে মূলের উপর ভিত্তি করেই এগুতে হবে।

তাই সর্বপ্রথম আমাদেরকে ইসলামী জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখতে হবে। জানতে হবে ইসলামী জীবনব্যবস্থার পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য এবং অন্যান্য জীবন ব্যবস্থার বিপরীতে ইসলামী জীবনব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব। এ বিষয়টি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেয়া ছাড়া ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কে আলোচনা করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। তাই আমি প্রথমে ইসলাম ও অন্যান্য মতবাদের তুলনামূলক পর্যালোচনা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। আল্লাহ আমাকে সাহায্য করুন এবং সংক্ষিপ্ত সময়ে সঠিক কথাগুলো বলার তাওফীক দান করুন। আমীন।

ইসলাম একটি জীবনব্যবস্থা

'অর্থব্যবস্থা' শব্দটি বর্তমান সময়ের এক বহুল আলোচিত শব্দ। ইসলামের দাবি হলো, ইসলাম কেবল একটি অর্থব্যবস্থাই নয়; বরং পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থাও। অন্যান্য অর্থব্যবস্থার দাবি যেরূপ শুধুই মুখরোচক ও অন্তসারশূন্য, ইসলামের দাবি সেরকম কিছু নয়। বরং ইসলামের দাবি সম্পূর্ণ বাস্তব ও যুক্তিপূর্ণ। অর্থনীতি ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাই বলে পুঁজিবাদ ও সমাজবাদের মত ইসলাম কেবল অর্থনীতির নাম নয়। তাই আমরা যখন ইসলামী অর্থনীতির আলোচনা করবো অথবা ইসলামী অর্থনীতির ভিত্তিমূল ও আইডিয়া সম্পর্কে আলোচনা করবো, তখন এ আশা করা বোকামি হবে যে, অর্থনীতির বর্ণনা কুরআন-সুন্নাহয় ধারাবাহিকভাবে পাওয়া যাবে, যেভাবে রয়েছে বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ আদম স্মিথ মার্শাল কিং অথবা অন্যান্য বিশেষজ্ঞের বিভিন্ন গ্রন্থে।

আমরা আগেই বলেছি, ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। অর্থনীতি তার একটি ক্ষুদ্রতম অংশ। তার গুরুত্ব ইসলাম দিয়েছে বটে; কিন্তু মূল্য লক্ষ হিসেবে অভিহিত করেনি। এই জন্যই ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কে জানতে হলে সর্বপ্রথম এই খেয়াল রাখতে হবে যে, কুরআন-হাদীসে যদি অর্থনীতির ঐ সকল পরিভাষা ও সূত্র খোঁজ করা হয়, যেসব পরিভাষা ও সূত্র অর্থনীতির সাধারণ

গ্রন্থগুলোতে পাওয়া যায়, তাহলে কুরআন-হাদীসে তা পাওয়া যাবে না। হ্যাঁ, কুরআন-হাদীস অর্থনীতির সেসব মৌলিক বিষয় আলোচনা করেছে, যেগুলোর উপর ভিত্তি করে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি রচনা করা সম্ভব। এ কারণে আমি নিজের রচনা ও বক্তৃতায় ইসলামী অর্থব্যবস্থার স্থলে 'ইসলামের অর্থনীতি শিক্ষা' লিখতে ও বলতে পছন্দ করি। ইসলামের অর্থনীতি শিক্ষার আলোকে অর্থব্যবস্থার কীরূপ পদ্ধতি ও কাঠামো পাই? অর্থনীতির যে কোনো ছাত্রের জন্য এটি এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

জীবিকা জীবনের প্রধান বিষয় নয়

দ্বিতীয়ত, জীবনধারণের তাগিদে জীবিকা উপার্জনের প্রয়োজন অবশ্যই ইসলামী শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ইসলামী শিক্ষার এ দিকটি কতটা বিস্তৃত, তা আপনি ইসলামী ফিক্‌হ অনুসন্ধান করলেই অনুধাবন করতে পারেন। ইসলামী ফিক্‌হের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'হিদায়াহ' এর নাম নিশ্চয় শুনেছেন, চারখণ্ডে যার সমাপ্তি। তন্মধ্যে শেষ দুখণ্ড পুরোটাই জীবিকা বিষক আলোচনায় ভরপুর। এর দ্বারা অনুমান করুন, ইসলামী অর্থনীতির পরিধি কতটা বিস্তৃত। তবে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, অর্থনীতির গুরুত্ব ইসলামে থাকলেও এটি ইসলামের মূল বিষয় নয়। ধর্মহীন জীবনব্যবস্থা সবকিছুকে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণে দেখে। অর্থনীতিই তার মূল বিষয়। পুরো জীবনব্যবস্থার ভিত্ অর্থনৈতিক চিন্তা-চেতনার উপরই রাখা হয়। ইসলাম তার সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্থনীতি ইসলামের স্বীকৃত বিষয়, তার মৌলিক ভিত্তি নয়।

আখেরাতই আসল ঠিকানা

ইসলামের মৌলিক দৃষ্টিকোণ হচ্ছে, মানুষ পার্থিব জগতে বাস করলেও আসল ঠিকানা তার পার্থিব জগত নয়; বরং আসল ঠিকানায় পৌঁছার মাধ্যম মাত্র। এটি মঞ্জিলে মকসুদে যাওয়ার পথে একটি স্টেশন। চলার পথের এই সময়টুকু সুন্দর হওয়া চাই। চলার পথের স্টেশনে সবটুকু শক্তি-সামর্থ নিঃশেষ করে দেয়া ইসলামের মৌলিক নীতিমালার পরিপন্থী।

ইসলাম একদিকে পার্থিব জগতকে 'কল্যাণ' হিসেবে অভিহিত করেছে। যেমন হুযূর (সা.) বলেছেন :

طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ (كنز العمال ٩٢٣١)

"হালাল রুজি অন্বেষণ ফরজের পর আরেকটি ফরজ।" অপরদিকে ইসলামের বক্তব্য হলো, পার্থিবজগত ক্ষণস্থায়ী। ক্ষণস্থায়ী জীবনের জন্য সবকিছু উৎসর্গ করে দেয়া যাবে না। মূল সাধনা হবে চিরস্থায়ী জীবনের জন্য। যে জীবনের নাম আখেরাত। আখেরাতের কামিয়াবিই প্রকৃত কামিয়াবি।

পার্থিব জগতের সর্বোত্তম উপমা

ইসলামের এ দৃষ্টিভঙ্গি একটি সুন্দর উপমার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন মাওলানা রুমি (রহ.)। তিনি বলেন–

اب اندر زیر کشتی پشتی است
اب در کشتی ہلاک کشتی است (مفتاح العلوم شرح مثنوی ج ص ۳۷)

অর্থাৎ– দুনিয়া হলো পানির মতো, আর মানুষের দৃষ্টান্ত পানির কিশতির মতো। যেমনিভাবে পানি ছাড়া নৌকা চলে না, অনুরূপভাবে পার্থিব ধন-সম্পদ ছাড়া, জীবিকা উপার্জন ছাড়া মানুষের জীবন টিকে থাকতে পারে না। তবে এ পানি ততক্ষণ পর্যন্তই কিশতির অনুকূল শক্তি হিসেবে বিবেচিত হবে যতক্ষণ পর্যন্ত তা কিশতির আশপাশে অবস্থান করবে। আর এ পানি যদি কিশতির বাইরে অবস্থান করার পরিবর্তে কিশতির ভিতরে ঢুকে পড়ে, তাহলে এই পানিই হবে তার জন্য কাল। এ পানিই ডুবিয়ে শেষ করে দিবে কিশতিকে। তিনি বলেন, অনুরূপভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত পার্থিব ধন-সম্পদ মানুষের আশপাশে থাকবে, মানুষের প্রয়োজনে কাজে আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এটি 'ফজল' ও 'খায়র' হিসেবে বিবেচিত হবে। কিন্তু যদি পার্থিব সম্পদ হৃদয়ের কিশতি ভেদ করে অন্দরে ঢুকে পড়ে, যদি মানুষ সম্পদের মমতায় জড়িয়ে পড়ে, তাহলে বুঝতে হবে পানি কিশতির ভিতরে ঢুকে পড়েছে। এবার তার ধ্বংস অনিবার্য।

পার্থিব অর্থ-রুজি সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি এরূপ। আমরা তাকে এভাবেই গ্রহণ করতে হবে। পার্থিবজগত অবশ্যই মানুষের উপকারী। কিন্তু শর্ত হলো, তাকে সীমার ভিতরে রাখতে হবে। তাকে গ্রহণ করতে হবে মঞ্জিলে মকসুদে পৌঁছার মাধ্যম হিসেবে– মূল মঞ্জিলে মকসুদ হিসেবে নয়।

পার্থিবজগত সম্পর্কে ইসলামের উপরক্ত দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা দেয়ার পর আমাদেরকে জানতে হবে একটি অর্থনৈতিক মতবাদের মৌলিক বিষয় কি কি। এই মৌলিক বিষয়গুলো আধুনিক কালের অর্থনৈতিক মতবাদসমূহ তথা

পুঁজিবাদ ও সমাজবাদ কিভাবে গ্রহণ করেছে। তৃতীয়ত, ইসলামই সেগুলোর কি সমাধান পেশ করে।

অর্থনীতি

প্রথম প্রশ্ন : অর্থনীতির মৌলিক বিষয়গুলো কি?

অর্থনীতির একজন সাধারণ ছাত্রেরও অজানা নয় যে, অর্থনীতির মৌলিক বিষয় চারটি। এর পূর্বে আমাদের জানতে হবে, আমরা যাকে অর্থনীতি বা Economics বলি আরবিতে তাকে বলা হয় 'ইকতিসাদ'। অভিধান মতে Economics এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, মানুষের নিজের প্রয়োজন স্বাভাবিকভাবে মিটানো। 'স্বাভাবিকত্ব' বা 'যথেষ্টতা' Economics শব্দের মধ্যে রয়েছে। আরবি 'ইকতিসাদ' শব্দটিও ঠিক একই রকম। সুতরাং অর্থনীতির সর্বপ্রথম বক্তব্য হলো মানুষের প্রয়োজন ও চাহিদা অসীম, যার তুলনায় প্রয়োজন পূরণ কিংবা চাহিদা মিটানোর উপকরণ সীমিত। প্রয়োজন ও চাহিদা যদি 'উপকরণের' সমান হতো, তাহলে 'অর্থনীতি'রই প্রয়োজন হতো না। প্রয়োজনের তুলনায় প্রয়োজন মেটানোর উপকরণ যেহেতু কম, তাই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, অসংখ্য প্রয়োজন অল্প উপকরণের মাধ্যমে স্বাভাবিক পন্থায় পূরণ করা হবে কিভাবে? আর এটাই মূলত যে কোন অর্থনীতির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এ ক্ষেত্রে যে কোন অর্থনীতি সর্বপ্রথম মৌলিক চারটি বিষয়কে চিহ্নিত করে।

১.অধিকতর প্রয়োজনসমূহের অগ্রাধিকার (Determination of Priorities)

প্রথম বিষয়, যাকে অর্থনীতির পরিভাষায় 'অধিকতর প্রয়োজনসমূহ চিহ্নিতকরণ' বলা হয় (Determination of Priorities) অর্থাৎ- কজনের নিকট যদি প্রয়োজন ও চাহিদার তুলনায় সেগুলো পূরণের উপকরণে ঘাটতি থাকে, তখন কোন্ প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিবে আর কোন্ প্রয়োজনকে পিছিয়ে দিবে- এটাই অর্থনীতির প্রথম জিজ্ঞাসা। মনে করুন, আমার নিকট পঞ্চাশ টাকা আছে। এই পঞ্চাশ টাকা দিয়ে আমি খাবারের চাহিদা মিটাতে মার্কেট থেকে আটাও কিনতে পারি, বস্ত্রের প্রয়োজনে কাপড়ও কিনতে পারি। কিংবা কোন ফাষ্টফুড দোকানে ঢুকে নাস্তাও করে নিতে পারি, অথবা ফ্রিম দেখেও এ পঞ্চাশ টাকা ব্যয় করতে পারি। কিন্তু উল্লিখিত এ চার-পাঁচটি

প্রয়োজন বা চাহিদার মধ্য থেকে আমি কোনটিকে অগ্রাধিকার দিবো? এ পঞ্চাশ টাকা কোন খাতে ব্যয় হবে? এরই নাম 'অধিকতর প্রয়োজনসমূহ চিহ্নিতকরণ' বা (Determination of Priorities)

এ জিজ্ঞাসাটি যেমনভাবে ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, অনুরূপভাবে একটি দেশ বরং পুরো অর্থনীতির ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য। মনে করুন, একটি দেশের অর্থনৈতিক উপকরণ আসে কয়েকটি উৎস থেকে। প্রাকৃতিক উৎস, খনিজ উৎস কিংবা নগদ উৎস থেকে। এসব উৎস দেশের চাহিদা ও প্রয়োজনের তুলনায় সীমিত। এখন এসব উৎস থেকে উপার্জিত অর্থ আমরা ধান চাষে, গম চাষে কিংবা তামাক চাষে কাজে লাগাতে পারি। এসকল অপশনই (Option) আমাদের সামনে বিদ্যমান। এজন্য যে কোন অর্থনীতির প্রথম জিজ্ঞাসা হলো এসব অপশন থেকে আমরা কোনটিকে অগ্রাধিকার দিব? সর্ব প্রথম কোন খাতে ব্যয় হবে দেশের অর্থ-সম্পদ?

২. উৎসসমূহ বন্টন (Allocation of Resourees)

অর্থনীতির দ্বিতীয় বিষয়টিকে অর্থনীতির পরিভাষায় বলা হয়, উৎসসমূহ বন্টন (Allocation of Resourees) অর্থাৎ- যেসব অর্থউৎস আমাদের হাতে রয়েছে, সে গুলোর কোনটিকে কি পরিমাণে কোন কাজে লাগানো হবে? মনে করুন, আমাদের হাতে রয়েছে চাষাবাদের জমিন, রয়েছে বেশ কয়েকটি কারখানা, আছে জনশক্তি। এখন প্রশ্ন হলো, কি পরিমাণ জমিতে ধান চাষ করা হবে? কি পরিমাণ ভূমিতে তুলা চাষ করা হবে? আর কতটুকুতে গম ফলানো হবে? অর্থনীতির পরিভাষায় এর নাম 'উৎসসমূহের বিভাজন'। অর্থাৎ- যে সব উৎস থেকে অর্থ আসে সেগুলোর কোনটিকে কি কাজে লাগানো হবে, তা বন্টন বা নির্ধারণ করা।

৩. আমদানির বন্টন (Distribution of Income)

অর্থনীতির তৃতীয় বিষয়ের পারিভাষিক নাম 'আমদানির বন্টন'। অর্থাৎ বিভিন্ন খাত থেকে যখন উৎপাদন (Production) শুরু হবে, তখন ওসব উৎপাদিত বস্তুকে কিভাবে সমাজ ও সোসাইটিতে বন্টন করা হবে? একেই বলা হয়, 'আমদানির বা আয়ের বন্টন'। তথা (Distribution of Income)

৪. উন্নয়ন বা প্রবৃদ্ধি (Development)

অর্থনীতির চতুর্থ বিষয় হলো 'উন্নয়ন' বা প্রবৃদ্ধি (Development)। অর্থাৎ- অর্থনৈতিক উৎসসমূহ কিভাবে বৃদ্ধি করা যাবে? যেমন যেসব উৎপাদিত পণ্য আমরা পাচ্ছি, সেগুলোর গুণগতমানের উন্নয়ন এবং উৎপাদন বৃদ্ধিকরণের প্রক্রিয়া আরো অগ্রসর হতে পারে। পাশাপাশি যেন নতুন আবিষ্কার ও উৎপাদন উদ্ভাবন করা যায়। জীবনোপকরণের মান যেন আরো সমৃদ্ধি লাভ করে।

উক্ত চারটি জিনিস হলো অর্থনীতির মূল বিষয়। যেকোন অর্থনীতিকে এ চারটি বিষয়ের মুখোমুখি হতে হয়। এ চারটি বিষয় চিহ্নিতকরণের পর এবার দেখা যাক, বর্তমানের অর্থনৈতিক মতবাদগুলো এগুলোর সমাধান কিভাবে দিয়েছে? তারপরেই অনুধাবন করা যাবে এসব বিষয়ে ইসলামের দিক-নির্দেশনা কি? কারণ, একটি আরবি প্রবাদ আপনারা নিশ্চয় শুনেছেন যে, وبضدها تتبين الأشياء অর্থাৎ- কোনো জিনিসের প্রকৃত পরিচয় লাভ করতে হলে তার বিপরীত বস্তুর প্রতি দৃষ্টি দিতে হয়। রাতের অন্ধকারের কারণেই দিনের আলোর মূল্যায়ন। গ্রীষ্মের কারণেই বর্ষার কদর। তাই সর্বপ্রথম আমাদেরকে যাচাই করতে হবে আধুনিক কালের অর্থনৈতিক মতবাদগুলো এ চারটি বিষয়ের সমাধান পেশ করেছে কিভাবে?

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় এগুলোর সমাধান

সর্বপ্রথম দৃষ্টি দেয়া যাক পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার প্রতি। এ চারটি বিষয় সম্পর্কে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার দৃষ্টিভঙ্গি হলো, এগুলোর সমাধানপদ্ধতি হবে একটাই। যাদুর একটি মাত্র কাঠি এগুলোর সঠিক বিশ্লেষণ করবে। যাদুর সে কাঠিটি হলো, প্রত্যেককে মুনাফা লাভের জন্য নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা দিতে হবে। নিজ সাধ্যমতে প্রত্যেকেই নিজের লাভের চিন্তা করবে। মানুষ মুনাফা অর্জনের স্বাধীনতা পেলে এ চারটি বিষয় স্বয়ংক্রিয়ভাবে (Automatically) সমাধান হয়ে যাবে। প্রশ্ন হলো, স্বয়ংক্রিয়ভাবে এগুলোর নিষ্পত্তি হবে কিভাবে?

তার উত্তর হলো, আসলে এ পার্থিবজগত প্রাকৃতির নিয়মে বাধা। যাকে বলা হয় 'বস্তুর সরবরাহ' এবং 'চাহিদা' (Supply and Demand)। যারা অর্থনীতির ছাত্র নন তারা বিষয়টিকে এভাবে বুঝে যে, বস্তুর তুলনায় বস্তুর 'চাহিদা' কম হলে মূল্য হ্রাস পেতে বাধ্য। মনে করুন, মার্কেটে আম আছে,

কিন্তু ক্রেতার চাহিদার তুলনায় তার সরবরাহ যথেষ্ট নয়, তাহলে মার্কেটের আমের দাম অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে। পক্ষান্তরে এই আম যদি এমন এলাকায় সাপ্লাই দেয়া হয়, যে এলাকার মানুষ আমের প্রতি আগ্রহী নয়, তাহলে তার অনিবার্য ফল দাঁড়াবে, সেখানে আমের মূল্য হ্রাস পাবে। সারকথা, যে পণ্যের চাহিদা যত বেশি, তার মূল্যও তত বেশি হবে। আর যে পণ্যের চাহিদা যত কম হবে, তার মূল্যও তত হ্রাস পাবে।

পুঁজিবাদের বক্তব্য হলো, প্রকৃতির এ নিয়ম যা মূলত এ নির্দেশনা দেয়, কোন বস্তু উৎপাদন করা হবে, কি পরিমাণে উৎপাদন করা হবে এবং উৎপাদনের উৎসসমূহ কিভাবে চিহ্নিত করা হবে। এক কথায়, এ সকল বিষয় প্রাকৃতিক নিয়ম 'আমদানি-রফতানি' তথা 'সরবরাহ ও চাহিদা'র আওতাধীন। তাই প্রত্যেককে যদি অধিক মুনাফা লাভের জন্য নিরুঙ্কুশ স্বাধীনতা দেয়া হয়, তাহলে সকলেই সেইসব জিনিস উৎপাদন করার চেষ্টা করবে, যেসব জিনিসের মার্কেট-চাহিদা বেশি।

যে কেউ তখন ব্যবসা শুরু করার পূর্বে প্রথমে জানতে চাইবে কোন জিনিসটির মার্কেট-চাহিদা বেশি। কারণ, চলতিপণ্য মার্কেটে আনলে তার লাভ হবে অধিক। পক্ষান্তরে কোনো পণ্যের চাহিদা মার্কেটে কম হলে একজন ব্যবসায়ী লোকসানের আশঙ্কায় অথবা অন্তত লাভ কম হওয়ার ভয়ে ওই পণ্য মার্কেটে উঠাতে আগ্রহী হবে না। সুতরাং বলা যায়, 'চাহিদা এবং সরবরাহ' এ বিষয়টি মার্কেটে এমনভাবে কার্যকর, যা দ্বারা এখন 'কোন প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে' সেটা এমনিতেই চিহ্নিত হয়ে যায় এবং কোন জিনিস উৎপাদন করা হবে, উৎপাদনের সূচিগুলো কিভাবে বন্টন করা হবে— এসব বিষয়েরও অটোমেটিক সুরাহা হয়ে যায়। অধিক মুনাফা লাভের লক্ষ্যে মানুষ তখন নিজেদের ভূমি ও কারখানাকে সেসব জিনিস উৎপাদনের কাজে লাগাবে, যেসব জিনিসের চাহিদা দেশের ভেতরে অধিক। এভাবে অর্থনীতির আলোচ্য চারটি বিষয় এমনিতেই সহজ হয়ে যাবে। সরবরাহ ও চাহিদানীতিই হবে যার মূলনীতি। সমাধানের এ পদ্ধতিকে বলা হয় (Price Mechanism) তথা মূল্যকৌশল বা মূল্য পদ্ধতি।

আমদানি বন্টনের পদ্ধতিও অনুরূপ। এ ব্যাপারে পুঁজিবাদীয় দৃষ্টিভঙ্গি হল, আমদানির বন্টনের পদ্ধতিও 'সরবরাহ ও চাহিদানীতি'র আওতাধীন। যেমন

Contents

ধরুন, একজন একটি কারখানা নির্মাণ করলো, সেখানে একজন কর্মচারীকে কাজে খাটালো। প্রশ্ন হলো, কারখানা থেকে আয়কৃত অর্থ কর্মচারী কি পরিমাণে গ্রহণ করবে? আর মালিকই বা কি পরিমাণে নিবে? এটাও মূলত 'সরবরাহ ও চাহিদানীতি'র উপর ভিত্তি করেই নির্ধারণ করা হবে। অর্থাৎ– কর্মচারীর চাহিদা যত অধিক হবে, তার পারিশ্রমিকও তত বেশি হবে। চাহিদা কম হলে পারিশ্রমিকও হবে কম। অর্থাৎ–'সরবরাহ ও চাহিদানীতি'র উপরই আমদানি বা আয় বন্টনের বিষয়টি নির্ভরশীল।

অবশেষে থাকলো চতুর্থ তথা শেষ বিষয়টি। অর্থনীতির চতুর্থ বিষয়টি ছিলো (Development) তথা উন্নয়ন বা প্রবৃদ্ধি। এটিও মূলত 'সরবরাহ ও চাহিদা' (Suplly and Demind) এর উপর নির্ভরশীল। সকলেই যখন অধিক মুনাফা লাভের চেষ্টা করবে, তখন নিত্যনতুন উৎপাদন ও আবিষ্কার উদ্ভাবিত হতে থাকবে। গ্রাহকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য নতুন নতুন পণ্য উৎপাদনে সকলেই সচেষ্ট হবে।

সুতরাং বোঝা গেলো, অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে প্রত্যেককে স্বাধীনতা দেয়া হলে উপরিউক্ত চারটি বিষয়ের সমাধান এমনিতেই হয়ে যাবে। এর মাধ্যমেই 'অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহের অগ্রাধিকার', 'অর্থ উৎসগুলোর বন্টন', 'আয়ের বন্টন', এবং 'উন্নতি' করা যাবে। এটাই পুঁজিবাদের দৃষ্টিভঙ্গি।

সমাজতন্ত্রে এসব বিষয়ের সমাধান

পুঁজিবাদের পরে মঞ্চে যখন সমাজতন্ত্র এলো, সে বক্তব্য দিলো, জনাব! আপনারা দেখি অর্থনীতির সম্পূর্ণ ব্যাপারটা মার্কেটের লোকদের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। কারণ, 'সরবরাহ ও চাহিদানীতি' মূলত একটি অন্তসারশূন্য ভঙ্গুর নীতি। আপনারা যে বলেছেন, 'মানুষ উৎপাদন ও আবিষ্কার করবে মার্কেটের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে। যে জিনিসের মার্কেটে চাহিদা থাকবে, সে জিনিস উৎপাদন করবে এবং যতদিন থাকবে ততদিন করবে।' আপনাদের এ কথাটি তত্ত্বগতভাবে হয়ত ঠিক আছে; কিন্তু মানুষ যখন বাস্তব জীবনে পা বাড়ায়, তখন কোন জিনিসের চাহিদা মার্কেটে অধিক, এটা জানতে পারে অনেক পরে। একটা সময় আসে, যখন উৎপাদনকারীর ধারণা থাকে বাজারে পণ্যটির ব্যাপক চাহিদা, তাই উৎপাদন যত পারে বাড়তে থাকে, অথচ বাস্তবে বাজারে পণ্যটির চাহিদা তেমন নেই। ফলে চাহিদা কম অথচ উৎপাদন বেশি হওয়ার কারণে

মন্দা বাজার সৃষ্টি হয়। আর মন্দা বাজারের, অনিবার্য প্রভাব তো অর্থনীতির উপর পড়বেই। সুতরাং অর্থনীতির এসব মূল চালিকাশক্তি নির্বোধ ও অন্ধশক্তির কাঁধে বর্তাবে এবং গোটা অর্থব্যবস্থাই ভন্ডুল হয়ে যাবে।

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা যাদুর একটি কাঠি দিয়েছিল। আর সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা যাদুর অন্য ছড়ি পেশ করলো। সমাজতন্ত্রের মূলকথা হলো, উৎপাদনের সকল উৎস ব্যক্তি মালিকানার হাত থেকে মুক্ত করে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় দিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর রাষ্ট্রই সিদ্ধান্ত দিবে কি পরিমাণ ভূমিতে চাল, কি পরিমাণ ভূমিতে গম আর কি পরিমাণ ভূমি তুলা উৎপাদন করা হবে এবং কতটি কারখানায় কাপড় আর কতটিতে জুতা উৎপাদন করা হবে। এসব প্ল্যান দিবে রাষ্ট্র।

যে কৃষক বা শ্রমিক ভূমিতে বা কারখানায় শ্রম দিবে, তার শ্রমের মূল্যায়ন হবে উক্ত প্ল্যান মোতাবেক। সুতরাং কোন প্রয়োজন অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য সেটা নির্ধারণ করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। অর্থের উৎসসমূহ এবং আয়ের সুষ্ঠ বন্টন করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। উন্নয়নের রোডম্যাপও রাষ্ট্র করবে।

সমাজতন্ত্র যেহেতু অর্থনীতির এ সকল বিষয়ের পরিকল্পনা ও সমাধান রাষ্ট্রের কর্তব্য হিসেবে নির্ধারণ করেছে, তাই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিকে (Planned Economy) ও বলা হয়। আর পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা এসব বিষয়ের সমাধান বাজার চাহিদা ও সরবরাহের ভিত্তিতে করে বিধায় পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে (Market Economy) নামেও অভিহিত করা হয়। কিংবা একে (Laisseg Faire Economy) ও বলা হয়।

উক্ত দুটি বিপরীতধর্মী মতবাদ আমরা প্রত্যক্ষ করছি এবং বিশ্বময় এগুলো চলছেও।

পুঁজিবাদী অর্থনীতির মূলনীতি

পুঁজিবাদী অর্থনীতির যেসব মূলনীতি তার 'দর্শন' থেকে আমরা লাভ করি, তার প্রথমটি হল, ব্যক্তি মালিকানা বা Private Owner Ship অর্থাৎ- উৎপাদনের সকল উৎসের মালিক হবে ব্যক্তি। দ্বিতীয় মূলনীতি হলো রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপমুক্ত হওয়া বা Laisser Fair Policy of State অর্থাৎ- উপার্জনে ব্যক্তির নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা, যেখানে রাষ্ট্রের কোনো হস্তক্ষেপ থাকবে না। তৃতীয় মূলনীতি হলো, ব্যক্তিগত উন্নয়নের লক্ষ্যে তৎপরতা। অর্থাৎ- মানুষ নিজের

উন্নয়নকে একটি উদ্দীপকশক্তি হিসেবে গ্রহণ করবে। নিজের উন্নতিসাধনের জন্য উদ্ভাবনীশক্তিতে অগ্রসর হবে। এজন্য ব্যক্তিকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এসবই পুঁজিবাদী অর্থনীতির মূলনীতি।

সমাজতন্ত্রের মূলনীতি

পুঁজিবাদের বিপরীতে সমাজবাদের মূলনীতি হলো, উৎপাদনের উৎসগুলো ব্যক্তিমালিকানা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকবে। উৎপাদনের কোনো উৎসের মালিক 'ব্যক্তি' হবে না। অর্থাৎ- ভূমি, কারখানা ইত্যাদি ব্যক্তিমালিকানায় থাকবে না।

দ্বিতীয়, রোডম্যাপ বা প্ল্যান তৈরী। অর্থাৎ- যাবতীয় তৎপরতা হবে পরিকল্পনা মাফিক। মোটকথা, পুঁজিবাদ ও সমাজবাদ সম্পূর্ণ বিপরীতমুখি দুটি অর্থনৈতিক মতবাদ।

সমাজতন্ত্রের পরিণাম

বর্তমান বিশ্ব উক্ত উভয় অর্থব্যবস্থার যাবতীয় অভিজ্ঞতা এবং পরিণাম প্রত্যক্ষ করেছে। সমাজতন্ত্রের পরিণতি তো আপনারা স্বচক্ষে দেখছেন। চুয়াত্তর বছরের তিক্ত অভিজ্ঞতার পর যার সম্পূর্ণ ইমারত ধসে পড়েছে। এক সময় যে সোশ্যালিজম বিশ্বের মানুষ ফ্যাশন হিসাবে গ্রহণ করতো, যার বিরুদ্ধে কেউ উচ্চবাচ্য করলে তাকে পুঁজিবাদের এজেন্ট ও পশ্চাদপদ মনে করা হতো, সেই সমাজতন্ত্রের দেশ রাশিয়ার শীর্ষ ব্যক্তিবর্গ আজ নির্লজ্জভাবে স্বীকার করছে :

"আফসোস! মতবাদটি যদি রাশিয়ার পরিবর্তে আফ্রিকার কোন ক্ষুদ্র দেশে পরীক্ষা করে দেখা হত, তাহলে অন্তত আমরা তার ধ্বংসাত্মক পরিণতি থেকে রক্ষা পেতাম।"

সমাজতন্ত্র ছিল মানবপ্রকৃতি পরিপন্থী মতবাদ

সমাজতন্ত্র ছিলো মানবপ্রকৃতি বিরোধী একটি অস্বাভাবিক মতবাদ। কারণ, পৃথিবীর বুকে রয়েছে আর্থিক সমস্যা ছাড়াও অসংখ্য সামাজিক সমস্যা। যদি এসকল সমস্যার সমাধান প্ল্যানমাফিক করার প্রতি তাকিয়ে থাকতে হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে মোটেই সমাধান লাভ করবে না। যেমন- মনে করুন, পুরুষ কোন নারীকে বিয়ে করতে চায়। বিয়ে করার জন্য পুরুষের যথোপযুক্ত একজন পাত্রী প্রয়োজন, অনুরূপভাবে নারীরও যথোপযুক্ত একজন পাত্রের প্রয়োজন। এটি একটি সামাজিক বিষয়। এখন কেউ যদি সামাজিক এ বিষয়টি এভাবে সমাধা

দিতে চায় যে, যেহেতু বিয়ে শাদি ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর ছেড়ে দিলে পরবর্তীতে দেখা যায় নানা রকম সমস্যা সৃষ্টি হয়। ডিভোর্স, তালাক, সংসারভাঙ্গন এবং মনকষাকষিসহ বহু অপ্রীতিকর বিষয়ের উদ্ভব ঘটে। তাই বিয়েপদ্ধতিকে টেকসই রাখার জন্য সর্বোত্তম পন্থা হল, বিষয়টি রাষ্ট্রের দায়িত্বে দিয়ে দেয়া হবে। রাষ্ট্র চিন্তা-পরিকল্পনা করে সিদ্ধান্ত দিবে কোন নারীর জন্য কোন পুরুষ যথোপযুক্ত হবে। বলা বাহুল্য, এরূপ পরিকল্পনা করে যদি বিষয়টি সমাধান করতে চায়, তাহলে এটা হবে মানবীয় স্বভাববিরোধী এক অস্বাভাবিক পদ্ধতি, যার থেকে কখনো 'ভালো' আশা করা যায় না।

মূলত সমাজতন্ত্র এরকম পরিস্থিতিই সৃষ্টি করে। সমাজতন্ত্রে যেহেতু সবকিছু প্ল্যানমাফিক করার 'নীতি' বিদ্যমান, তাই তখন প্রশ্ন দাঁড়ায়, এ প্ল্যানটা করবে কে? অবশ্যই এটা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। রাষ্ট্র কাকে বলে ? রাষ্ট্র তো কিছু ফেরেশতার সমষ্টিকে বলে না; বরং রাষ্ট্রের কর্ণধাররাও তো মানুষ। সমাজতন্ত্রের বক্তব্য হল, পুঁজিবাদের কারণে স্বেচ্ছাচারিতা জন্ম নেয়। কিন্তু সমাজতন্ত্র এটা দেখেনি যে, সমাজতন্ত্রের কারণে যদিও অনেক ছোট ছোট স্বেচ্ছাচারী পর্দার অন্তরালে চলে যায়; কিন্তু এর কারণে একজন বড় স্বেচ্ছাচারী মঞ্চে প্রতিভাত হয়। যার নাম কৃষকরাজ; শ্রমিক সরদার অথবা এজাতীয় অন্য কিছু। অর্থনীতির পুরো বিষয়টিই তখন এ মহাজনের কাছে জিম্মি হয়ে পড়ে। এখন এটার কি নিশ্চয়তা যে, কথিত মহান ব্যক্তিটি কোন অন্যায় অবিচারে লিপ্ত হবে না? এ 'মহামানুষ' কি আকাশের কোন ফেরেশতা, নাকি নিষ্পাপ কোন স্বর্গদূত? মোটকথা, সমাজতন্ত্রের শেষ পরিণতিও অত্যন্ত নেতিবাচক, যার অশুভ পরিণতি আপনারা দেখেছেন। এ ব্যবস্থা পেকে গেছে, অতঃপর ঝরে গেছে। আজ তার নাম নিতেও মানুষ লজ্জাবোধ করে।

পুঁজিবাদের নেতিবাচক দিকসমূহ

সমাজতন্ত্রের পরাজয়ের পর পশ্চিমা দেশগুলো পুঁজিবাদের ডুগি বাজাতে থাকে। সমাজতন্ত্রের পরাজয়ের পর পুঁজিবাদের সুদিন শুরু হয়। বর্তমানে কেমন যেন এছাড়া অন্য কোন পথ-পদ্ধতি নেই। পুরো বিশ্ব এ পুঁজিবাদকেই গ্রহণ করে নিয়েছে।

স্মরণ রাখতে হবে, পুঁজিবাদের মূলনীতি হলো, মুক্ত বাজারের অস্তিত্ব এবং সম্পদ অর্জনে ব্যক্তিস্বাধীনতা। যদিও তত্ত্বগতভাবে এটি একটি যুক্তিযুক্ত দর্শন।

কিন্তু এ দর্শন যখন নিজস্ব সীমানা ডিঙ্গিয়ে বাড়াবাড়ির পর্যায়ে পৌছে গেছে তখনই দেখা দিয়েছে বিপত্তি। তখন নিজের মূল নিজেই কেটে ফেলেছে। একথা ঠিক যে, মানুষ যখন সম্পদ উপার্জনের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা পাবে, তখন 'সরবরাহনীতি' ও 'চাহিদানীতি' কার্যকর হবে এবং উপরোক্ত চারটি বিষয়ের সমাধান করে দিবে। কিন্তু মনে রাখবেন, 'সরবরাহনীতি ও চাহিদানীতি' তখনই ফলপ্রসূ হবে, যখন বাজারে মুক্ত প্রতিযোগিতার পরিবেশ থাকবে এবং যখন বাজার হবে ইজারাদারিত্ব থেকে মুক্ত। যেমন মনে করুন, আমি বাজার থেকে একটি ছড়ি কিনতে চাচ্ছি। বাজারে রয়েছে অনেক ছড়িবিক্রেতা। এক ছড়ি বিক্রেতা ছড়ি বিক্রি করে পাঁচশ টাকা করে, অন্যজন বিক্রি করে চারশ পঞ্চাশ টাকা করে। এখন আমি পাঁচশ টাকা দামে ছড়ি কিনবো, নাকি চারশত পঞ্চাশ টাকায় কিনব এ ব্যাপারে আমি স্বাধীন। এরূপ ক্ষেত্রে 'চাহিদা' ও সরবরাহনীতি অবশ্য ফলদায়ক। কিন্তু বাজারে যদি ছড়ি বিক্রেতা একজন থাকে আর আমারও যদি ছড়ির প্রয়োজন হয়, তাহলে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক এবং পছন্দ হোক বা না হোক আমাকে ছড়ি কিনতে হলে তার কাছেই যেতে হবে। সে যদি নিজের ইচ্ছামত মূল্য হাঁকায় আমাকে তাই দিতে হবে। এখানে সরবরাহ এবং চাহিদানীতি অচল। কারণ, এ ক্ষেত্রে বস্তুর মূল্য নির্ধারণ করলো এক পক্ষ। দ্বিতীয় পক্ষের পছন্দ - অপছন্দ, ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন মূল্যায়ন হলো না। সে ক্রয় করতে চাইলে ঠিকাদারের নির্ধারিত মূল্যেই ক্রয় করতে হবে।

সুতরাং সরবরাহ ও চাহিদাশক্তি ওই ক্ষেত্রে কাজ করতে পারে, যে ক্ষেত্রে রয়েছে স্বাধীন প্রতিযোগিতা, ঠিকাদারির ক্ষেত্রে এ শক্তি অকেজো ও নিষ্ক্রিয়।

তাছাড়া অধিক মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে মানুষকে স্বাধীন ছেড়ে দিলে, তখন তারা এমন কৌশলের আশ্রয় নিবে, যার পরিণতিতে মার্কেটে সৃষ্টি হবে ইযাদারি বা ঠিকাদারির দাপট। পুঁজিবাদে সুদ, জুয়া, ধোকাসহ যেকোন পদ্ধতিতে অর্থ উপার্জন করা বৈধ। ইসলাম যেসব পদ্ধতিকে হারাম সাব্যস্ত করেছে, পুঁজিবাদ সেগুলোকে বৈধ আখ্যায়িত করেছে, যার অনিবার্য পরিণতিতে কায়েম হয় স্বেচ্ছাচারিতা। যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে অর্থ উপার্জনের স্বাধীনতা ভোগ করতে গিয়ে অর্থলোভীরা তখন বেপরোয়া হয়ে ওঠে। অর্থের সকল সূচি তখন তারা কুক্ষিগত করে ফেলে। এভাবে শুরু হয় নির্মম ঠিকাদারি। সরবরাহ ও চাহিদাশক্তি তখন স্থবির হয়ে পড়ে। মুখ থুবড়ে পড়ে অর্থনীতি। এই জন্য

আমরা বলি, পুঁজিবাদ তত্ত্বগতভাবে যৌক্তিক মনে হলেও বাস্তবক্ষেত্রে তা কল্পনার এক ফানুস বৈ কিছু নয়। অর্থ উপার্জনে স্বাধীনতা দেয়া হলে আরো একটি ক্ষতির দিক এও রয়েছে যে, তখন এ অঙ্গনে সভ্য ও পরিশীলিত লোকের দুর্ভিক্ষ শুরু হবে। অসাধু ও দুষ্ট লোকেরা সামাজিক লাভ-ক্ষতির কথা বিবেচনা করবে না। এই তো কিছুদিন পূর্বে আমেরিকার সংবাদপত্র 'টাইমস'-এ এক মডেলকন্যার কথা পড়েছি। প্রতিটি বিজ্ঞাপনে যার পারিশ্রমিক পঁচিশ মিলিয়ন ডলার। প্রশ্ন হল, সংশ্লিষ্ট ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান এ পঁচিশ মিলিয়ন অবশেষে কার থেকে উসুল করবে? নিঃসন্দেহে ভোক্তা সাধারণের কাছ থেকেই আদায় করবে। কারণ, মডেলকন্যার পেছনে যে পঁচিশ মিলিয়ন ডলার খরচ হলো, তা মূলধনের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং আপনার-আমার পকেট থেকে আদায় করবে।

ফাইভষ্টার হোটেল, যার এক দিনের ভাড়া আড়াই হাজার থেকে তিন হাজার টাকা। একজন মধ্যবিত্ত তার দিকে চোখ তুলে দেখারও সাহস পায় না। অথচ, সকল ফাইভষ্টার হোটেল নির্মিত হয় সাধারণ মধ্যবিত্ত জনগণের টাকায়। দেখুন, এসব হোটেলে কাদের আনাগোনা? হয়ত বড় বড় সরকারি কর্মকর্তা সেখানে আসা-যাওয়া করেন, যাদের খরচ বহন করে সরকার। সরকারি খরচে তারা সেখানে যায়। আর সরকারি ব্যয় মানেই তো জনসাধারণ থেকে আদায়কৃত ট্যাক্স। অথবা এসব হোটেলে আসা-যাওয়া করে ব্যবসায়ী মহল। ব্যবসায়িক কাজে তারা এসব হোটেলে ভাড়া করে। বলা বাহুল্য, এটাও তো তাদের ব্যবসায়িক ব্যয় বা (Cost) যার কারণে পন্যের মূল্য বাড়ে। আর সে মূল্য আদায় তো জনগণকেই করতে হয়।

সুতরাং এমন ন্যায়নীতির মানুষ কিংবা মাপকাঠি পুঁজিবাদের কাছে নেই, যে বলতে পারবে, অর্থ উপার্জনের কোন পদ্ধতিটি সঠিক, কোনটি সমাজের জন্য লাভজনক আর কোনটি ক্ষতিকর। ফলে জন্ম নিচ্ছে অন্যায়, অনিয়ম ও দুর্নীতি।

ইসলামের অর্থনীতি

এ পর্যায়ে দৃষ্টি দেয়া যাক ইসলামের অর্থনীতি শিক্ষার প্রতি। ইসলাম স্বীকার করে যে, অর্থনৈতিক বিষয়সমূহ পরিকল্পনার পরিবর্তে মার্কেটের সরবরাহ ও চাহিদাশক্তির উপর নির্ভর করা উচিত। কুরআন-হাদীসের বক্তব্য হলো :

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا

(الزخرف:٣٢)

"আমি তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বন্টন করেছি পার্থিব জীবনে এবং একের মর্যাদাকে অপরের উপর উন্নীত করেছে, যাতে একে অপরকে সেবক রূপে গ্রহণ করে।" [সূরা যুখরুফ, আয়াত : ৩২]

এখানে لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا আয়াতের এ অংশটুকু প্রণিধানযোগ্য, যার অর্থ '(আমি আয়-আমদানিতে পার্থক্য এজন্য রেখেছি) যাতে একজন অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নেয়।' অর্থাৎ- আল্লাহ তা'আলা এ বিশ্বব্যবস্থা একটা নিয়মের অধীনে সাজিয়েছেন এবং বিশ্বের অর্থ-সম্পদ বন্টন করেছেন। বিশ্বের মানুষের প্রয়োজনাদি কি কি, সেগুলোর মধ্যে আয়ের বন্টন কিসের ভিত্তিতে করা হবে- এগুলো তিনি কোনো মানুষের প্ল্যান বা পরিকল্পনার হাতে সোপর্দ করেননি যে, মানুষ (বা কোন ক্ষমতাশালী মানবিক প্রতিষ্ঠান) পরিকল্পনার মাধ্যমে এগুলো স্থির করবে। বরং আল্লাহ তা'আলা এগুলো নিজে বন্টন করে দিয়েছেন। নিজে বন্টন করার অর্থ এই নয় যে, তিনি নির্ধারিত করে বলেছেন, 'তোমরা এতটুকু নাও' আর 'অমুক এ পরিমাণ নিবে'। বরং নিজে বন্টন করার অর্থ হলো, আল্লাহ তা'আলা এ বিশ্বব্যবস্থাকে এমন প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক নিয়মে সাজিয়েছেন, যে নিয়মে আপনা-আপনি এসব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। (অর্থনৈতিক পরিভাষায় যে নিয়মের নাম-Supply and Demand)

অন্য এক হাদীসে নবী করীম (সা.) অর্থনীতির অন্যতম মূলনীতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন :

دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ (صحيح مسلم كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي ١٥٢٢)

মানুষকে জীবিকা অন্বেষণে স্বাধীন ছেড়ে দাও। আল্লাহ তাআলা তাদের পরস্পর পরস্পর দ্বারা রিজিক দান করেন। অর্থাৎ- তাদের উপর অহেতুক বাধাবাধকতা চাপিয়ে দিও না। তাদেরকে মুক্তভাবে উপার্জন করতে দাও। এ

এক বিস্ময়কর বিশ্বব্যবস্থা, যা আল্লাহ সাজিয়েছেন। যেমন– এ মুহূর্তে আমার খেয়াল চাঁপল, বাজারে গিয়ে লিচু কিনবো। বাজারে গিয়ে দেখলাম, এক ব্যক্তি বিক্রি করার জন্য লিচু নিয়ে বসে আছে। তার নিকট গেলাম। দরাদরি করে তার থেকে লিচু নিয়ে নিলাম এবং মূল্য পরিশোধ করে দিলাম। তাহলে হাদীসের মর্মার্থ এখানে প্রস্ফুটিত হলো, আল্লাহ তা'আলা একজনকে অন্যজনের মাধ্যমে রিযিক দান করেন।

মোটকথা মার্কেটের চাহিদা ও সরবরাহনীতি বা শক্তি হলো অর্থনীতির মূলনীতি, যা ইসলামকর্তৃক সমর্থিত নীতি। কিন্তু পুঁজিবাদ এ 'মার্কেটিং পাওয়ার'কে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণহীন ছেড়ে দিয়েছে, যে নিয়ন্ত্রনহীণতাকে ইসলাম সমর্থন করে না। বরং ইসলামের বক্তব্য হলো, অর্থ উপার্জনের ময়দানে মানুষকে স্বাধীনতা দেয়া হবে, তবে এ স্বাধীনতারও একটা নির্দিষ্ট গণ্ডি বা মাপকাঠি থাকবে। তাদেরকে এতটুকু স্বাধীনতা দেয়া যাবে না, যা অন্যের স্বাধীনতাকে খর্ব করে। অথবা যে স্বাধীনতা দ্বারা অবৈধ ফায়দা লুটতে পারে, ইজারাদারি কায়েমে সহায়ক হয়, সে স্বাধীনতা মানুষকে দেওয়া যাবে না। বরং স্বাধীনতার নামে অবৈধ ফায়দা যেন লুটতে না পারে, সে জন্য এ স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ইসলাম একটি সীমারেখা টেনে দিয়েছে। স্বাধীনতার উপর আরোপ করেছে কিছু বাধ্যবাধকতা, যেগুলোকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি। (এক) শরীয়তের পাবন্দি বা ইলাহি পাবন্দি। অর্থাৎ– আল্লাহ তা'আলা হালাল-হারাম, জায়েয-নাজায়েযের সুদূরপ্রসারী বিধান আরোপ করেছেন, যাতে তোমরা অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে বৈধ ও অবৈধ পন্থা জানতে পার। (দুই) নৈতিক পাবন্দি। (তিন) আইনি পাবন্দি। ইসলাম উপার্জনের স্বাধীনতার মধ্যে এ তিনটি পাবন্দি তথা বাধ্যবাধকতা মানুষের উপর আরোপ করেছে, যেগুলোর কিছু ব্যাখ্যা নিম্নে পেশ করা হল :

(এক) ধর্মীয় পাবন্দি

প্রথম প্রকার পাবন্দি দ্বীন ও শরীয়তের পাবন্দি। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ পাবন্দি ইসলামকে অন্যান্য অর্থনৈতিক মতবাদ থেকে পৃথক করে দেয়। যদিও আজকের পুঁজিবাদ তার মূলনীতি ছেড়ে দিয়ে আরো নিম্নস্তরে চলে এসেছে, এমনকি পুঁজিবাদে রাষ্ট্রের অবৈধ হস্তক্ষেপেরও অনুপ্রবেশ ঘটেছে। অথচ অর্থনীতির উপর রাষ্ট্রের জবরদস্তি হস্তক্ষেপ তো সমাজতান্ত্রিক নীতি– পুঁজিবাদী

াতি নয়। ইসলাম যে পাবন্দি আরোপ করে, তা হল দ্বীন ও শরীয়তের পাবন্দি বা ধর্মীয় পাবন্দি। ধর্মীয় পাবন্দি কি? ইসলাম বলে, তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্য কর। কিন্তু সুদের কারবার করতে পারবে না। যদি কর, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিবেন। অনুরূপভাবে জুয়াবাজি নিষিদ্ধ। জুয়াবাজির মাধ্যমে আয় রোজগার করা হারাম। 'ইহতেকার' তথা অধিক লাভের উদ্দেশ্যে সম্পদ মজুত রাখা নিষেধ। ধোঁকাবাজি হারাম।

এমনিতে ইসলামের কথা হল, দু'জন মানুষ যখন কোন কারবার করার জন্য সম্মতি প্রকাশ করে, তখন সেটা আইনসম্মত কারবার হয়। কিন্তু এমন কারবারের প্রতি পারস্পরিক সম্মতির অনুমতি নেই, যে কারবার সমাজ ধ্বংসের কারণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সুদের কারণে যেহেতু সমাজে অর্থনীতির মুখ থুবড়ে পড়ে, অপরপক্ষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়, তাই ইসলামের দৃষ্টিতে এটি অবৈধ। 'সুদ' সমাজ ও অর্থনীতির কি কি ধ্বংস সাধন করে ? এটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিষয়। এ বিষয়ের উপর অনেক গ্রন্থ রয়েছে। তাই আমি এ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যার দিকে না গিয়ে সাদামাটা ভাবে একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি, যা দ্বারা সুদের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে কিঞ্চিত ধারণা পাওয়া যাবে।

সুদের অশুভ পরিণতি

সুদব্যবস্থার মূলভিত্তি হলো একজনের আমদানি হবে নিশ্চিত আর অপরজনের আমদানি হবে সংশয়যুক্ত। যেমন কেউ কারো থেকে সুদের ভিত্তিতে ঋণ নিলো। এতে ঋণগ্রহীতা একটি নির্দিষ্ট অংক ঋণদাতাকে অতিরিক্ত দিতেই হবে। ঋণগ্রহীতা হয়তো এ ঋণ ব্যবসা-বাণিজ্যে বিনিয়োগ করবে। ব্যবসায় লাভ-লোকসান উভয়টার আশঙ্কা থাকতে পারে। সুদের ভিত্তিতে ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি তার এ লোকসানের কথা মোটেও বিবেচনা করবে না। বরং শতকরা ১৬% হারে তার থেকে সুদ অবশ্যই আদায় করে নিবে। সুতরাং ঋণগ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্থ হলো আর ঋণদাতা আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হলো।

অথবা মনে করুন, এক ব্যক্তি ব্যাংক থেকে সুদের ভিত্তিতে এক কোটি টাকা ঋণ নিল। শুরু করলো ব্যবসা-বাণিজ্য। এমন ব্যবসাও আছে, যার মধ্যে মুনাফা হয় একশতে একশ'। এ ব্যক্তিরই তা-ই হলো। অথচ, ঋণদাতা ব্যাংক তার থেকে মুনাফা আদায় করলো সুদের নির্দিষ্ট হার ১৫%, অবশিষ্ট ৩৫% চলে গেল ঋণগ্রহীতার পকেটে। এবার দেখুন, এ ব্যক্তি তার এই মূলধন পেল

কোথেকে? তার এ মূলধন তো নিশ্চয় জনগণেরই ছিল। অথচ সে ব্যাংকের মাধ্যমে জনগণের এ মূলধনকে কাজে লাগিয়ে অতিরিক্ত ৩৫%মুনাফা নিজের পকেটে ঢোকাল। ব্যাংক দিল মাত্র ১৫% মুনাফা। এ ১৫%থেকেও হয়ত ব্যাংক আদায় করে নিবে ৫%। তাহলে ফল দাঁড়ালো, ব্যাংকের ডিপোজিটার তথা জনসাধারণের থেকে পাওনা ৫০% লাভের ৩৫% চলে গেল মুনাফাখোর ব্যবসায়ীর পকেটে। ৫% গেল ব্যাংকের তহবিলে। আর মানুষও মাত্র ১০% পেয়ে যেন মহাখুশি! তারা দেখলো আমরা ব্যাংকে একশত' টাকা জমা রেখে এক বছর পর পাচ্ছি একশ' দশ টাকা। দারুণ লাভ (?) অথচ মাত্র দশ টাকা লাভই কি তার আসল প্রাপ্য? উপরন্তু বেচারার এ দশ টাকাও অবশেষে চলে যায় পুঁজিপতি ব্যবসায়ীর পকেটে। কারণ, ওই মুনাফাখোর ব্যবসায়ী ব্যাংকে যে ১৫% লাভ দিয়েছে, সেটাও সে তার ব্যবসার মূলধন হিসাবে গ্রহণ করবে, যা মূলধনে অন্তরর্ভুক্ত হয়ে পণ্যের মূল্যস্ফীতি ঘটাবে। যে মূল্য আদায় করে মার্কেট থেকে ক্রয় করবে সাধারণ মানুষ। সুতরাং সর্বদিক থেকে মুনাফালোভী ব্যবসায়ীরই ফায়দা। তার পরেও তার লোকসানের কোন আশঙ্কা নেই। ধরে নেওয়া যাক সে লোকসানে পড়লেও ক্ষতিপূরণের জন্য রয়েছে বিভিন্ন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি। আর ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে সাধারণত সেইসব টাকা জমা থাকে, যেগুলো সাধারণ মানুষ কিস্তিস্বরূপ (Primum) আদায় করে। কিস্তির টাকা পরিশোধ হওয়া পর্যন্ত গাড়ি ইত্যাদি তারা দেয় না। আর ওই টাকাই পৌঁছে পুঁজিপতিদের পকেটে। এভাবে কোন দিক থেকেই তার লোকসান নেই। সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার কিছু নির্মম দিকে প্রতি কিছুটা ইঙ্গিত দেয়া হলো। এর মাধ্যমে জীবনচলার পথে অন্যায় অসমতা সৃষ্টি হতে বাধ্য। তাই ইসলাম সুদকে হারাম ঘোষণা করেছে।

যৌথব্যবসা এবং মুদারাবার উপকারিতা

পক্ষান্তরে কোন ব্যবসা যদি সুদের ভিত্তিতে না হয়ে যৌথব্যবসা কিংবা 'মুদারাবা'র ভিত্তিতে পরিচালিত হয়, তাহলে ব্যাংক এবং ঋণগ্রহীতার মাঝে ১৫% হারে মুনাফা দেয়ার কোন নির্দিষ্ট চুক্তি থাকবে না। বরং চুক্তি থাকবে, যেমন– লাভের অর্ধেক পাবে ব্যাংক আর অর্ধেক পাবে ঋণগ্রহীতা। সুতরাং যদি ৫০% লাভ হয়, তাহলে ২৫% পাবে ব্যাংক আর ২৫% পাবে ঋণগ্রহীতা। এভাবে অর্থ-সম্পদের স্রোত উঁচু শ্রেণীর লোকদের দিকে চলার পরিবর্তে

নিম্নশ্রেণীর লোকদের দিকের ছুটবে। যেহেতু তখন ২৫% মুনাফা ব্যাংকের মাধ্যমে সাধারণ ডিপোজিটারদের হাতে পৌছাবে। বুঝা গেলো, সুদব্যবস্থার নেতিবাচক প্রভাব সম্পদের সুষ্ঠু বন্টনের উপরও পড়ে। যার ফলে অর্থনীতি নিম্নটান দিতে শুরু করে।

জুয়া হারাম

ইসলাম সুদের ন্যায় জুয়াকেও হারাম করে দিয়েছে। 'জুয়া'র অর্থ হলো, কেউ নিজের টাকা খাটালো। এর মাধ্যমে সম্ভাবনার দুটি দিক থাকবে। হয়ত মূল টাকা সম্পূর্ণটা খোয়াবে, অন্যথায় এর মাধ্যমে অনেক সম্পদের অধিকারী হবে। জুয়ার রয়েছে বিভিন্ন প্রকারভেদ। আশ্চর্যের কথা হল, পাশ্চাত্য জুয়াকে (Gambling) অনেক ক্ষেত্রে আইন করে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। অন্যদিকে সেই জুয়াকে (Gambling) সভ্যতার পোশাক পরিয়ে বৈধ সাব্যস্ত করেছে। যেমন কোন গরীব লোক যদি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে জুয়া খেলে, তাহলে তাকে পুলিশ গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। কিন্তু এই একই জুয়া যদি সভ্যতার পোশাক পরে যদি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ধারণ করে নাম পরিবর্তন করে নেয়, তাহলে সেটাকে মনে করা হয় বৈধ। এ রকম জুয়াবাজি পুঁজিবাদী সমাজে অহরহ চলছে। যার ফলে অসংখ্য মানুষ তাদের সঞ্চিত অর্থ এক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপর বর্ষণ করছে। এজন্য ইসলাম জুয়াকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করছে।

মজুদদারি

অনুরূপভাবে 'ইহতিকার' তথা মজুদদারি ব্যবসা ইসলামের দৃষ্টিতে নাজায়েয। এর নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে আমাদের কারো অজানা নয়। তাই বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নেই।

ইকতিনায না জায়েয

তদ্রূপ 'ইকতিনায'ও অবৈধ। ইকতিনায বলা হয়, টাকা পয়সা-সম্পদ এমনভাবে সঞ্চয় করে রাখা, যেগুলোর উপর শরীয়তকর্তৃক আরোপিত হক আদায় করার ইচ্ছা থাকে না। যেমন সঞ্চিত অর্থ থেকে যাকাত ইত্যাদি আদায় না করা। ইসলামের দৃষ্টিতে এটাও হারাম।

আরেকটি দৃষ্টান্ত

হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূল (সা.) বলেছেন–

لَا يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ (صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب تحريم الحاضر للبادى، ١٥٢٢)

শহরের লোক যেন গ্রাম্য লোকের সাথে বেচাকেনা না করে। অর্থাৎ গ্রামের কোন লোক যদি পণ্যবিক্রির উদ্দেশ্যে বাজারে যায়, তাহলে শহরের লোক তাকে এ প্ররোচনা দিতে পারবে না যে, তোমার মাল আমি বিক্রি করে দিবো। বাহ্যিক দৃষ্টিতে তো এতে নেতিবাচক কোন কিছু নেই। যেহেতু শহরের লোক ও গ্রাম্য লোক উভয়ই সম্মতি দিচ্ছে। তবুও নবীজি (সা.) নিষেধ করেছেন। কারণ, সাধারণত শহরের ব্যবসায়ী গ্রাম্য লোকটি থেকে পণ্য নিয়ে মূল্যবৃদ্ধি হওয়া পর্যন্ত স্টক করে রাখবে। যাতে বাজারে মালের সঙ্কট সৃষ্টি হবে আর গ্রামের ব্যবসায়ী নিজের মাল নিজেই বিক্রি করলে তার তো লোকসান নেই। তাছাড়া সে চাইবে, আমার মাল তাড়াতাড়ি বিক্রি হয়ে যাক। বিক্রি করে বাড়িতে ফেরার তাড়া থাকবে তার। এভাবে বাজারের 'আমদানি রফতানি' শক্তি কার্যকর থাকবে। কিন্তু যদি 'মাধ্যম' (Middleman) কেউ পোদ্দারি করার জন্য লেগে যায়, তাহলে আমদানি-রফতানিতে ভাটা পড়বে। মাধ্যম লোকটির কারণে পণ্যের মূল্য আরো বৃদ্ধি পাবে।

এসব কারণে মার্কেটের শক্তি যেন ভেঙ্গে না পড়ে, মুক্ত ব্যবসায় যেন অহেতুক বাধা সৃষ্টি না হয়, এজন্য ইসলাম ইজারাদারির সমূহ অন্যায় পথ বন্ধ করে দিয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ধর্মীয় পাবন্দির গুরুত্ব দিয়েছে।

২. নৈতিক পাবন্দি

স্বাধীন অর্থনীতির উপর ইসলামকর্তৃক আরোপিত দ্বিতীয় পাবন্দির নাম 'নৈতিক পাবন্দি'। কারণ, এমন কিছু বিষয় রয়েছে– যেগুলোর ব্যাপারে ইসলাম নীরব ভূমিকা পালন করেছে। হারামও বলেনি, হালালও বলেনি। অবশ্য উৎসাহিত করেছে সেগুলোর প্রতি। ইতোপূর্বে আমি বলেছিলাম, ইসলাম কোন অর্থনৈতিক মতবাদ নয়। বরং ইসলাম হলো একটি ধর্ম, একটি জীবনব্যবস্থা। যে ধর্মের সর্বপ্রথম শিক্ষা হল আখেরাত শিক্ষা। যে ধর্ম বলে, মানুষের প্রধান লক্ষ হবে আখেরাতের কামিয়াবি। তাই ইসলাম উৎসাহ প্রধান করে, অমুক

কাজ করলে আখেরাতে বহু সাওয়াব পাবে। ইসলাম জাগতিক জীবন সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা দেয় অবশ্যই, কিন্তু তা কেবল জাগতিক লাভের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং ইসলাম জাগতিক ফায়দার সাথে আখেরাত তথা পরকালের ফায়দাও অনিবার্য করে দেয়। এজন্য ইসলাম মানুষের জন্য এমন বিধান দিয়েছে, যেগুলোর মধ্যে হয়ত জাগতিক ফায়দা কম, পরকালীন ফায়দা বেশী। যেমন বলা হয়েছে জীবিকা নির্বাহের তাগিদে প্রত্যেক মানুষই তো বাজারে যেতে হয়। বাজারে গমনকারী মানুষটি যদি এই নিয়তে বাজারে যায় যে, আমি বাজারে যাচ্ছি। আমার বেচাকেনার মাধ্যমে বাজারের অমুক প্রয়োজনটি যেন পূরণ হয়, তাহলে এব্যক্তির এই বাজারে গমনও ইবাদতে পরিণত হবে। এতে সে সাওয়াব পাবে। এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি একজন মানুষের মাঝে থাকলে সে কল্যাণমূলক কাজ করবে। বাজারের ক্রেতা হোক কিংবা বিক্রেতা, সে ওই জিনিসই বেচাকেনা করবে, যা সমাজের প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে সমাজের সকল প্রয়োজন দ্বীন-ধর্মের গন্ডিতে থাকা উচিত। যেমন মনে করুন, মানুষ আনন্দ ও বিনোদনের প্রেমিক। পুঁজিবাদের কথা হল, মানুষের এ বিনোদপ্রেম থেকে ফায়দা লুটে নাও। নাচঘর বানাও, পয়সা কামাও। অথবা মনে করুন, এক ব্যক্তি চাইলো কারখানা করবে, অনেক টাকার অধিকারী হবে। অথচ সেই মুহূর্তে ওই এলাকায় কারখানা অপেক্ষা বাড়ির প্রয়োজন আরো বেশি। বাড়ি বানালে হয়ত বেশি টাকা অসবে না, কিন্তু মানুষের প্রয়োজন তো পূরণ হবে। তাই ওই সময়ের নৈতিক দাবি হবে বাড়ি বানানোর। যেহেতু এতেই রয়েছে পরকালীন ফায়দা।

আইনী পাবন্দি

তৃতীয় পাবন্দি হলো আইনি পাবন্দি। অর্থাৎ- ইসলাম রাষ্ট্রকে এতটুকু ক্ষমতা দিয়েছে যে, রাষ্ট্র যদি মনে করে, বিশেষ পরিস্থিতিতে দেশের অর্থনীতির উপর বিশেষ কোন আইন প্রয়োগ করা হবে, তাহলে রাষ্ট্র তা পারবে। তখন জনগণ রাষ্ট্রকর্তৃক প্রণীত আইনকে শ্রদ্ধাসহ মেনে নিতে হবে। এই মর্মে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে :

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ (سورة النساء ٥٩)

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা বিচারক তাদের।" [সূরা আন-নিসা : ৫৯]

ফুকাহায়ে কেরাম আয়াতটির ব্যাখ্যায় লিখেছেন– যদি সরকার (ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার) বিশেষ কোন কারণে নির্দেশ প্রদান করে, অমুক দিন সকলেই রোযা রাখবে, তাহলে সকলেই এ নির্দেশ পালন করতে হবে। কেউ পালন না করলে রমজানের রোযা ভঙ্গ করার মতই গুনাহ হবে। [শামী : খণ্ড ৪, পৃ. ৪৫৪; রুদুল মাআনী : খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা. ৬৬]

ফকীহগণ আরো লিখেন– যদি সরকার এ নির্দেশ প্রদান করে, জনগণ তরমুজ খাবে না, তাহলে জনগণের জন্য তরমুজ খাওয়া জায়েয হবে না। মোটকথা, দেশের কল্যাণার্থে ইসলাম সরকারের হাতে এতটুকু ক্ষমতা দিয়েছে। কিন্তু শর্ত হলো, সরকার এই ক্ষমতা একমাত্র জনগণের কল্যাণার্থেই প্রয়োগ করতে পারবে। অন্যথায় নয়। সুতরাং সরকার যদি আইন প্রয়োগ করে, অমুক মালে মজুদদারি চলবে আর অমুক মালে মজুদদারি চলবে না, তাহলে ইসলামের সীমারেখার ভিতরে থেকে এরূপ আইন করার ক্ষমতা সরকারের রয়েছে।

সারকথা, পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার মোকাবেলায় ইসলামী অর্থনীতিতে উপরিউক্ত বিশেষত্বসমূহ রয়েছে। জেনে রাখতে হবে, আইনের বিষয়টি পুঁজিবাদেও আছে। তবে পুঁজিবাদের আইন হলো মানবরচিত। আর ইসলামের আইনের মূল নির্দেশক তো সেই সত্তা, যিনি সারা পৃথিবীর স্রষ্টা ও মালিক। তিনিই আইন ক.র বলে দিয়েছেন– অমুক পথে যেও না, অন্যথায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ইসলাম ও পুঁজিবাদের মধ্যে মূল পার্থক্য তো এখানেই। যতদিন মানুষ ইসলামের পথে না আসবে, ততদিন মানবতা এক পথ থেকে আরেক পথে ঘুরপাক খেতে থাকবে।

জীবনের ময়দানে সমাজতন্ত্র আজ মৃতপ্রায়। কিন্তু পুঁজিবাদের অন্যায়-অত্যাচার ও অসমতার কি মৃত্যু ঘটেছে? পুঁজিবাদ তো আজও সক্রিয়। এর সমাধান যদি থাকে, তাহলে ইসলামেই রয়েছে। ইসলাম ছাড়া মুক্তি ও শান্তির আর কোনো পথ নেই। আমাদের ব্যর্থতা, আমরা আজও পারিনি ইসলামী জীবনব্যবস্থার উত্তম কোনো নমুনা বিশ্ববাসীর সামনে পেশ করতে। এ এক কঠিন চ্যালেঞ্জ, যা আমাদের দেশকে গ্রহণ করতে হবে। ইসলামী শিক্ষার

এক বাস্তব দৃষ্টান্ত বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে হবে। ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়ন করে গোটা বিশ্বকে বুঝিয়ে দিতে হবে- ইসলামী জীবনব্যবস্থাই উত্তম বৈশিষ্ট্যের দাবিদার। ইসলামকে বিশ্বের কাছে 'আপন' করে উপস্থাপন করতে হবে।

আমার ধারণা, আপনাদের অনেক সময় নষ্ট করে আমি অনাধিকার চর্চা করেছি এবং একটি রসহীন বিষয়ে আপনাদেরকে ব্যস্ত রেখেছি। ধৈর্য্য ও মনোযোগসহকারে শোনার জন্য আপনাদেরকে শুকরিয়া জানাচ্ছি। আল্লাহ আমাদেরকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দিন। উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

কুরআনের মর্যাদা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَشَفِيْعَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا - اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِىْ لِلَّتِىْ هِىَ اَقْوَمُ - اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِىُّ الْكَرِيْمُ - وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

হামদ ও সালাতের পর –

হযরত উলামায়ে কেরাম, বুযুর্গানে মুহতারাম ও সুপ্রিয় ভাইয়েরা।

আল্লাহ তা'আলার বড়ই করুণা ও মেহেরবানী যে, আজ এমন একটি মাহফিলে শরিক হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছি, যা কুরআন কারীমের শিক্ষাবর্ষ শেষে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যেখানে কিছু মুসলমান সন্তানেরা পবিত্র কুরআনের হেফজ সমাপ্ত করেছে। এই কুরআনে কারীমের শিক্ষাসমাপনী মাহফিলে শরিক হওয়া প্রত্যেক মুসলমানের জন্য বড় সৌভাগ্যের বিষয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এই বরকতের অংশীদার হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমীন।

নেয়ামত এবং কুরআনী সম্পদের মর্যাদা

বর্তমানে আমরা কুরআন মজীদের যথার্থ মর্যাদা ও সম্মান সম্পর্কে অবগত নই। সন্তানদের কুরআন পড়া ও হিফজ সম্পাদন করার দ্বারা আমরা আলহামদুলিল্লাহ আবেগপ্রবণ হই। কিন্তু বাস্তব কথা হলো, এই পৃথিবীতে থাকা অবস্থায় পবিত্র কুরআনের কদর ও মূল্যের সঠিক অনুমান সম্ভব নয়। কারণ, কুরআনের এই দৌলত আল্লাহর ফযলে আমরা ঘরে বসেই পেয়েছি। এই মহান দৌলত লাভ করার জন্য আমাদেরকে কোন কষ্ট করতে হয়নি বা জান-মালের কুরবানী দিতে হয়নি। কিংবা কোনো প্রচেষ্টাও চালাতে হয়নি। তাই এই মহান দৌলতের সঠিক মর্যাদা আমাদের বোধগম্য নয়। এই দৌলতের যথার্থ মর্যাদা দিয়েছেন হযরত সাহাবায়ে কেরাম (রা.)। তাঁরা কুরআনের এই দৌলত অর্জনের জন্য জান-মাল ও ইজ্জত-আবরুর নজিরবিহীন কুরবানী পেশ করেছেন।

কুরআনে কারীম এবং সাহাবায়ে কেরাম

সাহাবায়ে কেরাম পবিত্র কুরআনের এককেটি আয়াত শিক্ষার জন্য যে কষ্ট-ক্লেশ ও মেহনত করেছেন, সে ব্যাপারে আমরা সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল নই।

কুরআন মজীদকে বাঁধাইকৃত মনোমুগ্ধকর গ্রন্থাকারে আমরা পেয়েছি। সর্বত্র মাদরাসা পাচ্ছি। উসতাদ পাচ্ছি, সহজেই কুরআন শিক্ষার আসর পাচ্ছি। আমাদের কাজ শুধু খাবারের লোকমার ন্যায় মুখে নেয়া। কিন্তু তারপরও যথাযথভাবে সহীহ-শুদ্ধ করে শিখতে পারছি না।

কুরআনে কারীমের সঠিক মর্যাদা কি, ওইসব সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করুন, যাঁরা ছোট্ট একটি আয়াতের শিক্ষা নিতে গিয়ে মার খেয়েছেন, কাফেরদের জুলুম-নির্যাতন সহ্য করেছেন। এ সম্পর্কে সহীহ বুখারীতে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে—

একজন অল্প বয়স্ক সাহাবী, যার বাড়ি মদীনা থেকে বেশ দূরে হওয়ায় এবং ব্যক্তিগত অপারগতার কারণে মদীনায় এসে কুরআন শিক্ষা করা কষ্টসাধ্য ছিল। মুসলমান হয়েছেন, কিন্তু মদীনায় নবী করিম (সা.)-এর খেদমতে এসে কুরআন শিক্ষা করা তাঁর পক্ষে কঠিন ব্যাপার ছিল। উক্ত সাহাবী নিজেই বর্ণনা করেন, 'আমি প্রতিদিন ওই রাস্তায় চলে যেতাম, যেখান দিয়ে মদীনার কাফেলা আসা-যাওয়া করতো। যখনই কোনো কাফেলার সাথে সাক্ষাত হতো, তাদেরকে বলতাম, ভাই, তোমরা কি মদীনা থেকে এসেছো? কুরআনে কারীমের কোনো

আয়াত তোমাদের স্মরণে আছে কি? যদি কারো কুরআন শরীফের কোনো আয়াত স্মরণ থাকে, তাহলে আমাকে তা শিখিয়ে দাও। কাফেলার কারো এক আয়াত, কারো দু'আয়াত, কারো বা তিন আয়াত হয়তো মুখস্থ থাকতো। এভাবে কাফেলা থেকে এক দু'আয়াত করে শিখতে শিখতে আলহামদুলিল্লাহ এখন আমার নিকট কুরআনের এক বিরাট অংশ জমা হয়ে আছে।'

তাই বলছি, তাঁদের কাছে কুরআনের মর্যাদা জিজ্ঞেস করুন, যাঁদের এক একটি আয়াত শিক্ষার জন্য কাফেলার লোকদের তোষামোদ করতে হয়েছে। অসহনীয় পরিশ্রমের কারণে তারা কুরআনের যথার্থ মর্যাদা উপলব্ধি করতে পেরেছেন। কিন্তু আমরা বিনা পরিশ্রমে ঘরে বসেই হাতের নাগালে পাওয়ার কারণে তার মূল্যায়ন উপলব্ধি করতে পারছি না।

হযরত উমর (রা.)-এর এক বোন এবং তার স্বামীর ঘটনা সর্বজনবিদিত, প্রায় সকলেই ঘটনাটি অবগত। তারা উভয়ে জানতেন, আমরা যদি এই কুরআন উমর (রা.)-এর সামনে পড়ি, তাহলে তিনি আমাদেরকে বাধা দিবেন। (কারণ, তখনও তিনি মুসলমান হননি)। উপর্যপুরি তিনি আমাদের উপর নির্যাতন চালাবেন। তাই তারা গোপনে গোপনে কুরআন পড়তো। একদিন উমর (রা.) হুযূর (সা.)-কে হত্যার উদ্দেশ্যে বের হন। পথিমধ্যে কেউ তাকে বললো, অন্যকে তো ইসলাম গ্রহণে বাধা করছো, কিন্তু ঘরের খবর তো রাখো না। একথা শুনে তিনি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন এবং বাড়িতে ফিরে আসেন। এসে দেখেন, বোন ও বোনের স্বামী পবিত্র কুরআন খুলে সূরা ত্বহা তেলাওয়াত করছেন। এ অবস্থা দেখে তিনি বোন ও বোনের স্বামীকে খুব মারধর করলেন। যাক, দীর্ঘ ঘটনা, যা খুবই প্রসিদ্ধ।

বলতে চাচ্ছিলাম, আমরা বিনাকষ্টে ঘরে বসেই কুরআন পেয়েছি। তাই তার মূল্য বুঝি না। যেদিন মৃত্যু আসবে, পার্থিব চাকচিক্য ছেড়ে কবরে চলে যাবো, সেদিন এক একটি আয়াতের নূর এবং তার বিনিময়ে অগণিত নেয়ামত ও পুরস্কার দেখে কুরআনের কদর বুঝে আসবে।

কুরআন তেলাওয়াতের প্রতিদান

এক হাদীসে বর্ণিত আছে, নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেছেন, যখন কেউ কুরআন তেলাওয়াত করে, তার জন্য প্রতিটি হরফের পরিবর্তে দশ নেকী লেখা হয়। অতঃপর হুযূর (সা.) আর একটু ব্যাখ্যা করে বলেন, 'আমি বলি না যে,

'আলিফ-লাম-মীম' এক হরফ; বরং 'আলিফ' একটি হরফ, 'লাম' একটি হরফ এবং 'মীম' একটি হরফ। সুতরাং যে ব্যক্তি 'আলিফ লাম মীম, তেলাওয়াত করবে সে ত্রিশটি নেকী লাভ করবে। কেউ কেউ বলে, 'কুরআন শরীফের অর্থ না বুঝে পড়লে কী লাভ? এটা তো হিদায়াতের একটি নুস্খা বা পথনির্দেশিকা, মানুষ তাকে অর্থসহ বুঝে পড়লে ও আমল করলেই তবে উপকৃত হবে। কেবল তোতা-ময়নার মতো পড়লে ও আমল করলে কোন লাভ হবে না।' অথচ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, এই কুরআন এমন এক প্রেসক্রিপশন, যে ব্যক্তি অর্থ বুঝে তার উপরে আমল করবে তার জন্য তো মুক্তির কারণ হবেই। কিন্তু যে ব্যক্তি না বুঝে কেবল তেলাওয়াত করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকেও প্রতি অক্ষরে দশ নেকী করে দান করবেন।

কুরআনে কারীমের প্রতি উদাসীনতার কারণ

কুরআন তিলাওয়াতের এসব নেকীর প্রতি আমাদের মনের আকর্ষণ, স্পৃহা বা বিশেষ কোনো আগ্রহ নেই কেন? তিলাওয়াতের মাধ্যমে নেক অর্জন করার জন্য আমরা চেষ্টা কেন করি না? এর কারণ হলো, 'নেকি' দুনিয়ার কোনো সম্পদ নয়। দুনিয়ার কোনো টাকা-পয়সাকে নেকী বলা হয় না। যদি বলা হয় 'আলিফ-লাম-মীম' পড়লে ত্রিশ টাকা পাবে। আলিফের জন্য দশ টাকা পাবে, লামের জন্য পাবে দশ টাকা আর মীমের জন্য মিলবে দশ টাকা, তাহলে তার জন্য মনের আগ্রহ ও অনুভূতি সৃষ্টি হত। মানুষ এর জন্য দৌড়ে আসতো এবং বলতো, 'আলীফ-লাম-মীম' পড়ো আর বিনা পরিশ্রমে ত্রিশ টাকা কামাই কর। কিন্তু নেকীর কথা বলার কারণে বিশেষ কোনো আকর্ষণ জাগে না। মনে কোনো আগ্রহ জন্মে না। কারণ, দুনিয়াতে টাকার মূল্য জানা আছে, নেকীর মূল্য জানা নেই। নেকীর সম্পদ তো পার্থিব জগতে অচল। এর দ্বারা তো কোনো গাড়ি-বাড়ি, বাংলো মিলবে না। তাই এর প্রতি আকর্ষণও জাগে না। যেদিন চোখ বন্ধ হবে, প্রাণপাখি উড়ে যাবে, জবাবদিহিতার জন্য আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে দণ্ডায়মান হবে, সেদিন নেকীর প্রকৃত কদর বুঝে আসবে।

প্রকৃত অভাবী কে?

হাদীস শরীফে এসেছে, একদা নবী কারীম (সা.) সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, 'বলো তো প্রকৃত অভাবী কে? দরিদ্র বা অভাবী এর অর্থ কি?'
সাহাবায়ে কেরাম উত্তর দিলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! যার কাছে অর্থ-সম্পদ নেই,

সে-ই তো দরিদ্র্য।' রাসূল (সা.) জানালেন, সে সত্যিকারের দরিদ্র্য নয়। আমি তোমাদের বলছি, সত্যিকারের দরিদ্র ওই ব্যক্তি, যখন সে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে উপস্থিত হবে, তখন নেক দ্বারা তার মীযানের পাল্লা পরিপূর্ণ হবে। যেমন নামায- রোযা, তাসবীহ-তাহলীল, যিকির-আযকার, তালীম প্রভৃতি গুরুত্বসহ আদায় করেছে। তাবলীগ করেছে, দ্বীনের বিভিন্ন খেদমত আঞ্জাম দিয়েছে, অথচ যখন তার সমস্ত নেক আল্লাহর দরবারে পেশ করা হবে, দেখা যাবে নেকের তো কমতি নেই। নামায-রোযা, হজ্জ-যাকাত, সবকিছুই করেছে, কিন্তু বান্দার হক আদায় করেনি। কাউকে হয়তো মেরেছে, গালি দিয়েছে, কারো অন্তরে কষ্ট দিয়েছে, কারো গীবত করেছে, কারো প্রাণের উপর হামলা করেছে, কারো মাল বলপূর্বক নিয়ে গিয়েছে, কারো ইজ্জতের উপর হামলা করেছে– এভাবে আল্লাহর হক আদায় করেছে। কিন্তু পাশাপাশি মানুষকেও কষ্ট দিয়েছে। এখন যখন সে আল্লাহর দরবারে হাজির হয়েছে, সেখানে তো ইনসাফ ও ন্যায় বিচার হবে। তাই যার হক আত্মসাৎ করেছে, তাকে বলা হবে, তুমি এই ব্যক্তি থেকে স্বীয় হক আদায় করে নাও। কিন্তু কেয়ামতের ময়দানে তো টাকা-পয়সার হিসাব চলবে না। সুতরাং হক আদায় করবে কিভাবে? আল্লাহ তা'আলা বলবেন, এখানে টাকা পয়সার হিসাব চলবে না, চলবে নেকের হিসাব। যেসব নেক আমল সে দুনিয়াতে করেছিলো, ওগুলোর মাধ্যমে বদলা নেয়া হবে। যার টাকা মেরে খেয়েছিল, তাকে বলা হবে সে যেন তার হক পরিমাণ নেকী এর আমলনামা থেকে আদায় করে নেয়। এভাবে অন্যান্য নামায দ্বিতীয় হকদার নিয়ে যাবে। রোযা তৃতীয় হকদার নিয়ে যাবে। হজ্জ নিয়ে যাবে চতুর্থ হকদার। শেষ পর্যন্ত তার কৃত সকল নেক আমল হকদারগণ নিয়ে যাবে। সে হয়ে পড়বে একেবারে নিঃস্ব। কিছুই তার অবশিষ্ট থাকবে না। এরপরও কিছু লোক দাড়ানো থাকবে। অনুযোগের সুরে বলবে 'হে আল্লাহ! আমাদের হক তো পেলাম না, আমাদের টাকাও তো সে মেরেছিল। কিংবা আমাদেরকে গালমন্দ বলেছিল, গীবত করেছিল, তাই তার থেকে আমাদের হকও আদায় করে দিন। কিন্তু তার কাছে তো আর নেকী নেই, হক কিভাবে আদায় করা হবে? আল্লাহ তা'আলা বলবেন, এবার তোমার কৃত গুনাহগুলো তোমাদের আমলনামা থেকে মুছে দিয়ে তার আমলনামায় দিয়ে দাও। এতটুকু বর্ণনা দেয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, এ ব্যক্তি নেকের স্তূপ নিয়ে এসেছিল,অথচ কোনো নেক আমল তার আমলনামায় থাকলো না।

বরং উল্টো আরো কিছু গুনাহ তার কাঁধে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলে আসলো। তাই নবীজি (সা.) এর ভাষায়– 'প্রকৃত অভাবী সেই ব্যক্তি, যে নেক নিয়ে এসেছিল, গুনাহ নিয়ে ফিরে গেল।"

বান্দার হকের গুরুত্ব

অতএব, বান্দার হকের ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকতে হবে। কারণ, কেউ কারো হক নষ্ট করলে– তা যে হকই হোক না কেন। অর্থ-সম্পদ, ইজ্জত-সম্মান, কিংবা প্রাণের সাথে সম্পর্কীয় হক– যাই হোক না কেন, এটা এত ভয়ংকর ব্যাপার যে, অন্যসব গুনাহ তাওবার মাধ্যমে মাফ হয়ে যায়; কিন্তু বান্দার হক শুধু তাওবার মাধ্যমে মাফ হয় না।

নাউযুবিল্লাহ কেউ যদি শরাব পান করে, ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, জুয়া খেলে কিংবা অন্য কোনো গুনাহ করে আর আল্লাহর দরবারে খালেছ অন্তরে তাওবা করে এবং ইসতেগফারের দোয়া পড়ে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার গুনাহ মাফ করে দেন। ইসতেগফারের দোয়াটি হচ্ছে–

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّأَتُوْبُ إِلَيْهِ

আমি আমার রব আল্লাহ তা'আলার নিকট সকল গুনাহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তার কাছে তাওবা করছি।

অন্য এব হাদীসে হুযূর (সা.) ইরশাদ করেন–

اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهٗ

'গুনাহ থেকে তাওবাকারী সেই ব্যক্তির মত, যার কোন গুনাহ নেই।

এর বিপরীত হচ্ছে বান্দার হক। কেউ বান্দার হক মেরে খেলে তা কেবল তাওবা দ্বারা মাফ হয় না; বরং হকদার ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত মাফ না করবে, মাফ হবে না। তাই বান্দার হকের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকা উচিত।

একটু পূর্বে মাদরাসাটি দেখার জন্য উপরের তলায় গিয়েছিলাম। অন্তরে পুলক অনুভব করলাম। আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তা'আলা জাহেরী-বাতেনী সমূহ নেয়ামত দ্বারা পরিপূর্ণ করেছেন। দ্বীনের সত্যিকারের সন্ধানী এখানে তৈরী হচ্ছে, 'মাশাআল্লাহ' বহু বড় কাজ হচ্ছে। কিন্তু উপরে যখন বসলাম, তখন মাইকের আওয়াজ খুব জোরে আসছিল। এত জোরে আসছিল যে, আকাশ, বাতাস প্রকম্পিত করে তুলছিল। আমি আরজ করলাম, আওয়াজ আরেকটু

কমানো প্রয়োজন। আরো আরজ করলাম, কিছুলোক যদি কথা-বার্তা শোনার জন্য কোথাও একত্রিত হয়, তাহলে শরীয়তের বিধান হলো, আওয়াজ এই পরিমাণ হবে, যে পরিমাণ হলে উপস্থিত লোকজন সুন্দরভাবে শুনতে পারে। সমস্ত মহল্লাবাসী কিংবা শহরবাসীকে শুনানো কয়েক কারণে না-জায়েয। সবচেয়ে বড় কারণ হলো, এই আওয়াজের কারণে আল্লাহর যেসব বান্দা অসুস্থ আছেন কিংবা ঘুমোতে চাচ্ছেন, তাদের কষ্ট হচ্ছে এবং ঘুমের ব্যাঘাত ঘটছে। আমরা আনন্দিত, কারণ আমাদের আওয়াজ ইথারে ভেসে দূর-দূরান্তে চলে যাচ্ছে। কিন্তু কেয়ামতের দিন যখন বলা হবে তোমাদের আওয়াজের কারণে আমার এক বান্দা কষ্ট পেয়েছে, বলো, এর কী জবাব তোমাদের কাছে আছে?

মুসলমান কে?

রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন–

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهٖ وَيَدِهٖ

'প্রকৃত মুসলমান ওই ব্যক্তি, যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। অর্থাৎ তার হাত ও যবান দ্বারা যেন কেউ কোনো কষ্ট পায় না।

আমরা তো মনে করছি, আমরা দ্বীনের কথা বলছি। তবে দ্বীনের কথা বলা বা প্রসার করার ক্ষেত্রেও শরীয়তে নিয়ম নির্ধারণ করা আছে। নিয়মের একটি হলো, কেউ আপনার কথা শুনতে না চাইলেও আপনি তার কানের উপর মাইক ফিট করে জবরদস্তি করে দ্বীনের কথা শোনাতে পারবেন না। এটা আপনার জন্য জায়েয হবে না।

হযরত উমর (রা.) একবার মসজিদে নববীতে তাশরীফ আনলেন। দেখলেন, এক ব্যক্তি ওয়াজ করছেন। লোকেরা জমে বসে আছে। শ্রোতার সংখ্যা অল্প। কিন্তু ওয়ায়েজ উচ্চৈঃস্বরে ওয়াজ করে যাচ্ছেন। ফলে বাইরে অনেক দূর আওয়াজ যাচ্ছে। হযরত উমর (রা.) তাকে ডেকে এনে বললেন, হে ওয়ায়েজ, তোমার উপস্থিত শ্রোতাবৃন্দ শুনতে পারে এর মতো করে ওয়াজ কর। এর বাইরে তোমার আওয়াজ যাওয়া উচিত নয়। এরপরেও যদি তোমার আওয়াজ বাইরে যায়, তাহলে শোনো, আমি আমার দোররা কাজে লাগাবো। কারণ, বাইরের লোক তো শুনতে আগ্রহী নয়। আগ্রহী হলে তোমার এখানে বসে শুনবে। ওই যামানায় তো মাইকের প্রচলন ছিল না, এমনিতেই একটু উচ্চৈঃস্বরে আওয়াজ হচ্ছিল। আর এতেই হযরত উমর (রা.) বাধা দিলেন।

আজ যদি হযরত উমর (রা.) বেঁচে থাকতেন, বহু ওয়ায়েজের পিঠে বেত্রাঘাত পড়তো। আজকাল আমরা সচরাচর এমন কাজ করি, যা দ্বীনের পরিপন্থী এবং নাজায়েয।

হযরত আয়েশা (রা.)-এর কামরা মসজিদে নববীর সাথে লাগানো ছিল। সেখানে রাসূলও (সা.) আরাম করতেন। হযরত আয়েশা (রা.)-এর অভ্যাস ছিল তিনি জুম'আর নামাযের পর কিছুক্ষণ আরাম করতেন। সেখানে মাঝে মাঝে এক লোক ওয়াজ করার উদ্দেশ্যে আসতেন এবং খুব উঁচু গলায় ওয়াজ করতেন। হযরত আয়েশা (রা.) তাকে খবর পাঠালেন, আপনার ওয়াজ চলাকালীন কেবল ওই পরিমাণ আওয়াজে ওয়াজ করবেন, যে পরিমাণ শ্রোতা উপস্থিত আছে। কিন্তু লোকটি কথা শুনলো না, বরং উত্তর দিল, আমি তো দ্বীনের কথা শোনাচ্ছি এবং দ্বীনের তাবলীগ করছি। এতে হযরত আয়েশা (রা.) হযরত উমর (রা.) এর নিকট অভিযোগ করে বললেন, এই লোক এখানে এসে উচ্চৈঃস্বরে ওয়াজ করে আমার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়, আপনি তাকে নিষেধ করে দিন।

নববী শিক্ষা

রাসূল (সা.) আমাদেরকে দ্বীনের সব তরীকা শিক্ষা দিয়েছেন। অথচ আমরা আজ না জানি কোন জিনিসকে দ্বীন মনে করছি। রাসূল (সা.) যখন তাহাজ্জুদের উদ্দেশ্যে উঠতেন, তখন যেভাবে উঠতেন, তা হাদীস শরীফে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। হাদীস শরীফে এসেছে قَامَ رُوَيْدًا রাসূল (সা.) খুব সতর্কতার সাথে আস্তে আস্তে উঠেছেন وَفَتَحَ الْبَابَ رُوَيْدًا এবং দরজা খুব সন্তর্পণে খুলেছেন। অর্থাৎ এমনভাবে উঠতেন, যেন আয়েশা (রা.) এর ঘুমে ব্যাঘাত না ঘটে। যে আয়েশা (রা.) হুযূর (সা.)-এর প্রতিটি নির্দেশ পালনার্থে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন এবং প্রয়োজনে প্রাণ উৎসর্গ করার জন্যও প্রস্তুত ছিলেন, তাঁর জন্য এই ঘুম তো নিতান্ত মামুলী ব্যাপার। রাসূল (সা.)-এর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তিনি এমন লাখো-কোটি ঘুম কোরবান করতে প্রস্তুত ছিলেন। তবুও এর মাধ্যমে রাসূল (সা.) এ শিক্ষাই দিলেন যে, তোমার ইবাদত এমনভাবে করা উচিত, যেন তা অন্যের কষ্টের কারণ হয়ে না দাঁড়ায়। একেই বলে বান্দার হক, যা রাসূল (সা.)-এর শিক্ষার মধ্যেই পাওয়া যায়। অথচ আমরা আজ দ্বীনের কোনো কথা বলতে চাইলে তা যেন সারা দুনিয়ার মানুষকে

বলপূর্বক হলেও শোনাতে হবে। কেউ ঘুমে থাক, কিংবা অসুস্থ থাক তাতে আমাদের কী আসে যায়। এটা যে গুনাহর কাজ তা আমরা কল্পনাও করি না।

মুসলমানের মান-সম্ভ্রম

মদ খাওয়া, চুরি করা, ডাকাতি করা, যিনা করা ইত্যাদির মতো কোনো মুসলমানকে কষ্ট দেয়াও একটি কবীরা গুনাহ। ইবনে মাজাহ শরীফের একটি হাদীসে রয়েছে, একদা মহানবী (সা.) বাইতুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করছিলেন। সাথে ছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)। তিনি বলেন, আমি দেখতে পেলাম, রাসূল (সা.) কা'বা শরীফকে লক্ষ্য করে বলেছেন, 'হে আল্লাহর ঘর, তুমি কতই না সম্মানিত, কতই না পবিত্র।' একটু পর রাসূল (সা.) আবার বলেন, 'হে আল্লাহর ঘর, তবে এমন একটি জিনিস আছে, যার সম্মান ও পবিত্রতা তোমার চেয়ে অধিক।' আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, একথা শুনে আমার কান একেবারে খাড়া হয়ে গেল। আমি ওৎ পেতে রইলাম যে, এমন কোন জিনিস, যার সম্মান ও পবিত্রতা এই কা'বা শরীফ থেকেও বেশি। এরপর শুনতে পেলাম, 'তাহলো, একজন মুসলমানের জান-মাল ও মান-সম্মান।'

উক্ত হাদীসটির মর্ম হলো, কোনো মুসলমানের জান-মাল কিংবা ইজ্জত-সম্মানের উপর আঘাত করা মানে কা'বা শরীফ ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দেয়া। উভয়টির গুনাহর পরিমাণ এক ও অভিন্ন। এবার একটু চিন্তা করুন, ইসলাম একজন মুসলমানের জান-মাল ও সম্মানে'র প্রতি কতটুকু শ্রদ্ধাশীল। আল্লাহ না করুন, কাবাতো বলছি, আল্লাহ না করুন। কোনো বদবখত যদি কা'বা শরীফ ভাঙ্গার ষড়যন্ত্র করে, তাহলে কোনো মুসলমান কি তা কখনো সহ্য করবে? অথচ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আজ কত বাইতুল্লাহ টুকরা হয়েছে। মুসলমানের জানের মূল্য যেন মশা-মাছি মারার মতই স্বাভাবিক ব্যাপার। অথচ প্রাণে মারা তো অনেক দূরের কথা, একজন মুসলমানকে কষ্ট দেয়াও রাসূল (সা.) কবীরা গুনাহ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এই জন্যই তো তিনি বলেছেন, সবচেয়ে অভাবী ওই ব্যক্তি, যে কেয়ামতের দিন নেক আমলের পাহাড় নিয়ে উপস্থিত হবে; কিন্তু তার নেক আমল সবই অন্যের হক মারার কারণে হকদারকে দিয়ে দিতে হবে। পরন্তু তার আমলনামায় হকদারের গুনাহও চলে আসবে।

ইসলাম ধর্মের হাকীকত

আজ আমরা আনুষ্ঠানিক কয়েকটি ইবাদতকেই দ্বীন মনে করছি। যেমন নামায- রোযা-হজ্জ-যাকাত জাতীয় ইবাদতকেই কেবল দ্বীন ভাবছি। এসব ইবাদত তো অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার অনেক বড় নেয়ামত। তবে ইসলাম কেবল এগুলোর মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। দ্বীনের ইলম- যার অপর নাম ইলমে ফিক্বহ- চারভাগে বিভক্ত। এর মধ্যে কেবল একটি ভাগের সম্পর্ক ইবাদতের সাথে। আর অবশিষ্ট তিন ভাগ হুকুকুল ইবাদ তথা বান্দার হক সম্পর্কীয়। অথচ আমরা বান্দার হকের বিষয়টি দ্বীনের বহির্ভূত করে দিয়েছি। এই হক নষ্ট করে কেউ একথা পর্যন্ত মনে করে না যে, এর দ্বারা গুনাহ হয়েছে। কিংবা আমার জন্য এটি বৈধ হয়নি বা এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট হয়েছেন। এমন একটি জঘন্য গুনাহের মাফ কেবল তাওবা দ্বারা লাভ হয় না। বরং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছেও মাফ চেয়ে নিতে হয়। বর্তমান যামানা তো ঘুষের যামানা। এই ঘুষের মাধ্যমে অপরকে কষ্ট দেয়া হচ্ছে। টাকা-কড়ি আত্মসাৎ করা হচ্ছে- এসব কিছুই বান্দার হকের শামিল। অপরকে কষ্ট দেয়া মানেই বান্দার হক নষ্ট করা। যাক, উক্ত হাদীসের আলোকে অনেক কথাই বলে ফেলেছি। সর্বোপরি কথা হলো, আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে আমল করার তাওফীক দিন এবং বান্দার হকের গুরুত্ব আমার হৃদয়ে প্রোথিত করে দিন। আমীন! উক্ত আলোচনার অবতারণা এজন্য করলাম, যেহেতু আমরা প্রকাশ্য ও নির্দিষ্ট কয়েকটি ইবাদতকেই দ্বীন মনে করছি। আমাদের অন্তরে নেকের কোনো মূল্য নেই। টাকা-পয়সাকেই একমাত্র সম্পদ মনে করছি। আল্লাহ পাক আমাদেরকে বুঝবার তাওফীক দান করুন। আমীন।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

আমার আব্বা হযরত মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) পাকিস্তানের মুফতিয়ে আজম ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর রহম করুন। তিনি নিজের ছোটবেলার একটি ঘটনা শোনাতেন। আল্লাহর প্রিয় বান্দারা ছোট ছোট ঘটনা থেকেও অনেক উপদেশ গ্রহণ করে। তিনি বলেন, আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন একদিন আমার ভাইয়ের সাথে খেলাধুলা করছিলাম। তখনকার যুগের বাচ্চাদের খেলা বর্তমান যুগের বাচ্চাদের মতো ছিল না।বাচ্চারা নল বা খাগড়া কেটে টুকরা টুকরা করে খেলতো। এক বাচ্চা নিজের টুকরা নিচের দিকে ছেড়ে

দিত আর অন্য বাচ্চাও তার অনুসরণ করতো। যার নলের টুকরা আগে পৌঁছতো, সে নিজে গিয়ে তার সাথী থেকে একটি নলের টুকরা নিয়ে নিতো। তিনি বললেন, একবার আমি এবং আমার ভাই অনেকগুলো নলের টুকরা জোগাড় করে উভয়ে উক্ত খেলা খেলছিলাম। কিন্তু আমি আমার ভাইয়ের কাছে পরাজয় বরণ করি। আমার সব টুকরা এক এক করে আমার ভাই নিয়ে নেয়। এখন আমার কাছে আর কোন নলখণ্ড নেই। অথচ আমার ভাইয়ের কাছে ডাবল হয়ে গেলো। আব্বাজানের বর্ণনা, আমি খেলায় জিততে না পেরে এত বেশি দুঃখ পেয়েছি এবং কেঁদেছি যে, আমার এখনও মনে পড়ে এরপর আর কোনো মুসিবতেও মনে হয় এমন কাঁদিনি। আমি তখন মনে করেছিলাম, আমার সর্বস্ব লুট হয়ে গেছে, আমার জীবন শেষ হয়ে গেছে।

তারপর আব্বাজান বলেন, আজ যখন ঘটনাটি মনে পড়ে, তখন খুব হাসি পায়। ভাবি, কত বড় বোকা ছিলাম তখন। কিসের জন্য ছিলো আমার এই দুঃখ-কান্না? একেবারে মূল্যহীন সামান্য কিছু নল-টুকরার জন্যই তো। ঠিক তেমনি এ দুনিয়া ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সা, বাড়ি-গাড়ি এরকম নলটুকরোগুলোর মতো মূল্যহীন। অথচ আজ আমাদের এগুলোর জন্য কত মায়াকান্না আর হা-হুতাশ। যেদিন আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবে, সেই আখেরাতের দিন টের পাবে, এসব পার্থিব সম্পদ, জাগতিক বস্তু সেখানে একেবারেই মূল্যহীন। কানা-কড়িও মূল্য নেই এগুলোর। সেদিন নিজেকে আহম্মক ও অসহায় মনে হবে। যার জন্য এত মায়াকান্না তা কোনো কাজে আসবে না।

জান্নাতের শান্তি ও জাহান্নামের অশান্তি

হাদীস শরীফে এসেছে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা এমন এক ব্যক্তিকে ডেকে পাঠাবেন যে আজীবন দুঃখ-বেদনা, কষ্ট-ক্লেশ এবং অশান্তিতে অতিবাহিত করেছে। তাকে প্রশ্ন করা হবে, তোমার জীবন কেমন কেটেছে? সে উত্তর করবে, 'হে পারওয়ারদেগার! আমার জীবন এত দুঃখ-কষ্ট বালা-মুসিবত এবং অশান্তিতে কেটেছে যে, পুরো জীবনে আনন্দের কোন কিছু মনে পড়ে না। জীবনের পাতা উল্টালেই দুঃখ আর কষ্ট দেখতে পাই।' আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে বলবেন, তাকে জান্নাতের বাইরে থেকে কিছু বাতাস লাগিয়ে আনো। ফেরেশতারা তাকে নিয়ে জান্নাতের বহিঃআঙ্গিনা থেকে চক্কর দিয়ে

আনবেন। জান্নাতের কিছু বাতাস তার শরীর-মন স্পর্শ করবে। অতঃপর তাকে পুনরায় জিজ্ঞেস করা হবে, এবার বলো জীবন কেমন কাটিয়েছো? সে উত্তর দিবে, 'প্রভু হে, আমার জীবন তো এত সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে কেটেছে যে, দুঃখ কষ্ট কী জিনিস, কখনো দেখিনি।' অর্থাৎ- জান্নাতের একটু বাতাসের স্পর্শ পেয়ে সে দুনিয়ার জীবনের দুঃখ-কষ্ট আর অশান্তির কথা সম্পূর্ণ ভুলে যাবে।

অতঃপর বলবেন, 'এবার এমন এক ব্যক্তিকে ডাকো, যে দুনিয়াতে কোনোদিন কোনো দুঃখ কষ্ট দেখেনি। বরং পুরো জীবনটা সে পরম শান্তিতে কাটিয়েছে। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমার জীবন কেমন কেটেছে?' সে বলবে, 'হে আল্লাহ, পরম সুখ-শান্তি ও তৃপ্তিতে কেটেছে আমার জীবন। পুরো জীবনে কখনো অশান্তির গন্ধও পাইনি। বলা হবে, এই লোকটিকে জাহান্নামের বাইরে থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসো। জাহান্নামের কিছু বাতাস যেন সে আঁচ করতে পারে এমনভাবে চক্কর দিয়ে নিয়ে আসো। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, এখন বলো, তোমার জীবন কেমন কেটেছে? সে উত্তর দিবে, হে আল্লাহ, পুরো জীবন এত কষ্ট-ক্লেশ আর দুঃখ-বেদনায় অতিক্রম হয়েছে যে, জীবনে একটিবারের জন্যও শান্তির ছোঁয়া পাইনি। অর্থাৎ জাহান্নামের এক মুহূর্তের বাতাস এত কষ্টদায়ক যে, যার কারণে পুরো জীবনের আনন্দ, সুখ-শান্তি-সবকিছুই ভুলে যাবে। জান্নাতের শান্তি ও জাহান্নামের অশান্তি এমনই, যার তুলনায় দুনিয়ার শান্তি-অশান্তি কিছুই নয়। অথচ আমাদের অবস্থা হলো, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমরা একটিমাত্র চিন্তায় তাড়িত থাকি যে, কিভাবে আমি টাকা-পয়সা অর্থ-সম্পদের কুমির হবো। আখেরাতের সফলতার জন্য আমরা মোটেও চিন্তিত নই।

একটি বিষয়ে জগতের সবাই একমত

বস্তুত, দুনিয়ার প্রতিটি বিষয়ে মানুষের মাঝে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। প্রতিটি বিষয়ে কিছু না কিছু মতানৈক্য অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু এমন একটি বিষয় আছে, যার মধ্যে কোনো মানুষের মতানৈক্য নেই। সকলেই বিষয়টির ব্যাপারে একমত। তাহলো- মৃত্যু। মৃত্যুকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। অনেকে

আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করেছে, রেসালত অস্বীকার করেছে, কিন্তু মৃত্যুকে অস্বীকার করতে পারেনি। যত বড় নাস্তিক কিংবা কাফিরই হোক, মৃত্যুকে স্বীকার করতে বাধ্য। মৃত্যু এক কঠিন বাস্তবতা। পাশাপাশি এটাও সর্বজনবিদিত যে, মৃত্যুর নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই। যেকোন মুহূর্তে চলে আসতে পারে। কখন আসবে, কেউ বলতে পারে না।

একটি বিরল ঘটনা

মনে রাখার মতো একটি বিস্ময়কর ঘটনা। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে ঘটনাটি থেকে উপদেশ গ্রহণ করার তাওফিক দান করুন। আমীন। একবার হযরত উমর ফারুক (রা.) কোথাও সফরে বের হলেন। পথিমধ্যে তাঁর খুব ক্ষুধা পেলো। সে যুগ তো আর বর্তমান যুগের মতো হোটেল-রেস্টুরেন্টের যুগ ছিলো না যে, ক্ষুধা পেলেই খেয়ে নিবে। তাই হযরত উমর (রা.) অনেক খোঁজাখুঁজি করলেন আশেপাশে কোথাও কোনো বস্তি আছে কিনা। কিন্তু কোথাও কোনো বস্তি দৃষ্টিগোচর হলো না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর দেখতে পেলেন, বকরীর একটি পাল ময়দানে বিচরণ করছে। মনে মনে ভাবলেন, রাখালের কাছ থেকে কিছু দুধ নিয়ে ক্ষুধা মেটানো যাবে। তিনি লক্ষ্য করলেন, রাখাল বকরী চরাচ্ছে। তাকে গিয়ে বললেন, 'আমি একজন মুসাফির, খুব ক্ষুধার্ত, একটি বকরী থেকে আমাকে কিছু দুধ দিয়ে দাও, এর মূল্য হিসেব করে যা চাইবে তা তোমাকে দিয়ে দিবো।' রাখাল বললো, জনাব, আমি অবশ্যই আপনাকে দুধ দিতাম, কিন্তু বকরী তো আমার নয়। তাই আমার মালিকের অনুমতি ব্যতীত আপনাকে দুধ দিতে পারি না। আমি তো মালিকের চাকর মাত্র। তিনি আমাকে বকরী চরানোর দায়িত্ব দিয়েছেন, দুধ দেবার দায়িত্ব নয়। হযরত উমর (রা.) মাঝে মধ্যে মানুষকে পরীক্ষাও করতেন। তিনি রাখালকে বললেন, 'আমি তোমার উপকারার্থে একটা কথা বলতে পারি, তবে তুমি যদি তার উপর আমল কর।' রাখাল বললো, 'কি সেটা?' তিনি বললেন, 'একটি বকরী আমার কাছে বিক্রি করে দাও, আমি এখনই তার মূল্য নগদ দিয়ে দিবো। এতে আমার লাভ হবে, আমি দুধ খেতে পারলাম, প্রয়োজনে জবেহ করে তার গোশতও খেতে পারবো। আর তোমার লাভ হলো, মালিক যখন জিজ্ঞেস

করবে, বকরীটি কোথায় গেলো? তুমি বলে দিবে, বাঘে খেয়ে ফেলেছে। এমনিতে বাঘ তো মাঝে মধ্যে বকরী খেয়েই থাকে। তাই মালিক আর তদন্তও করবে না যে, আসলেই বাঘে খেয়ে ফেলেছে কিনা। তারপর তুমি টাকাগুলো নিজ পকেটে পুরে নিজের প্রয়োজনে খরচ করতে পারবে। রাজী হও, এতে তোমারও ফায়দা, আমারও ফায়দা।' উত্তরে রাখালের মুখ থেকে স্বতস্ফূর্তভাবে বের হয়ে গেল–

يَا اِبْنَ الْمَلِكِ! فَاَيْنَ اللّٰهُ؟

'হে শাহজাদা, তুমি আমাকে বাঘে খেয়ে ফেলার যুক্তি দেখিয়ে আমার মালিককে বুঝ দেয়ার কথা বলছো। আমার মালিক অবশ্য আমাকে দেখছেন না বিধায় আমি মালিককে বুঝ দিয়ে দিতে পারবো। কিন্তু মাকিলকের মালিক, সারাবিশ্বের মালিক তাকে কিভাবে কি বুঝ দিবো? তিনি তো অবশ্যই আমাকে প্রতিটি মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন। তার সামনে তো আমাকে জবাব পেশ করতে হবে।' রাখালের এ উত্তর শুনে হযরত উমর ফারুক (রা.) বললেন, 'যতদিন পর্যন্ত এই উম্মতের মাঝে তোমার মতো মানুষের অস্তিত্ব থাকবে, ততদিন পর্যন্ত উম্মাহ ধ্বংস হবে না।'

হযরত উমর (রা.)-এর এ কথা দ্বারা বোঝা গেলো, যার অন্তরে আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে জবাবদিহিতার ভয় আছে, সে কখানো অপরের হক নষ্ট করার চিন্তা করতে পারে না। জবাবদিহিতার এই অনুভূতি যতদিন থাকবে,ততদিন নিরাপত্তা ও শান্তি থাকবে। যার থেকে এই অনুভূতির মৃত্যু ঘটবে, সে মানবরূপী হায়েনাতে পরিণত হবে। যেমন আজকাল তো এমনই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। মানুষ যেন তার মনুষ্যত্ব হারিয়ে হায়েনাতে পরিণত হয়েছে। হিংস্র প্রাণীর মতো অন্যের গোশত খাবলে খেতে এবং অন্যের চামড়া তুলে নেয়ার নেশায় মত্ত। অন্যের রক্ত পান করার চিন্তায় মগ্ন। এসব কিছু তো কেবল জাগতিক উন্নতিকল্পেই করছে।

চিরস্থায়ী জীবনের ভাবনা

রাসূল (সা.) মানুষের হৃদয়ে এই ভাবনা সৃষ্টি করেছেন যে, দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী। কখন তা ফুরিয়ে যাবে, বলা যায় না। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের জন্য

আল্লাহ তা'আলার দরবারে জবাবদিহি করতে হবে। তাই চিরস্থায়ী যে জীবন আসছে, তার ফিকির করো। আর সেখানের সম্পদ টাকা-পয়সা, বাড়ি-গাড়ি নয়। সেখানের সম্পদ নেক আমল। এসব ধন-সম্পদ এখানেই রেখে যেতে হবে। তোমার সাথে যাবে শুধু তোমার নেক আমল।

একটি হাদীসে এসেছে, মুর্দাকে যখন কবরের দিকে নেয়া হয়, তখন তিনটি জিনিস তার সাথে যায়। দু'টি বস্তু ফিরে আসে আর অবশিষ্ট একটি তার সাথে থাকে। দু'টি বস্তু অর্থাৎ তার পরিবার-পরিজন এবং মাল অর্থাৎ খাট, কাপড় ইত্যাদি ফিরে আসে। আর অবশিষ্ট একটি তার আমল কেবল বাকী থাকে। তাই বলছি চাচ্ছি, আখেরাতের জীবনের পাথেয় টাকা-পয়সা নয়; বরং নেক আমল। আর আখেরাতের পাথেয় জোগাড় করার সর্বোত্তম মাধ্যম আল্লাহর কিতাব, অর্থাৎ কুরআন মজীদ। আল্লাহ তা'আলা কুরআন শরীফকে মুক্তির ব্যবস্থাপত্র হিসেবে পাঠিয়েছেন। কুরআন পড়া, শোনা, বুঝা, তার উপর আমল করা, তার দাওয়াত দেয়া, তাবলীগ করা– এসব কিছুই সাওয়াবের কাজ। মানুষ এর দ্বারা সৌভাগ্য অর্জনে সক্ষম হয়।

কুরআন শরীফ মূল্যায়নের পদ্ধতি

রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, আমি তোমাদের মধ্যে একটি বস্তু রেখে যাচ্ছি, যতদিন তার উপর তোমরা সুদৃঢ়ভাবে আমল করবে, ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। তাহলো– আল্লাহর কিতাব কুরআনে কারীম।' এই কুরআন মজীদ রেখে হুযূর (সা.) দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন। তাই এই কুরআনে কারীমকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে হবে। মূল্যায়নের পদ্ধতি হলো, প্রতিটি মুসলমান শিশু সন্তানকে কুরআন শিক্ষা দেয়া। যতদিন তারা কুরআন শরীফ দেখে পড়তে না পারবে, ততদিন তাদেরকে অন্য কোন কাজের চাপ না দেয়া। একটি সময় ছিলো, যখন মুসলমানের প্রতিটি ঘর থেকে সকাল বেলায় কুরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ ভেসে আসতো। কিন্তু বর্তমানে তার পরিবর্তে শোনা যায় গান-বাদ্যের আওয়াজ।

মুসলমানদের কর্তব্য

উম্মতের মাঝে দ্বীনের অনুভূতি জাগিয়ে তোলাই মাদরাসাগুলো প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্য। মাদরাসাগুলোর উদ্দেশ্য তো এটাই যে, যেন মানুষ কুরআনের

দিকে ফিরে আসে। কুরআন শরীফের শব্দ, মতলব, অর্থ ও ব্যাখ্যা প্রচার-প্রসারের প্রয়াস চালায়। আল্লাহর রহমতে মুসলিম সমাজে এ জাতীয় মাদরাসা বিদ্যমান আছে। ইতিপূর্বে এই মাদরাসার কর্তৃপক্ষ বলেছিলেন, এটি দ্বীনি খিদমতের একটি সেন্টার। তাই এর উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হওয়া সকল মুসলমানের কর্তব্য। যারা পবিত্র কুরআনের খেদমতে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন, তাদেরকে অন্তত টাকা পয়সার তাগিদে অন্যের কাছে ধর্ণা দেয়ার টেনশন থেকে মুক্ত করে দেয়া উচিত। তাই সকল মুসলমানেরই দ্বীনি দায়িত্ব এর প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়া।

তবে আমার কথা হলো, সবচেয়ে বড় সহযোগিতা তো হবে তখন, যখন আপনার সন্তানটিকে কুরআন শিক্ষার উদ্দেশ্যে এসব মাদরাসায় পাঠিয়ে দিবেন। বর্তমানে কুরআন শিক্ষা না দিয়ে শিশুদেরকে অন্য কাজে ব্যস্ত করে দেয়ার মহামারি প্রকট আকার ধারণ করেছে। এই প্রবণতার কারণে মুসলিম সন্তানরা কুরআনে কারীমের সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়ে যাচ্ছে।

বাল্যশিক্ষা

শৈশবেই আপনার সন্তানকে কুরআনের শিক্ষা দিন। তার অন্তর কুরআন মজীদের আলো দ্বারা আলোকিত করে দিন। যদি সন্তানদেরকে শৈশবেই কুরআন শরীফ শিক্ষার মাধ্যমে তাদের কচি অন্তরে ঈমানের বীজ বপন করা যায় এবং ঈমানের আলোয় আলোকিত করা যায়, তাহলে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলা যায়, পরবর্তী তাদেরকে যেকোনো শিক্ষা বা কাজেই দেয়া হোক না কেন, ইনশাআল্লাহ তাদের অন্তরে শৈশবে শিক্ষাপ্রাপ্ত সেই ঈমানের আলো বিদ্যমান থাকবে। কিন্তু শুরুতেই যদি বিসমিল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ এবং কুরআন শরীফের আয়াত শিক্ষা দেয়া ত্যাগ করে তদস্থলে Dog-Cat (কুকুর-বিড়াল) ইত্যাদি শিক্ষা দেয়া শুরু করে দেন, তাহলে তাদের অন্তরে ঈমানের নূর, দ্বীন-ইসলামের মুহব্বত ও আখেরাতের ভয়-ভীতির চিন্তা-ভাবনা আসবে কোত্থেকে। বরং কেবল প্রবৃত্তিপূজারীই জন্ম নিবে, যা আজকাল আমরা সর্বত্র দেখতে পাচ্ছি। এরাই তো অবশেষে অন্যের প্রতি জুলুম-নিপীড়ন চালাতে দ্বিধাবোধ করে না। সুতরাং যদি আপনার সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করেন, তাহলে দয়া করে কুরআন শিক্ষা দেয়ার পূর্বে তাদেরকে অন্য কোনো কাজে লাগাবেন না। আজকের মাহফিল থেকে আমাদেরকে এই প্রতিজ্ঞাই

করতে হবে। যদি আমরা এই প্রতিজ্ঞা করতে পারি, তাহলে মনে করবো, আজকের মাহফিল ফলপ্রসূ হয়েছে। আপনারা সবাই এখানে এসেছেন, আর আমি আপনাদেরকে তা-ই বলেছি যা আমার বুঝে এসেছে।

نشستند وگفتند وبرخاستند

এক কানে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে আঁচল ঝেড়ে চলে গেলে কোনো ফয়দা নেই। যদি অন্ততপক্ষে প্রতিজ্ঞা করতে পারি যে, নিজের সন্তানদেরকে সাধ্যানুযায়ী কুরআন শিক্ষা দিবো এবং বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনদেরকেও এ আহ্বান জানাবো। তাহলে 'ইনশাআল্লাহ' অনেক ফায়দা হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাকে ও আপনাদেরকে কথাগুলোর উপর আমল করার তাওফিক দান করুন এই সভাকে বরকতমণ্ডিত করুন। এই মাদরাসাকে আরো উন্নতি দান করুন। সকলকে এর থেকে ফায়দা নেয়ার তাওফিক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

আত্মার বিভিন্ন ব্যাধি এবং আত্মিক চিকিৎসকের প্রয়োজনীয়তা

"মানুষের শরীর যেমনিভাবে রোগাক্রান্ত হয়, জ্বর, পেটের পীড়া, খিঁচুনি প্রভৃতি ব্যাধি দেহকে আক্রান্ত করে, তেমনিভাবে আত্মাও রোগাক্রান্ত হয়। আত্মার ব্যাধি হলো, অহংকার, হিংসা, বিদ্বেষ ও অকৃতজ্ঞতা ইত্যাদি। এসব রোগ আত্মাকে আক্রান্ত করে অসুস্থ ও দুর্বল করে দেয়।"

আত্মার বিভিন্ন ব্যাধি এবং আত্মিক চিকিৎসকের প্রয়োজনীয়তা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا - اَمَّا بَعْدُ!

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلَا فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ، وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ، اَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ - (اتحاف السادة المتقين - ج ٣ ص ١٥٣ـ)

চরিত্রের মাহাত্ম্য

চরিত্র গঠন এবং আল্লাহর বিধান অনুযায়ী তাকে পরিচালনা করা ইবাদতের মতোই অতীব জরুরী বিষয়। বরং একটু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, ইবাদত, লেন-দেন, সামাজিক শিষ্টাচারে ইসলামের যত বিধান আছে, সব বিধানই যথাযথভাবে পালনের জন্য চারিত্রিক শুদ্ধতা প্রয়োজন। নিষ্কলুষ চরিত্র না থাকলে নামায-রোযাও কোনো কাজে আসে না। বরং তখন তাতে হিতে বিপরীত হয়। তাই চারিত্রিক পবিত্রতা এবং তাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর নির্দেশাধীন করা বাস্তব জীবনের জন্য ভিত্তিপ্রস্তর। আর ইমারত

তৈরির জন্য ভিত্তিপ্রস্তরের প্রয়োজনীয়তা তো অনস্বিকার্য।

চরিত্র কাকে বলে?

সর্বশ্রুত চরিত্র আর আলোচ্য চরিত্রের ব্যাখ্যা এক নয়। উভয়ের মধ্যে রয়েছে বিস্তর ফারাক। আমাদের সমাজে চরিত্র বলতে যা বোঝায় তাহলো, একটু মুচকি হেসে কারো সঙ্গে কথা বলা, হাস্যোজ্জ্বল চেহারা নিয়ে কারো সঙ্গে সাক্ষাত করা, নম্র কথা বলা। এ গুণগুলো থাকলে তাকে বলা হয়, উত্তম চরিত্রের মানুষ, ফুলের মত চরিত্র তার। কিন্তু যে চরিত্রের কথা আমরা আলোচনা করছি এবং যে ধরনের চরিত্র ইসলাম আমাদের নিকট চায়, তার ব্যাখ্যা আরো ব্যাপক। প্রফুল্ল বদনে কারো সঙ্গে সাক্ষাত করাকেই কেবল চরিত্র বলা হয় না। হ্যাঁ, এটি চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ, প্রকৃত চরিত্র নয়। প্রকৃত চরিত্রের সম্পর্ক মানুষের আত্মার সঙ্গে। আত্মার একটি গুণকেই বলা হয় চরিত্র। মানুষের হৃদয়ে বিভিন্ন আবেগ, স্বপ্ন, কামনা, বাসনা অনেক সময় চেপে বসে। যেগুলোকে বলা হয় চরিত্র। আর এগুলো শুদ্ধ করা আবশ্যক। এ কথারই তাগিদ দিয়েছে ইসলাম।

আত্মার তাৎপর্য

আরেকটু স্পষ্ট করে বুঝতে হলে সর্বপ্রথম জানা প্রয়োজন, মানুষ কাকে বলে? শরীর ও আত্মার সমষ্টিকেই বলা হয় মানুষ। শুধু দেহকে মানুষ বলা হয় না। বরং মানুষ ওই দেহের নাম, যার মাঝে আত্মা আছে। মনে করুন, কেউ মারা গেল। তাহলে তার দেহে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি? চোখ, নাক, কান, জিহ্বা, মুখাবয়ব, হাত-পা সবই তো আছে। জীবিতাবস্থায় যেমন ছিল, মৃত্যুর পরেও তেমনই আছে। তবুও বাস্তব মানুষের সঙ্গে এর তফাৎটা কোথায়? তফাৎটা এখানেই যে, এ দেহটির মাঝে এক সময় রূহ তথা আত্মা ছিল, আর এখন তা নেই। রূহ বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে আর বাস্তব মানুষ নয়; বরং এখন তার নাম 'লাশ'। মানুষ থেকে সে পরিণত হয়েছে জড় বস্তুতে।

তাড়াতাড়ি দাফন কর

রূহ বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি বর্ণাঢ্য জীবনের অবসান ঘটে। যে মানুষটি ছিল অনেকের নয়নের মণি, ভালোবাসার পাত্র, অর্থ প্রতিপত্তির মালিক, স্ত্রী-পরিজনের অধিপতি, বন্ধু- বান্ধবের প্রিয়পাত্র, রূহ বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে মানুষটি হয়ে যায় একেবারে নিঃস্ব। মা-বাবা, স্ত্রী-পরিজন, ছেলে- সন্তান,

বন্ধু-বান্ধব, অর্থ-প্রতিপত্তি সবকিছু ফেলে রেখে তাকে পাড়ি দিতে হয় অন্য জগতে। তখন এসব স্বজনও চায় তাকে কবরের ঠিকানায় রেখে আসতে। কেউই তখন তাকে কাছে ধরে রাখতে প্রস্তুত নয়। যত প্রিয়ই হোক সকলেই চায় তাড়াতাড়ি দাফন করে দিতে। সেই প্রিয়জন যে সব সময় তার সঙ্গ কামনা করত; তার ইঙ্গিতে নেচে বেড়াত, রূহ চলে যাওয়ার পর সেও চায় তাড়াতাড়ি কবরে রেখে আসতে। নিজ সন্তানও চায় না তার প্রিয় আব্বুকে আরো দু'-একদিন কাছে রাখতে। বেশির চেয়ে বেশি হয়ত দু'-একটি দিন কিংবা বড়জোর এক সপ্তাহই চা-পাতা, বরফ ইত্যাদি দিয়ে রাখলেও তারপরেই তাকে ফেলে রেখে আসে অন্ধকার কবরে। এমনকি আমি এমন ঘটনাও শুনেছি, পত্রিকায় এসেছে, এক লোককে তার প্রিয়জনরা মৃত ভেবে দাফন করে দিয়েছে। আসলে লোকটি মরেনি, বরং দম আটকে গিয়েছিল। অবশেষে দম ছেড়ে দেয়ার পর বেচারা কোনো মতে কবর ফুঁড়ে উপরে উঠে গিয়েছে এবং নিজ বাড়িতে চলে এসেছে। ঘরের দরজা নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে তার আব্বা বলে উঠলো, কে? উত্তরে লোকটি যেই তার নাম বলল, সঙ্গে সঙ্গে তার পিতা ঘর থেকে বের হয়ে খুব লাঠিপেটা দিল। পিতা বলল, আমার ছেলে তো মারা গিয়েছে, এখন এ ভূত আসলো কোত্থেকে? অবশেষে দুর্ভাগা আগে না মরলেও এখন মারের চোটে মরে গেল।

তাহলে এমন কি বিশাল পরিবর্তন ঘটলো যে, সমস্ত দেহ যেমন ছিল, ঠিক তেমন থাকা সত্ত্বেও এ লাশটিকে ঘরে রাখতে কেউ প্রস্তুত নয়। পরিবর্তন একটাই, এ দেহের মধ্যে আগে রূহ ছিল আর এখন রূহ নেই। বোঝা গেল, দেহের মূল শক্তি হলো রূহ। এটি দেহের মধ্যে বর্তমান থাকলেই সে মানুষ, অন্যথায় নয়। এই রূহ তথা আত্মার বিয়োগের পর মানুষ আর মানুষ থাকে না; বরং লাশে পরিণত হয়, যে লাশের সঙ্গে সম্পর্ক কেউ রাখতে চায় না। সকলেই চায়, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লাশটি দাফন করে দাও।

আত্মার ব্যাধিসমূহ

মানুষের দেহ যেমন বহু বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। দেহ কখনো সুস্থ থাকে, সুশ্রী থাকে, শক্তিমান থাকে, কখনো বা অসুস্থ, দুর্বল, ভঙ্গুর ও কুশ্রী থাকে। অনুরূপভাবে মানুষের আত্মাও বহু বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। আত্মা কখনো শক্তিশালী হয়, কখনো হয় দুর্বল, কখনো উত্তম গুণের অধিকারী হয়, কখনো অসৎগুণের

আবাসস্থল হয়। মানুষের শরীর যেমনিভাবে ব্যাধিক্রান্ত হয়, জ্বর, পেটের পীড়া, খিঁচুনি প্রভৃতি ব্যাধি দেহকে আক্রান্ত করে। তেমনিভাবে আত্মাও রোগাক্রান্ত হয়। তাহলে আত্মার সেই ব্যাধিগুলো কি? আত্মার ব্যধি হলো, অহংকার, হিংসা বিদ্বেষ ও অকৃতজ্ঞতা। এসব রোগ আত্মাকে আক্রান্ত করে অসুস্থ ও দুর্বল করে দেয়।

আত্মার শোভা ও সৌন্দর্য

যেমনিভাবে মানুষের দেহ সুন্দর ও সুশ্রী হয় যথা– বলা হয়ে থাকে, অমুক দেখতে খুব সুন্দর। হরিণীর চোখের মত চোখ ইত্যাদি। তেমনিভাবে আত্মারও সৌন্দর্য আছে, সুশ্রী ও সুশোভিত আত্মা সেটি যার মধ্যে বিনয়, ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা ও একনিষ্ঠতার গুণ আছে। যে আত্মা কামনার দাস নয়, প্রদর্শনীমুখী নয়, সে আত্মাই সুন্দর আত্মা।

শারীরিক ইবাদত

এমন অনেক বিধি-বিধান আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দান করেছেন, যেগুলোর সম্পর্ক আমাদের শরীরের সাথে। যথা– নামায কিসের মাধ্যমে পড়া হয়? শরীরকে দাঁড় করিয়ে, রুকুতে ঝুঁকে সিজদায় অবনত হয়ে অতঃপর বসে সালাম ফিরিয়ে নেয়ার নামই তো নামায। এসব কিছু করতে হলে দেহের প্রয়োজন। যে ইবাদতে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে কাজে লাগাতে হয়, তাকে বলা হয় শারীরিক ইবাদত। তাই নামায একটি শরীরিক ইবাদত। তেমনিভাবে রোযাও। একটি নির্দিষ্ট সময় শরীরকে পানাহারমুক্ত রাখলে রোযা পালন হয়। হাতের মাধ্যমে নির্ধারিত সম্পদ গরিবকে দান করতে হয়। হজ্জের মধ্যে মেহনত করতে হয়, সফর করতে হয়, শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে হজ্জের বহু বিধান আদায় করতে হয়। সুতরাং এগুলোও শরীরিক ইবাদত। হ্যাঁ, কোনো কোনোটিতে আর্থিক ইবাদতের অংশও অবশ্য রয়েছে।

বিনয় আত্মার কাজ

এসব শারীরিক ইবাদতের মত কিছু আত্মিক ইবাদতও রয়েছে। এসব শরীরিক ইবাদত যেমনিভাবে ফরজ, তেমনিভাবে আত্মিক ইবাদতগুলোও ফরজ। যথা আল্লাহ তা'আলার একটি নির্দেশ। কিন্তু বিনয়ের সম্পর্ক দেহের সঙ্গে নয়; বরং আত্মার সঙ্গে। বিনয়ী হওয়া আত্মার কাজ, আল্লাহর নির্দেশমতে প্রত্যেককেই এ কাজটি পূর্ণভাবে আদায় করতে হয়।

অনেক মূর্খ মনে করে, বিনয় মানে মেহমান আসলে তাকে আদর-আপ্যায়ন করা, সেবা- যত্ন করা। মূলত এর নাম বিনয় নয়। আবার কিছুটা লেখা-পড়া করেছে এমন কিছু লোকের ধারণা, বিনয় দ্বারা উদ্দেশ্য নিজেকে অন্যের সামনে ছোট করে উপস্থাপন করা। কিছু লোক মনে করে, ঘাড় কিছুটা কাত করে দিয়ে, বক্ষকে একটু ঝুঁকিয়ে দিয়ে মানুষের সঙ্গে সাক্ষাত করাকেই বিনয় বলে। এমন করলে তাকে মনে করা হয় অত্যন্ত ভদ্র ও বিনয়ী।

প্রকৃতপক্ষে দেহের সাথে বিনয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। বিনয়ের সম্পর্ক হৃদয় ও আত্মার সঙ্গে। মানুষ নিজ অন্তরে নিজেকে ছোট জ্ঞান করলে সেটাই বিনয়। মনে করতে হবে, আমার চেয়ে দুর্বল, অসাড়, অপদার্থ গোলাম আর কেউ নেই। আমার কোনো শক্তি-সামর্থ-প্রতিপত্তি নেই। এরূপ মানসিকতা নিজের মধ্যে সৃষ্টি করতে পারলে সেটাই হবে বিনয়। আর এরূপ বিনয়েরই নির্দেশ দিয়েছেন মহান আল্লাহ।

ইখলাস অন্তরের একটি অবস্থা

আল্লাহ তা'আলা ইখলাসের নির্দেশ দিয়েছেন। বলেছেন, নিজের মধ্যে ইখলাস সৃষ্টি কর, ইবাদতে ইখলাস পয়দা কর। প্রতিটি কাজ একমাত্র আল্লাহ তা'আলার রাজি খুশি করার লক্ষ্যে করা– একেই বলে ইখলাস। মুখে উচ্চারণ করলে ইখলাস এসে যায় না। এটি অন্তরের একটি অবস্থা, আত্মার একটি বৈশিষ্ট্য, যা লাভ করার নির্দেশ আমরা পেয়েছি।

শোকর অন্তরের আমল

শোকরেরও নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা। নেয়ামত পেলে আল্লাহর শোকর আদায় কর। কৃতজ্ঞচিত্ত হওয়ার নামই শোকর। এটি অন্তরের আমল। যত বেশি শোকর করবে, আত্মাও তত বেশি শক্তিশালী হবে।

সবরের তাৎপর্য

আল্লাহ তা'আলা সবর তথা ধৈর্যধারণের আদেশ করেছেন। অপ্রীতিকর কোনো বিষয়ের মুখোমুখী হলে বুঝে নিবে, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে। আল্লাহর হেকমতেই সবকিছু হয়। সবকিছুই তার ইচ্ছাধীন। যত অপ্রীতিকরই মনে হোক না কেন, ভাবতে হবে এতে আল্লাহ তা'আলার কোনো হিকমত রয়েছে। এরূপ মানসিকতার নামই সবর বা ধৈর্য।

চরিত্র গঠন করা আবশ্যক

বোঝা গেলো, আল্লাহ তা'আলার অনেক বিধিবিধানের সম্পর্ক এ রূহের সাথে। সবরের স্থানে সবর করা নামাযের সময় নামায পড়ার মতই একটি ফরজ। শোকরের স্থানে শোকর করা রোযার দিনে রোযা পালন করার মতই একটি ফরজ। যাকাত ওয়াজিব হলে যেমনিভাবে যাকাত দিতে হয়, তেমনিভাবে ইখলাসের সময়ও ইখলাস অবলম্বন করতে হয়। এগুলোও ফরজ, যা সম্পূর্ণ আল্লাহপ্রদত্ত।

আত্মিক ব্যাধি হারাম

বাহ্যিক দৃষ্টিতে শারীরিক বিচারে অনেক কাজকেই গুনাহ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যথা মিথ্যা বলা, গীবত করা, ঘুষ নেয়া, সুদ খাওয়া, মদ পান করা, সন্ত্রাস করা— এসবই গুনাহর কাজ। এগুলো মানুষ তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা করে। তাই এগুলোর সম্পর্ক মানবদেহের সাথে। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা অনেক উহ্য কাজকেও গুনাহ বলেছেন। যথা অহংকার ও হিংসা চর্মচোখে দেখা যায় না। এগুলো মানুষের আত্মিক রোগ, মহান আল্লাহ এগুলোকে হারাম বলেছেন। মদ পান করা, শূকর খাওয়া, ব্যভিচার করা যেমনিভাবে হারাম, তেমনিভাবে এগুলোও হারাম, হারামের দিক থেকে সবই সমপর্যায়ের।

সারকথা, মহান আল্লাহ আত্মা সম্পর্কীয় কিছু বিধি-নিষেধ দান করেছেন- যেগুলোর সম্পর্ক আত্মার সাথে। কিছু বৈশিষ্ট্য অর্জন করার জন্য বলেছেন আর কিছুকে বলেছেন বর্জন করার জন্য। গ্রহণীয় আত্মিক গুণগুলো গ্রহণ করতে হবে; আর বর্জনীয় আত্মিক ব্যাধিসমূহকে বর্জন করতে হবে। এরূপ করতে পারলেই তখন বলা হবে, চরিত্র শুদ্ধ হয়েছে। আত্মার গোপন অবস্থাকেই তো চরিত্র বলে। গ্রহণীয় চরিত্রকে বলা হয় উত্তম চরিত্র। আর বর্জনীয় চরিত্রকে বলা হয় অধম চরিত্র।

আশা করি, আপনারা নিশ্চয় বুঝে ফেলেছেন চরিত্র কাকে বলে? মুচকি হেসে কথা বলার নাম চরিত্র নয়। বরং চরিত্রের এক প্রকার বহিঃপ্রকাশ। কারণ, মানুষের চরিত্র ভালো হলে অপরের সাথে তার ব্যবহারও সুন্দর হয়। কিন্তু আসল চরিত্র এটি নয়। আসল চরিত্রের সম্পর্ক একমাত্র আত্মার সঙ্গে। মানুষের

আত্মা পরিশুদ্ধ হলে এবং আল্লাহর বিধিবিধান পালনের জন্য সদাপ্রস্তুত থাকলে তখন তাকে বলা হবে উত্তম চরিত্রের অধিকারী।

ক্রোধের তাৎপর্য

চরিত্র কিভাবে শুদ্ধ হয়? একটি দৃষ্টান্ত পেশ করলে বিষয়টি সহজেই বুঝে আসবে। যথা- ক্রোধ মানুষের একটি আত্মিক বৈশিষ্ট্য। ক্রোধের জন্য সর্বপ্রথম মানুষের অন্তরে রয়, এরপর হাত-পা কিংবা ভাষার মাধ্যমে তার প্রতিফলন ঘটে। গোস্বায় চেহারা লাল হওয়া, হাত-পা, যবান নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে যাওয়া গোস্বার বহিঃপ্রকাশ। অন্যথায় আসল গোস্বা অন্তরের উত্তপ্ত অবস্থার নাম। অসংখ্য আত্মিক ব্যাধির মূলে রয়েছে এ ক্রোধ, যার কারণে মানুষ অনেক গুনাহের সম্মুখীন হয়।

গোস্বা না আসাও এক প্রকার ব্যাধি

গোস্বা যদি মানুষের মাঝে মোটেও না থাকে, যত কিছু ঘটুক না কেন, তবুও গোস্বা জাগে না, তাহলে এটাও এক প্রকার অসুস্থতা। আল্লাহ তা'আলা মানুষের মাঝে গোস্বা রেখেছেন, যেন সে নিজেকে, নিজের প্রাণ- সম্ভ্রমকে, নিজের দ্বীনকে হেফাজত করতে পারে। যদি পিস্তলের মুখোমুখি হওয়ার পরও কারো গোস্বা সৃষ্টি না হয়, তাহলে এটা রোগ। নবী করীম (সা.)- কে নিয়ে কেউ ব্যঙ্গ করছে আর আমার গোস্বা উঠলো না, আমি দর্শকের ভূমিকায় নিশ্চুপ রয়েছি, তাহলে বুঝতে হবে গোস্বার মহলে গোস্বা না আসার দরুন আমি অসুস্থ।

ক্রোধের মাঝে ভারসাম্য থাকতে হবে

সীমাতিরিক্ত ক্রোধ আসাও একটি ব্যাধি। ক্রোধের উদ্দেশ্য অন্যের অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ থাকা। এতটুকু ক্রোধ গ্রহণীয়। কিন্তু প্রয়োজনের চেয়েও বেশি রেগে যাওয়া, যথা যেখানে একটি থাপ্পড়ই যথেষ্ট ছিলো, সেক্ষেত্রে বেদম প্রহার করা, গুনাহর অন্তর্ভুক্ত। তাই গোস্বা একেবারে না থাকা যেমনিভাবে দূষণীয়, তেমনিভাবে রাগের আতিশয্যে ফেটে পড়ার উপক্রম হওয়াও গুনাহ। ভারসাম্য বজায় না থাকলে, প্রয়োজনের মুহূর্তেও গোস্বা না হলে এটা হবে অনুচিত।

হযরত আলী (রা) ও তাঁর ক্রোধ

হযরত আলী (রা.) এর একটি ঘটনা। এক ইয়াহুদী একবার নবী করীম (সা.) সম্পর্কে কটূক্তি করে বসলো। আলী (রা) তা শুনে ফেললেন। তিনি ইয়াহুদীকে আছাড় দিয়ে তার বুকের উপর উঠে বসলেন। পালাবার পথ না পেয়ে ইয়াহুদী আলী (রা.)-এর মুখে থুতু মেরে বসলো। এ অবস্থার সম্মুখীন হয়ে আলী (রা.) সঙ্গে সঙ্গে তাকে ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। জিজ্ঞেস করা হলো: " আপনি এ কি করলেন? ইয়াহুদী আপনার সাথে দ্বিগুণ হঠকারিতা দেখিয়েছে; আপনার তো উচিত ছিলো, তাকে মারধর করা।" উত্তরে তিনি বললেন, "ব্যাপার হচ্ছে, ইয়াহুদী যখন আমার নবীজি (সা.) সম্পর্কে কটূক্তি করেছে, তখন নবীজির শানে গোস্তাখি করার জন্য তাকে শাস্তি দিয়েছি। তখনকার গোস্বা আমার স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে ছিল না, বরং ছিলো রাসূল (সা.)-এর ইজ্জত রক্ষার নিমিত্তে। কিন্তু সে যখন আমার মুখে থুতু নিক্ষেপ করেছে, তখন আমার ক্ষিপ্ততার পেছনে নিজস্ব স্বার্থও জড়িত হয়ে গিয়েছে। নিজের জন্য প্রতিশোধপরায়ণ মানসিকতা আমার মাঝে চলে এসেছে। তখন আমি ভাবলাম, নিজের স্বার্থে আঘাত আসলে তার প্রতিশোধ নেয়া ভালো নয়। নবীজি (সা.)-এর আদর্শ তো এমন ছিলো না। তিনি নিজের জন্য কারো থেকে প্রতিশোধ নেন নি। এরূপ ভাবনার শিকার হওয়ার কারণে আমি তাকে মুক্ত করে দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম।"একেই বলে ভারসাম্যপূর্ণ গোস্বা, যৌক্তিক কারণে গোস্বা হলেন, আবার প্রয়োজনের মুহূর্তে গোস্বাকে নিয়ন্ত্রণ করে নিলেন এবং ইয়াহুদীকেও ছেড়ে দিলেন।

ভারসাম্যতা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা

মানুষের আত্মার প্রতিটি চরিত্রের ক্ষেত্রে এই একই অবস্থা। যতক্ষণ পর্যন্ত ভারসাম্য বজায় থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে মন্দ নয়। ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেলে, মধ্যপন্থা ভেঙ্গে গেলে, তখন সেটাই অসুস্থতা। সর্বক্ষেত্রে মধ্যপন্থাই কাম্য। আত্মশুদ্ধির অর্থও এটাই যে, নির্দিষ্ট মাপকাঠিতে সংযোজন কিংবা বিয়োজন না হওয়া চাই।

আত্মার গুরুত্ব

তাই রাসূল (সা.) বলেছেন–

اَلَا اِنَّ فِى الْجَسَدِ لَمُضْغَةً اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اَلَا وَهِىَ الْقَلْبُ (الاتحاف ج ٣ ص ١٠٢)

"জেনে রেখো, মানবদেহে একটি গোশতপিণ্ড আছে, যা সুস্থ হলে গোটা মানবদেহ সুস্থ, আর অসুস্থ হলে সম্পূর্ণ দেহ নষ্ট হয়ে যায়। আর তা হচ্ছে রূহ বা আত্মা।" এখানে গোশতপিণ্ড দ্বারা সাধারণ গোশতের টুকরা উদ্দেশ্য নয়। কারণ, রূহ অপারেশন করলে তার মধ্যে অহংকার, হিংসা বিদ্বেষ এগুলো পরিলক্ষিত হবে না। ডাক্তার হৃদয়ের বহিঃবিভাগ চেক করে হয়তো বলতে পারবেন, তার স্পন্দন মত আছে কিনা। শিরা যথাযথ কাজ করছে কিনা। চেকআপ কিংবা যন্ত্রের সাহায্যে হৃদয়ের বাইরের দিকটা বোঝা গেলেও অভ্যন্তরীণ দিকটা দৃষ্টির আড়ালেই থেকে যায়।

অদেখা ব্যাধি

মানুষের হৃদয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত এমন কিছু বিষয় রয়েছে, যা এ চর্ম চোখে দেখা যায় না। হৃদয়ে শোকর আছে কি নেই, বিদ্বেষ-হিংসা আছে কি নেই, সবর- শোকরের মাত্রা কতটুকু– এসব বিষয় সাধারণ ডাক্তার ধরতে পারে না। চেক করার মতো কোনো মেশিনও এগুলো চিহ্নিত করার জন্য আবিষ্কৃত হয়নি।

সুফীগণ আত্মার চিকিৎসক

এ জাতীয় রোগের চিকিৎসক, এগুলো চিহ্নিতকারী ডাক্তার ভিন্ন আরেকটি দল। যারা 'সুফী' নামে পরিচিত। যারা পারদর্শী হন চরিত্রবিদ্যায়। আত্মার এসব অসুস্থতাকে নির্ণয় করে যারা চিকিৎসা চালান। এটা স্বতন্ত্র একটি বিদ্যা, পরিপূর্ণ একটি শাস্ত্র। এ বিদ্যার শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণও সাধারণ চিকিৎসাবিদ্যার মতই করা হয়।

শরীরের বাহ্যিক ব্যাধির মাঝেও আবার শ্রেণী বিন্যাস আছে। কিছু রোগ আছে, মানুষ যা সহজেই অনুধাবন করতে পারে। জ্বর আসলে মানুষ বুঝতে পারে, তার জ্বর এসেছে। শরীরে তাপ, ব্যাথা অনুভূত হলে বুঝে নেয়, জ্বর আসছে। নিজে বুঝতে না পারলে থার্মোমিটার দ্বারা যাঁচাই করে দেখে তার জ্বর

আছে কিনা। থার্মোমিটারেও কোনো কাজ না হলে রোগনির্ণয়ের জন্য চিকিৎসকের সাহায্য নেয়া হয়। কিন্তু আত্মার রোগ কিন্তু এমন নয়। অনেক সময় মানুষ বুঝতেই পারে না তার মধ্যে আত্মিকব্যাধি আছে কি নেই। এর নির্ণয়ের জন্য কোনো যন্ত্রও মার্কেটে নেই। পার্থিব চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শীরা নির্ণয় করতে পারে না, তার মধ্যে অহংকার ইত্যাদি আছে কিনা। আত্মিক ব্যাধিগ্রস্থ মানুষ তার রোগনির্ণয় করতে এবং চিকিৎসা নিতে যেতে হয় কোনো আত্মার চিকিৎসকের নিকট।

বিনয় কিংবা লোক দেখানো বিনয়

বিনয়ের পরিচয় নিশ্চয় আপনারা জানতে পেরেছেন। বিনয় অর্থ নিজেকে ছোট মনে করা। এ বিষয়ে হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেছেন, মানুষ অনেক সময় লোক দেখানো বিনয় প্রকাশ করে। বলে থাকে, আমি গুনাহগার, মূর্খ, নাচিজ, অকর্মা, আমার কোনো অবস্থান নেই– এ দ্বারা অনেক ক্ষেত্রে সন্দেহ হয়, বাস্তবেই লোকটি বিনয়ীকিনা। সে নিজেকে কত ছোট ভাবছে।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে লোকটিকে বিনয়ী মনে হলেও, অনেক ক্ষেত্রে বস্তুত সে এমন বৈশিষ্টের অধিকারী নয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, এমন লোক একাধারে দুটি ব্যাধিতে আক্রান্ত। প্রথম অহংকারের ব্যাধি। দ্বিতীয়ত লোক দেখানোর পীড়া। কারণ, লোকটি যে বলছে সে দুর্বল, তুচ্ছ, মূর্খ, গুনাহগার ইত্যাদি। এগুলো সে হৃদয় থেকে বলছে না। বরং এজন্য বলছে, যেন মানুষ তাকে বিনয়, নম্র, ভদ্র মনে করে।

এমন মানুষকে পরীক্ষা করার পদ্ধতি

হযরত বলেছেন : এ জাতীয় লোককেও পরীক্ষা করার পদ্ধতি আছে। সে যখন এভাবে নিজেকে ছোট করে উপস্থাপন করবে, তখন তার কথার পিঠে সঙ্গে সঙ্গে বলে দিতে হবে, হ্যাঁ, বাস্তবেই আপনি এমন। আসলেই আপনি অধর্ব, পাপী, মূর্খ। আপনার কোনোই ইমেজ নেই। তারপর দেখুন, তার মনের অবস্থাটা কেমন হয়? তাকে এরূপ উত্তরদানকারী লোকটিকে সে বাস্তবেই বাহবা দিবে কিনা, তার জন্য কৃতজ্ঞতায় মন ভরে উঠবে কিনা, নাকি এতে তার মনে কষ্ট যাবে, হৃদয় ভারাক্রান্ত হবে যে, সত্যিই সত্যিই লোকটি আমাকে এমন ভাবলো!

তখনই দেখা যাবে, মূলত লোকটি নিজেকে এমন দুর্বল করে উপস্থাপন করার পেছনে কারণ ছিলো, যেন শ্রোতা প্রতিউত্তরে বলে যে, জনাব, আপনি কি বলছেন। এটা আপনার বিনয়, অন্যথায় বাস্তবে তো আপনি অনেক বড় জ্ঞানী ও আল্লাহ ওয়ালা। শ্রোতার মুখ থেকে এরূপ বাহবা বের করানোর জন্য ছিল তার এ বিনয় প্রকাশ। প্রকৃতপক্ষে তার অন্তর তো অহংকারপূর্ণ। অথচ দেখাচ্ছে সে বিনয়ী। এটা বিনয় নয়, বরং বিনয় প্রদর্শন।

কিন্তু তার বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করবে কে? যাঁচাই তো তিনিই করবেন, যিনি আত্মার ব্যাধিসমূহ নির্ণয়ে দক্ষ এবং সুনিপুণ চিকিৎসক। তাই মানুষ যেহেতু অধিকাংশ সময় নিজের আত্মার রোগ নির্ণয় করতে পারে না, বিধায় তাকে যেতে হবে তার দক্ষ চিকিৎসকের কাছে।

অপরের জুতা সোজা করা

এক ভদ্রলোক আমার আব্বাজানের মজলিসে আসা-যাওয়া করতেন। একদিন তিনি দেখতে পেলেন, লোকটি মজলিসে এসে স্বতস্ফূর্তভাবে অন্যের জুতা সোজা করে দিচ্ছে। এরপর থেকে তার প্রতিদিনের কর্মসূচী ছিলো মজলিসে উপস্থিত লোকজনের জুতা সোজা করে দিয়ে মজলিসে শরীক হওয়া। আব্বাজান এভাবে বেশ কয়েকদিন দেখতে পেলেন। পরে একদিন তিনি লোকটিকে কাজটি করতে নিষেধ করে দিলেন। এর কারণ হিসাবে তিনি বললেন : আসলে বেচারা ধারণা করেছে, তার মাঝে অহংকারের রোগ আছে, আর এ রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি হিসেবে অপরের জুতা সোজা করাকে সে বাছাই করে নিয়েছে। সে ভেবেছে, অপরের জুতা সোজা করলে তার অহংকার দূর হয়ে যাবে। অথচ লোকটির জানা নেই, তার একাজ হিতে বিপরীত হচ্ছে। ফায়দা তো দূরের কথা; বরং তার মাঝে অহংকার রোগের পাশাপাশি অহমিকার ব্যাধিও চলে আসছে। সে জুতা সোজা করার কাজ করে ভেবেছে, তার অহংকার মিটে গেছে এবং বিনয়ের পরিসীমায় প্রবেশ করেছে। অথচ, পরিণতিতে তার মধ্যে অহমিকার রোগও সংযোজন হয়েছে। তাই তার জন্য ভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতি প্রয়োগ করা হলো।

বোঝা গেলো, সাধারণের দৃষ্টি আর চিকিৎসকের দৃষ্টি এক নয়। দৃশ্যত লোকটির এ কাজ ছিল বিনয়ের কাজ। অথচ চিকিৎসক বুঝে ফেলেছেন,তার কাজটি অহংকার সৃষ্টিকারী, বিনয়ের সাথে যার কোনো সম্পর্ক নেই। তাই

আত্মার ব্যাপারটি বড়ই নাজুক। মানুষ এ ব্যাপারে নিজে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না কোনো চিকিৎসকের দ্বারে যাবে। চিকিৎসকই বলবেন কোন কাজটি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) কর্তৃক নির্দেশিত আর কোনটি নির্দেশিত নয় এবং কোন কাজ কতটুকু করা যাবে আর কতটুকু করা যাবে না।

তাসাউফ কাকে বলে?

এসব না বোঝার কারণে বর্তমানে আধ্যাত্মিকতা এক আনুষ্ঠানিকতায় রূপ নিয়েছে। কোনো পীর সাহেবের দরবারে হাতে হাত রাখলো আর তিনিও বাইআত করে নিলেন। তারপর কিছু ওযীফা-সবক বলে দিলেন। বলে দিলেন, সকালে এটা পড়বে, সন্ধ্যায় এটা পড়বে, আল্লাহ বিল্লাহ করবে, ব্যস এইটুকুই যথেষ্ট। গোপন ব্যাধির চিকিৎসার কোনো উদ্যোগ নেই, চরিত্র গঠনের কোনো প্রচেষ্টা নেই। উত্তম চরিত্র গ্রহণ করার প্রতি কোনো গুরুত্ব নেই, অসৎ চরিত্রের ব্যাপারে কোনো উদ্বেগ নেই। এসব কিছুই নেই, শুধু ওযীফা পড়ছে নিয়মিত। তাহলে কোনো ফল হবে না। বরং অনেক ক্ষেত্রে এসব ওযীফা তখন আত্মিক ব্যাধিকে আরো বেপরোয়া করে তোলে।

বিভিন্ন ওযীফা এবং আমলের তাৎপর্য

এসব ওযীফা, যিকর আ'মলের উপমা ভিটামিন ওষুধের মতো। ভিটামিন ওষুধের প্রকৃতি হলো, অসুস্থাবস্থায় খেলে অনেক ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল হয় না; বরং তখন অসুস্থতাকে আরো বাড়িয়ে দেয়। তদ্রূপ অহংকার ও অহমিকা হৃদয়ে থাকলে শুধু বসে বসে ওযীফা পড়লেই কাজ হবে না। বরং তখন ওযীফা ও যিকর অনেক ক্ষেত্রে অহংকারকে আরো উসকিয়ে দেয়। তাই উপদেশ দেয়া হয়, ওযীফা, যিকর, আমল- এসব কিছু কোনো আল্লাহওয়ালার নির্দেশনা মতো কর। কারণ, আল্লাহওয়ালারা তাঁদের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নির্ণয় করবেন, কি পরিমাণ ওযীফা-যিকর তোমার আত্মশুদ্ধির জন্য প্রয়োজন। প্রয়োজনে তাঁরা তোমার এসব আমল সাময়িকভাবে বন্ধও করে দিতে পারেন। হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) এভাবে বহু মানুষের চিকিৎসা করেছেন। প্রয়োজনে তিনি সমস্ত যিকর, ওযীফা, আমল ছাড়িয়ে দিয়েছেন। বিশেষ অবস্থায়, যখন এগুলো ক্রিয়াশীল হওয়ার পরিবর্তে প্রতিক্রিয়াশীল হতো, তখন তিনি আর এগুলো করতে দিতেন না।

মুজাহাদার আসল উদ্দেশ্য

অথচ, বর্তমানে আধ্যাত্মিকতা ও পীর- মুরিদিকে অন্যভাবে গ্রহণ করা হচ্ছে। নির্দিষ্ট ওযীফা, যিকর, আমল আদায়ের উপরই যেন সম্পূর্ণ জোর প্রয়োগ করা হচ্ছে। আত্মশুদ্ধির কোনো ফিকির করা হচ্ছে না। অথচ লোকটি আত্মিক ব্যাধিতে জর্জরিত। প্রথম দিকের সূফীগণ কিন্তু এমন ছিলেন না। বরং তাঁদের প্রথম পদক্ষেপ ছিলো চারিত্রিক অবক্ষয় থেকে মুক্ত করে পরিশীলিত করে তোলা। এজন্যই ভুক্তভুগীকে মুজাহাদার কাজ দেয়া হতো। সাধনা-মুজাহাদা করানোর পরই তাকে ৫ কৃত মানুষ করে গড়ে তোলা হতো।

শায়খ আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী (রহ.)-এর নাতির ঘটনা

শায়খ আব্দুল কুদ্দুস ছিলেন গাঙ্গুহর একজন শীর্ষস্থানীয় ওলি। আমাদের বুযুর্গদের সূত্র পরম্পরায় তাঁর বিশেষ অবস্থান রয়েছে। তাঁর এক নাতি ছিল। শায়খ জীবিত থাকাকালীন তার মাথায় কখনো এ ফিকির আসে নি যে, আমার দাদা থেকে সারা দুনিয়ার মানুষ ফয়েজ নিচ্ছে। আর আমি শাহী মেজাযে ঘুরে বেড়াচ্ছি। অথচ, চলে গেলে তো শত আফসোস করেও পাবো না। তাই তাঁর দরবারে থেকে আমি আত্মশুদ্ধি করে নিই। এভাবে নাতি কখনো ভেবে দেখেনি। শায়খের ইন্তেকালের পর তার আফসোস জেগে উঠলো। ভাবলো, দাদাকে নিজের কাছে পেয়েও ধন্য হতে পারলাম না। বাতির নিচের অন্ধকারের মতই আমি রয়ে গেলাম। অথচ, দুনিয়ার অসংখ্য মানুষ তাঁর থেকে ফয়েজ-বরকত লাভ করেছে। এভাবে তার আফসোস উজ্জীবিত হলো। ব্যাকুল হয়ে পড়লো, এখন সেই ক্ষতি পূরণ করা যায় কিভাবে? বহু ভেবে-চিন্তে উপায় বের করলো, দাদার নিকট থেকে যাঁরা উপকৃত হয়ে ধন্য হয়েছেন, তাঁদের কারো নিকট গিয়ে উপকৃত হওয়া যায়। অনুসন্ধানে নামলো, দাদার খলিফাদের মধ্যে সবচে' বড় আল্লাওয়ালা কে? তারপর বলখের এক বুযুর্গের সংবাদ পেলেন, তিনিই দাদার শীর্ষ খলিফা। কিন্তু সমস্যা দেখা দিলো, কোথায় গাঙ্গুহ আর কোথায় বলখ। ঘরের সম্পদকে কদর না করার আজ এ পরিণতি। তবুও কি আর করা, যেহেতু সত্যের পীপাসা তার হৃদয়ে ছিল, তাই বলখের পথে পাড়ি জমালো।

শায়খের নাতিকে অভ্যর্থনা

অন্যদিকে শায়খের সেই বলখি খলিফা যখন জানতে পারলেন, তাঁর শায়খের নাতি তাঁরই নিকট আসছে, তিনি শহর থেকে বের হয়ে তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। সসম্মানে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসলেন। উন্নত খাবার পরিবেশন করলেন। থাকার উন্নত ব্যবস্থা করে দিলেন। না জানি আরো কত কী করলেন!

গোসলখানার ওখানে আগুন জ্বালাবে

এভাবে এক-দুদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর সে বলল, "হযরত, আপনি আমার সঙ্গে সদাচরণ দেখিয়েছেন। অত্যন্ত আদর-যত্ন করেছেন। কিন্তু আসলে আমি অন্য একটি উদ্দেশ্যে এসেছি"। বুযুর্গ জিজ্ঞেস করলেনঃ কি উদ্দেশ্য? বলল, আপনি আমার বাড়ি থেকে যে দৌলত নিয়েছেন,তার কিছু অংশ আমাকেও দান করবেন, এই উদ্দেশ্যে এসেছি। বুযুর্গ বললেন, "আচ্ছা, ওই দৌলত নিতে এসেছ?" বলল, "জ্বি হযরত।" এবার বুযুর্গ বললেন, "যদি সেই দৌলত অর্জন করার জন্যই এসে থাকো, তাহলে এ গালিচা, কার্পেট, সম্মান, উন্নত খাবার– সব কিছুই ছেড়ে দিতে হবে। থাকার যে শানদার ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাও ছাড়তে হবে।" জিজ্ঞেস করলো, "তাহলে আমাকে কি করতে হবে?" বুযুর্গ উত্তর দিলেন, "আমাদের মসজিদের পাশে একটি গোসলখানা আছে, সেখানে যারা অযু করে, তাদের জন্য লাকড়ি জ্বালিয়ে গরম পানির ব্যবস্থা করা হয়। তোমার কাজ হলো শুধু লাকড়ি জ্বালাবে আর গরম পানি করবে।" বুযুর্গ আমল, ওযীফা, যিকর এসব কিছুর কথাই বললেন না। বললেন, " তোমার আপাতত কাজ এটাই।" জিজ্ঞেস করা হলো, " তাহলে হযরত, থাকার কি ব্যবস্থা?" বললেন, " রাতে ঘুমোতে হলে এখানে গোসলখানার পাশেই শুয়ে থাকবে।" কোথায় লাল গালিচার সংবর্ধনা, উন্নত থাকা- খাওয়া, আপ্যায়ন আর কোথায় গোসলখানায় বসে বসে আগুন জ্বালানোর কাজ!

আমিত্বকে আরো বিনাশ করতে হবে

শায়খ আব্দুল কুদ্দুস (রহ.) এর নাতি তাঁরই এক বলখীয় খলিফার দরবারে এসে যথারীতি গোসলখানার সামনে পানি গরম করার কাজ করতে লাগলেন। একদিন বলখিয় বুযুর্গ ঝাড়ুদারকে বললেন, " দেখবে, গোসলখানার পাশে এক

লোক বসা আছে। ময়লার এই ঝুড়িটি নিয়ে তার পাশ দিয়ে যাবে এবং এমনভাবে তার পাশ ঘেঁষে যাবে, যেন ময়লার গন্ধ তার নাকে লাগে।" ঝাড়ুদার কথামত যেই তার পাশ ঘেঁষে যেতে চাইলো, তখন তার সহ্য হল না। সারা জীবন যে শাহি হালতে জীবন কাটিয়েছে, তার এটা সহনীয় হয় কিভাবে? সে ধমকের সুরে বলে উঠলো, "এই তোমার সাহস তো কম নয়, ময়লার ঝুড়ি আমার নাকের কাছে এভাবে নিলে কেন? ভাগ্য ভাল, এটা গাঙ্গুহ নয়। অন্যথায় দেখে নিতাম।" তারপর বলখের বুযুর্গ ঝাড়ুদারকে বললেন, "কি ব্যাপার, কি বললো সে।" ঝাড়ুদার বৃত্তান্ত শুনাল, এতে বুযুর্গ মন্তব্য করলেন, "উঁহু, আমিত্ব এখানো রয়ে গেছে, চাউল এখানো সিদ্ধ হয়নি।"

এভাবে আরো কিছু দিন অতিবাহিত হওয়ার পর বুযুর্গ ঝাড়ুদারকে ডেকে বললেন, "এবার ময়লার ঝুড়িটি শুধু নাকের পাশ দিয়েই নিয়ে যাবে না, বরং এমনভাবে যাবে যেন ময়লা তার শরীরেও লেগে যায়। তারপর কি ঘটে, আমাকে জানাবে।" ঝাড়ুদার বুযুর্গের কথা মতো কাজ করল। বুযুর্গ এবার কি হয়েছে জানতে চাইলেন। বললো, "এবার ঝুড়িটি একবারে তার শরীর ঘেঁষে নিয়ে গিয়েছি এবং এতে কিছু ময়লাও তার গায়ে লেগেছে। তবুও আমাকে কিছুই বললো না। তবে খুব কটাক্ষ দৃষ্টির সাথে আমার প্রতি তাকিয়ে ছিল।" বুযুর্গ মন্তব্য করলেন, "আলহামদুলিল্লাহ, কাজ হচ্ছে।"

এবার হৃদয়ের তাগুত ভেঙ্গেছে

অতঃপর কিছুদিন পর বুযুর্গ ঝাড়ুদারকে বললেন, "এবার তুমি তার পাশ কেটে এমনভাবে যাবে, যেন তোমার ময়লার ঝুড়ি থেকে বেশ কিছু ময়লা তার গায়ে পড়ে। এতে তার প্রতিক্রিয়া কি হয় জানাবে।" সে তাই করলো, বুযুর্গ জিজ্ঞেস করলেন, "কি প্রতিক্রিয়া দেখলে?" উত্তর দিলো, "এবারের ব্যাপারটি সত্যিই বিস্ময়কর। ঝুড়ি তার গায়ে ফেলতে গিয়ে আমিও পড়ে গিয়েছিলাম। এতে সে একেবারে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। আমাকে জিজ্ঞেস করতে লাগলো, "ব্যাথা পাননি তো?" বুযুর্গ মন্তব্য বরলেন, "আলহামদুলিল্লাহ, তার অন্তরে যে তাগুত বিরাজ করছিল, ভেঙ্গে গেছে।"

শিকল ছাড়তে পারবে না

এবার তাকে ডেকে এনে দায়িত্ব পরিবর্তন করে দিলেন। বললেন, " গোসলখানায় তোমার দায়িত্ব শেষ। এখন থেকে তুমি আমার সঙ্গে থাকবে।

তবে এভাবে থাকবে যে, আমি যখন শিকার করতে বের হবো, তখন তুমি আমার শিকারী কুকুরটির শিকল হাতে রাখবে এবং আমার সঙ্গে চলবে। এভাবে মর্যাদা কিছুটা বাড়লো। শায়খের সোহবত ও সঙ্গ লাভের মর্যাদা পেলো। কিন্তু সমস্যা দেখা দিলো, কুকুরের শিকল ধরে রাখতে গিয়ে কুকুর যখন শিকার দেখলো, তখন দৌড়-ঝাঁপ শুরু করে দিলো। এক পর্যায়ে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো আর কুকুর তাকে নিয়েই টেনে-হেঁচড়ে চলতে লাগলো। তবুও সে কুকুরের শিকল ছাড়লো না। কারণ, এ ছিল শায়খের নির্দেশ। পরিণতিতে সে আহত হলো, দরদর করে শরীর থেকে রক্ত পড়তে লাগলো।

ওই দৌলত ন্যস্ত করলাম

রাতের বেলা বুযুর্গ তাঁর শায়খ আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী (রহ.)কে স্বপ্নে দেখলেন। তিনি বলছেন, " মিয়া!" আমি তোমাকে দিয়ে তো এত কষ্ট উঠাই নি।" এতে বুযুর্গ দিশা পেলেন এবং তাকে ডেকে বললেন, আপনি যে দৌলত লাভ করতে এখানে এসেছেন এবং যে দৌলত আমি আপনার বাড়ি থেকে এনেছিলাম, আমি সেই সম্পূর্ণ দৌলত 'আলহামদুলিল্লাহ' আপনাকে ন্যস্ত করলাম। দাদার উত্তরাধিকার আপনি পেয়ে গেছেন। এবার আল্লাহর ফজলে আপনি দেশে ফিরতে পারেন।

সংশোধনের আসল উদ্দেশ্য

বলছিলাম, সম্মানিত সুফীগণের মূল কাজ ছিলো রোগ উপশম করা। তাঁদের দরবারে কেবল ওযীফা, যিকর আর নির্দিষ্ট আমল ছিলো না? হাঁ, এগুলোও ছিলো। তবে চিটামিনস্বরূপ ছিলো। এগুলো ছিলো সংশোধনের সহযোগী হিসেবে। অন্যথায় আসল উদ্দেশ্য ছিল, অহংকার, অহমিকা, হিংসা, বিদ্বেষ, কপটতা, রিয়া, পদের লোভ, ধনের লোভ মোটকথা যাবতীয় আত্মিক পীড়া অন্তর থেকে বের করে দিয়ে ভুক্তভোগীকে পূত-পবিত্র করে দেয়া। আল্লাহর ভয়, তাঁর প্রতি ভরসা-আস্থা, একনিষ্ঠতা, ইখলাছ, বিনয়সহ যাবতীয় উত্তম বৈশিষ্ট্য মানুষের অন্তরে গেঁথে দেয়াই আধ্যাত্মিকতা বা তাসাউফের মূল কথা।

আত্মশুদ্ধি কেন প্রয়োজন?

অনেকের ধারণা, তাসাউফ শরিয়ত বহির্ভূত কোনো বিষয়। জেনে রাখুন, তাসাউফ ইসলামী শরীয়াহর এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। দৃশ্যমান যাবতীয় কাজের বিধি বিধানই তো শরীয়ত। আর অদৃশ্যমান সমস্ত কাজের সমষ্টি হলো

তরীকত। আত্মশুদ্ধি না হলে দৃশ্যমান সকল কাজই অনর্থক। যথা ইখলাস একটি অদৃশ্য আমল। ইখলাস বলা হয় প্রত্যেক কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে একমাত্র আল্লাহর জন্যই সকল কাজ করা। কারো মনে ইখলাস না থাকলে, তার নামায ও অনর্থক। কেউ হয়ত নামায পড়ে যেন মানুষ তাকে মুত্তাকি, পরহেজগার, বুযুর্গ ধারণা করে। তাহলে এই ব্যক্তির দৃশ্যমান নামায তো ঠিক আছে, কিন্তু ইখলাস না থাকার কারণে এই ঠিক থাকা মূলত ঠিক থাকা নয়। বরং তার নামাযও তখন ব্যর্থ হবে। উপরন্তু গুনাহও হবে। হাদীস শরীফে নবীজি (সা.) বলেছেন–

مَنْ صَلَّى يُرَائِى فَقَدْ اَشْرَكَ بِاللّٰهِ (مشكوة-كتاب الرقاق باب الريا، والسمعة ٤٥٥)

"যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে নামায পড়ে, প্রকারন্তরে সে আল্লাহর সঙ্গে শিরক স্থাপন করে।"

কারণ, কেমন যেন সে আল্লাহকে বাদ দিয়ে মাখলুককে খুশি করার তালে মত্ত। কাজেই বাহ্যিক অবস্থা দুরস্ত করার চেয়েও আত্মিক অবস্থা শুদ্ধ করার গুরুত্ব বেশি। এমন না হলে ব্যহ্যিক আমল ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

নিজের চিকিৎসক খোঁজ করুন

আমাদের বুযুর্গরা পদ্ধতি বাতলে দিয়েছেন। মানুষ যেহেতু নিজের সংশোধন নিজে করতে পারে না, তাই কোনো চিকিৎসক খুঁজে নেয়া প্রয়োজন। ওই চিকিৎসককে পীর, শায়খ, ওস্তাদ যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন। মূলত তিনি হবেন একজন চিকিৎসক। আত্মার চিকিৎসক, যতদিন মানুষ এরূপ না করবে, ততদিন আত্মার রোগে ভুগতে থাকবে এবং আমলও ব্যর্থ হতে থাকবে।

সামনে যে পরিচ্ছেদ আসছে, এটি ছিল তার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি। এবার চরিত্রের প্রতিটি অধ্যায় সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। উত্তম চরিত্র গ্রহণ করার জন্য কি করতে হবে। আর অধম চরিত্র বর্জন করার জন্য কি পদক্ষেপ নিতে হবে, এ সম্পর্কে আলোচনা হবে। আল্লাহ তা'আলা দয়া করে আমাদেরকে বুঝবার এবং তার উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

দুনিয়ার ভালোবাসায় মত্ত হয়ো না

“পার্থিব জগতের এসব উপকরণ, অর্থ-সম্পদ যতদিন পর্যন্ত তোমাদের আশেপাশে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত কোনো শঙ্কা নেই। কারণ, এসব ধন-সম্পদ তোমাদের জীবনতরী চালাবে। কিন্তু যেদিন এসব ধন-সম্পদ তোমাদের চতুর্পার্শ ভেদ করে হৃদয়ের কিশতিতে প্রবেশ করবে, সেদিন তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য।”

দুনিয়ার ভালোবাসায় মত্ত হয়ো না

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا۔ اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا، وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ (سورة الفاطر، ٥)

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ۔ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

দ্বীনের মাঝেই দুনিয়ার শান্তি

আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র গঠন প্রত্যেক মুসলমানের জীবনে প্রয়োজন। এছাড়া কখনো তার দ্বীন পরিশুদ্ধ হবে না। যেহেতু প্রকৃতপক্ষে দুনিয়ার পরিশুদ্ধতা দ্বীনশুদ্ধির উপর নির্ভরশীল। দ্বীন ছাড়াও দুনিয়াতে শান্তি অর্জন সম্ভব এমন ভাবনা শয়তানের ধোঁকামাত্র। পার্থিব প্রাচুর্যতা আর অন্তরের শান্তি এ দু'টি এক

বিষয় নয়। অন্তরের শান্তি, আনন্দ ও স্থিরতা অর্থ-প্রতিপত্তির মাধ্যমে পাওয়া যায় না; বরং তার জন্য প্রয়োজন দ্বীন। দ্বীন ছেড়ে দিয়ে সম্পদের কুমির হওয়া যাবে, টাকার পাহাড় গড়া যাবে; বাড়ি গাড়ি এবং কারখানার মালিক হওয়া যাবে। কিন্তু দিলের শান্তি নামক সেই সোনার হরিণের মালিক হওয়া যাবে না। বস্তুত দিলের শান্তি, অন্তরের সুখ দ্বীনের মাঝেই লুকায়িত। এ জন্যই দেখা যায়, যারা আল্লাহ তা'আলার হুকুমের সামনে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন, সেসব আল্লাহ ওয়ালাই প্রকৃত সুখের ঠিকানা খুঁজে পেয়েছেন। আর এ দ্বীন ও দুনিয়া সঠিক করতে হলে প্রয়োজন চরিত্র সংশোধনের। চারিত্রিক পরিশুদ্ধতা ব্যতীত দ্বীন ও দুনিয়া দুরস্ত হবে না। চরিত্রের দুটি রূপ তথা আল্লাহর ভয় ও আশা সম্পর্কে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। আল্লাহ তা'আলা দয়া করে এগুলো লাভ করার তাওফীক আমাদেরকে দান করুন। আমীন।

যুহদের তাৎপর্য

আজও একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা চলবে, যার নাম 'যুহদ'। অমুক বড় আবিদ ও যাহিদ। এ জাতীয় বাক্য আপনারা নিশ্চয় বহুবার শুনেছেন। 'যাহিদ' বলা হয় যার মাঝে 'যুহদ' আছে। আর 'যুহদ' একটি আত্মিক চরিত্র, যা সকল মুসলমানের জন্য জরুরী। 'যুহদ' অর্থ দুনিয়াবিমুখিতা, দুনিয়ার প্রতি অনীহা, হৃদয়ে দুনিয়ার প্রতি বিস্বাদ থাকা। পার্থিব জগত নিয়েই সকল কর্মকাণ্ড এবং তার পেছনেই রাতদিন লেগে থাকার নাম যুহদ নয়। বরং পার্থিব জগত থেকে নেশামুক্ত থাকার নাম যুহদ।

দুনিয়ার ভালোবাসা সকল গুনাহের মূল

যুহ্দ মুসলিম জীবনে এক জরুরী বিষয়। যেহেতু যার অন্তরে দুনিয়ার ভালোবাসা আসন করে নেয়, তার অন্তরে আল্লাহ তা'আলার মহব্বত আসন গ্রহণ করতে পারে না। আর হৃদয় আল্লাহর ভালোবাসা থেকে মুক্ত হলে সে ভ্রান্তপথে পরিচালিত হবেই। এই কারণেই নবীজি (সা.) বলেছেন–

حُبُّ الدُّنْيَا رَأسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ (كنز العمال رقم الحديث ٦١١٤)

'দুনিয়ার মহব্বত সকল গুনাহের মূল।' প্রকৃতপক্ষে দুনিয়াতে সংঘটিত সকল গুনাহের প্রতি একটু গভীর দৃষ্টি দিলে প্রতিভাত হয়ে উঠবে যে, সকল গুনাহের অন্তরালে দুনিয়ার মহব্বত কার্যকর। চোর চুরি করে কেন? দুনিয়ার

মোহেই তো! বদমাশ কেন বদমাশি করে? পার্থিব জগতের নেশা তার মধ্যে ক্রিয়াশিল, এজন্যই। মদ্যপের মদের নেশা মূলত দুনিয়ার সুখপ্রাপ্তির নেশা। অনুরূপভাবে প্রতিটি গুনাহের পেছনে এই একটি নেশাই ক্রিয়াশীল। দুনিয়ার ভালোবাসা যার অন্তরে আসন গেড়ে বসেছে, তার অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা প্রবেশ করবে কিভাবে?

আবু বকরকে আমি দোস্ত বানাতাম

প্রকৃত ভালোবাসা একজনের জন্যই হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা মানব হৃদয়কে এমন করেই সৃষ্টি করেছেন। হ্যাঁ, প্রয়োজনে মানুষ অনেককেই স্বজন বানায়। তবে হৃদয় শুধু একজনের জন্যই হয়। একজনের ভালোবাসা হৃদয়ে প্রোথিত হলে আর অন্য কাউকে সেই মানের ভালোবাসা দেয়া যায় না। এই কারণে হুযূর (সা.) আবু বকর সিদ্দিক (রা.)- কে বলেছিলেন–

لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلاً لَتَّخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ خَلِيْلاً (صحيح البخارى

كتاب الصلاة رقم الحديث٤٦٦)

"যদি এই পার্থিব জগতে কাউকে নিজের একান্ত প্রিয় বানাতাম, তাহলে আবু বকরকে বানাতাম।" নবীজি (সা.) এর সঙ্গে হযরত আবু বকর (রা.) এর সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত সুগভীর। গভীরতার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহ.) বলেছেন : একটি আয়না যদি রাসূল (সা.) এর সম্মুখে রাখা হয়, তাহলে তাঁর যে প্রতিচ্ছবি আয়নার মধ্যে দেদীপ্যমান হবে, বলা চলে বাস্তবের মানুষটি নবীজি নিজেই, আর আয়নার প্রতিচ্ছবিটি হযরত আবু বকর (রা.)এর। নবীজি (সা.)-এর অবিকল ছায়াছবি ছিলেন হযরত আবু বকর (রা)। এতদ্বসত্ত্বেও নবী কারীম (সা.) বলেন নি, "আমি আবু বকর (রা.)- কে দোস্ত বানিয়েছি।" বরং তিনি বলেছেন, যদি কাউকে দোস্ত বানাতাম। অর্থাৎ আমার প্রকৃত দোস্ত তো মহান আল্লাহ। আমার এ হৃদয় যেহেতু তাঁকেই দিয়েছি, তাই এ হৃদয় অন্য কাউকে দেয়ার অবকাশ আর নেই। হ্যাঁ, সম্পর্ক তো অন্যের সঙ্গেও হতে পারে। আর সেটা হয়ও। যথা স্ত্রী, ছেলে- মেয়ে, পিতা-মাতা ও ভাই- বোনের সঙ্গে সম্পর্ক। তাদের প্রতি হৃদয়ের টান থাকবে, যেহেতু তারা স্বজন। তবে তাদের প্রতি মহব্বত হবে আল্লাহ তা'আলার প্রতি আন্তরিক মহব্বত থাকার কারণেই। যেহেতু আত্মীয়-স্বজনের ভালোবাসা মূলত আল্লাহর ভালোবাসার আওতাধীন।

হৃদয়ে শুধু একজনের ভালোবাসা থাকতে পারে

হয়ত আল্লাহ তা'আলার মহব্বত,নয় তো দুনিয়ার মহব্বত হৃদয়ে থাকতে পারে। একই সঙ্গে উভয়ের মহব্বত অন্তরে থাকা সম্ভব নয়। মাওলানা রুমী (রহ.) এজন্য বলেছেন–

ہم خداخواہی وہم دنیائے دوں
ایں خیال است ومحال واست وجنوں

অর্থাৎ– দুনিয়ার মহব্বত এবং আল্লাহর মহব্বত একই সঙ্গে হৃদয়ে অবস্থান করবে এটা কখনো হতে পারে না। কারণ, এটা কল্পনা বৈ কিছুই নয়। অথবা এটা একেবারে অসম্ভব কিংবা নিরেট পাগলামি। দুনিয়ার মহব্বত আর আল্লাহর মহব্বত এক হতে পারে না। আর আল্লাহর মহব্বত ছাড়া দ্বীনের সকল কাজই অন্তঃসারশূন্য। তাঁর ভালোবাসামুক্ত দ্বীন সম্পূর্ণ তাৎপর্যহীন। যে দ্বীন পালন করতে গেলে কষ্ট-পেরেশানী ভোগ করতে হবে পদে পদে। বরং বাস্তবতা হলো, 'তাৎপর্যহীন দ্বীন' কখনো পালন করা সম্ভব নয়। বরং প্রতিটি পদক্ষেপে তখন হোঁচট খাবেই। তাই বলা হয়েছে, দুনিয়ার মহব্বত অন্তরে বপন করো না। আর এরই নাম যুহ্দ, যা লাভ করা অত্যাবশ্যক।

দুনিয়ার অধিকারী, তবে প্রত্যাশী নয়

বিষয়টি সত্যিই স্পর্শকাতর। তাই ভালো করে বুঝে নেয়া জরুরী। মানুষ দুনিয়া ছাড়া চলতে পারে না। তাকে এখানেই বসবাস করতে হয়। ক্ষুধার প্রয়োজনে খেতে হয়। পিপাসার তাগিদে পান করতে হয়। মাথা গোঁজানোর ব্যবস্থা করতে হয়। জীবনের প্রয়োজনে জীবিকা উপার্জন করতে হয়। তাই স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, এ সকল কাজ মানুষের নিতান্ত প্রয়োজন। দুনিয়াতে অবস্থান করতে হলে এসব প্রয়োজন মিটাতে হবেই। সুতরাং দুনিয়াতে অবস্থান করে দুনিয়ার সাথে হৃদয়ের সম্পর্ক গড়া যাবে না। বরং দুনিয়াবিমুখিতা গ্রহণ করতে হবে, এটা কেমন কথা! এটা বিশাল কঠিন কাজ নয় কি? হ্যাঁ, এই কঠিন কাজটি কিভাবে করতে হবে, এরই দিক- নির্দেশনা দিয়েছেন আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং তাঁদের উত্তরসূরী উলামায়ে কেরাম। তাঁরা বাতলে দেন তোমরা দুনিয়াতে বাস করা সত্ত্বেও তাকে হৃদয়ে স্থান দিতে পারবে না কিভাবে। প্রকৃত মুসলমান তো সেই যে দুনিয়াতে বসবাসও করবে, দুনিয়াবাসীর সঙ্গে মিলেমিশে চলবে,

তাদের হক আদায় করবে। পাশাপাশি দুনিয়ার মহব্বত থেকে নিজেকে নিরাপদেও রাখবে। হযরত মাজযূব (রহ.) বলেন–

دنیا میں ہوں دنیا کا طلب گار نہیں ہوں
بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں

"দুনিয়ার অধিবাসী, তবে দুনিয়া প্রত্যাশী নই।
বাজারে আসা-যাওয়া থাকলেও ক্রেতা নই।'

দুনিয়াতে থাকবে, অথচ তার মহব্বত অন্তরে বসানো যাবে না, এরূপ অবস্থা সৃষ্টি হয় কিভাবে?

দুনিয়ার দৃষ্টান্ত

এ কথাটিই মাওলানা রুমী (রহ.) একটি উপমার মাধ্যমে বুঝিয়েছেন। চমৎকার উপমা। তিনি বলেছেন, মানুষ এই দুনিয়ার বাসিন্দা। তাই দুনিয়াতে টিকে থাকতে হলে অসংখ্য প্রয়োজনের মুখোমুখি হবে সে। মানুষের দৃষ্টান্ত কিশতির মতো আর দুনিয়া হলো পানির মতো। কেউ যদি পানি ছাড়া কিশতি চালাতে চায়, তাহলে কিশতি চলবে না। কারণ, পানি ছাড়া শুকনো স্থানে নৌকা চলতে পারে না। অনুরূপভাবে, পার্থিব ধন-সম্পদ ছাড়া, জীবিকা অর্জন ও পানাহার ছাড়া, ঘর-বাড়ি ও পোশাক-পরিচ্ছদ ছাড়া মানুষের জীবন টিকে থাকতে পারে না। আর এ সকল জিনিসকেই তো দুনিয়া বলে। কিন্তু এই পানি ততক্ষণ পর্যন্ত কিশতির অনুকূলে শক্তি হিসেবে বিবেচিত হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তা কিশতির নিচে, সামনে- পেছনে এবং আশেপাশে অবস্থান করবে। এই পানি যদি কিশতির বাইরে অবস্থান করার পরিবর্তে কিশতির ভিতরে ঢুকে পড়ে, তাহলে এই পানিই হবে তার জন্য কাল। এই পানিই ডুবিয়ে ধ্বংস করে ছাড়বে কিশতিকে। তেমনিভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত পার্থিব ধন-সম্পদ মানুষের আশেপাশে থাকবে, মানুষের প্রয়োজনে কাজে আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন ভয় নেই। কিন্তু যদি এই পার্থিব সম্পদ হৃদয়ের কিশতি ভেদ করে অন্দরে ঢুকে পড়ে, তাহলে এই পানি তোমার জীবনতরীকে মাঝসাগরে ডুবিয়ে মারবে। মাওলানা রুমী (রহ.) এর ভাষায়–

آب اندر زیر کشتی پشتی است
آب در کشتی ہلاک کشتی است

অর্থাৎ- পানি যতক্ষণ পর্যন্ত কিশতির আশেপাশে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে কিশতিকে চালাতে থাকে। কিন্তু পানি যখন কিশতির ভিতরে ঢুকে পড়ে, তখন তাকে ডুবিয়ে দেয়।

দুই ভালোবাসা একসঙ্গে থাকতে পারে না

দুনিয়াকে হৃদয়ে স্থান না দিয়ে প্রয়োজনে তাগিদে ব্যবহার করার নামই তো যুহদ। দুনিয়া যদি হৃদয়রাজ্যে ঢুকে পড়ে, তাহলে আল্লাহর ভালোবাসা সেখান থেকে পালাবে। কারণ, এই দুই ভালোবাসা একসঙ্গে বাস করতে পারে না। আমার আব্বাজান মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ) একটি কবিতা শোনাতেন এবং সম্ভবত তার নিসবত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.)- এর শায়খ হযরত মিয়াজী নূর মুহাম্মদ (রহ.) এর দিকে করতেন। মূলত, এমন সুন্দর কবিতা তিনিই বলতে পারেন। তিনি বলেন-

بھر رہا ہے دل میں حب جاه ومال
کب سماوے اس میں حب ذوالجلال

অর্থাৎ- পদমর্যাদা ও অর্থ-কড়ির ভালোবাসায় অন্তর টই-টম্বুর, তাহলে সে অন্তরে আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা স্থান পাবে কিভাবে? তাই নির্দেশ হলো, দুনিয়ার ভালোবাসা হৃদয়ে স্থান দিওনা। দুনিয়া ছেড়ে দেয়া জরুরী নয়, তবে দুনিয়ার মহব্বত ছেড়ে দেয়া জরুরি। দুনিয়া কমনীয়, মোহনীয় না হলে সে দুনিয়া কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারে না।

বাথরুম পার্থিব জগতের একটি উপমা

সাধারণত বুঝে আসে না যে, একদিকে মানুষের জীবনে পার্থিব জগতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য, অন্যদিকে তার প্রতি জীবনের কোনো মোহ ও আকর্ষণ থাকতে পারবে না- এটা কি করে সম্ভব? আসলে একটি উপমা পেশ করলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে। মানুষ যখন বাড়ি বানায়, তখন সেই বাড়িতে অনেকগুলো রুম থাকে। ড্রইং রুম, বেড রুম কিংবা কিচেন রুমসহ সব ধরণের রুমই বাড়ির অংশ হিসেবে গন্য। বাড়ির মাঝে আরেকটি রুমও থাকে, যাকে বলা হয় 'বাথরুম'। এ বাথরুম ছাড়া বাড়িটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। যত শানদার বাড়িই হোক না কেন, যথা বিশাল ড্রইং রুম, সুসজ্জিত বেড রুমসহ সকল রুমেই রয়েছে আভিজাত্যের ছোঁয়া। কিন্তু বাড়িটিতে বাথরুম নেই। বলুন তো,

তাহলে বাড়িটিকে কি সত্যিই স্বয়ংসম্পূর্ণ বাড়ি বলা হবে? না অসম্পূর্ণ বাড়ি বলা হবে। বলা বাহুল্য, বাড়িটি অসম্পূর্ণ হিসেবেই তো বিবেচিত হবে। কারণ, বাথরুম ব্যতীত স্বয়ংসম্পূর্ণ কোনো বাড়ি হতে পারে না। কিন্তু তাই বলে বাথরুমের কল্পনা মানুষের অস্থিমজ্জায় বসেও থাকে না। কখন বাথরুমে যাবো, সেখানে কত সময় কিভাবে কাটাবো– এ ধরনের উদ্ভট কামনা মানুষ কখনো করে না। যদিও সে জানে, বাথরুম অবশ্যই প্রয়োজন। তাই বলে শুধু তার চিন্তাই তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে এমন নয়। কারণ, এটি অতীব প্রয়োজনীয় জিনিস হলেও ভালোবাসার জিনিস তো নয়।

দুনিয়ার জীবন যেন ধোঁকায় না ফেলে

প্রকৃতপক্ষে দ্বীনের শিক্ষাও এটি। দুনিয়ার ধন-সম্পদ বাথরুমের মতোই মানুষের প্রয়োজন। সুতরাং তাকে এ দৃষ্টিকোণেই মূল্যায়ন করতে হবে। তার ভালোবাসা যেন অস্থিমজ্জায় বসে না যায় সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। তাই বুযুর্গগণ বলেছেন– দুনিয়ার অসাড়তা বারবার স্মরণ করবে। উদ্ধৃত আয়াতটিতেও আল্লাহ তা'আলা এই কথা বলেছেন–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُوْرُ (سورة الفاطر،٥٠)

"হে মানুষ! নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য। সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে প্রতারণা না করে এবং সেই প্রবঞ্চক যেন কিছুতেই তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে।" [সূরা ফাতির, আয়াত-৫০]

শায়খ ফরিদুদ্দীন আত্তার (রহ.)

আল্লাহ তা'আলার কিছু নেক বান্দা এমনও আছেন, যাঁদেরকে তিনি নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য কিছু সরস শক্তি প্রেরণ করেন। এসব সরস শক্তি পাঠানোর মাধ্যমে তিনি তাদের অন্তর থেকে দুনিয়ার নেশা তাড়িয়ে দিয়ে তাঁর ভালোবাসার প্রতি আহবান করেন। প্রসিদ্ধ বুযুর্গ হযরত শায়খ ফরিদুদ্দিন আত্তার (রহ.) এমনই একজন আল্লাহর অনুগ্রহধন্য বান্দা। তাঁর গল্প আমি আমার আব্বাজান মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ) থেকে শুনেছি। তিনি বলেছেন, শায়খ ফরিদুদ্দিন আত্তার ছিলেন একজন ইউনানী ঔষধ ও আতর ব্যবসায়ী। এ কারণেই তাঁকে 'আত্তার' বলা হয়। ওষুধ এবং আতরের বিশাল দোকান ছিল

তাঁর। বাণিজ্যও বহু বিস্তৃত ছিল। সেই যুগে তিনি ছিলেন এক খান্ দুনিয়াদার। ওষুধের বোতল আর আতরের শিশিতে তার দোকান ছিল সমৃদ্ধ। একদিন কোত্থেকে এক জীর্ণশীর্ণ আত্মভোলা দরবেশ তাঁর দোকানে প্রবেশ করলেন এবং দোকানের ভিতরে দাঁড়িয়ে তিনি ডান-বাম, উপরে-নিচে মোটকথা সম্পূর্ণ দোকান পর্যবেক্ষণ শুরু করলেন। একবার আতরের একটি শিশি আবার আরেকটি শিশি নিয়ে গভীর মনোযোগের সাথে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন এ অপরিচিত দরবেশ। এভাবে বেশ কিছু সময় যাওয়ার পর শায়খ ফরিদুদ্দিন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন: "এই যে, আপনি কী দেখছেন? কী খুঁজছেন?" দরবেশ উত্তর দিলেন, "না, কিছু না। এমনিতেই শিশিগুলো দেখছি।" শায়খ ফরিদুদ্দিন বললেন, আপনি কি কিছু কিনতে চাচ্ছেন?' দরবেশ এবারও উত্তর দিলেন, 'না, কিছু কেনার প্রয়োজন তো আমার নেই। ব্যস, কেবল দেখছি।' এই বলে দরবেশ আলমারিতে সজ্জিত শিশিগুলোর প্রতি নজর বোলাতে লাগলেন। এক একটি শিশি বারবার দেখতে লাগলেন। শায়খ ফরিদুদ্দিন এবার কিছুটা বিরক্তভঙ্গিতে বলে উঠলেন, 'অবশেষে আপনি দেখছেনটা কি?' দরবেশ বললেন, 'মূলত আমি দেখছি মরার সময় আপনার প্রাণটা বের হবে কিভাবে? কারণ,আপনার দোকানে শিশির যেরূপ বিশাল সমাহার দেখা যাচ্ছে, আপনি যখন মরবেন তখন প্রাণ বের হওয়ার সময় কখনো এ শিশিতে কখনো ওই শিশিতে ঢুকে পড়বে। এতগুলো শিশির মধ্য থেকে তখন আপনার প্রাণ কোন পথে বের হবে? বের হওয়ার পথ সে কিভাবে খুঁজে পাবে?"

শায়খ ফরিদুদ্দিন আত্তার যেহেতু তখনও ছিলেন একজন ব্যবসায়ী, তাই দরবেশের কথা শুনে রেগে গেলেন এবং বললেন, 'আপনি আমার প্রাণের চিন্তা করছেন,আপনার প্রাণ বের হবে কিভাবে? আপনারটা যেভাবে বের হবে আমার প্রাণও সেভাবেই বের হবে।' উত্তরে দরবেশ বললেন, 'আমার প্রাণ বের হওয়ার ব্যাপারে এত চিন্তা কিসের। কারণ, আমি রিক্তহস্ত, ব্যবসা -বাণিজ্য, দোকান -পাট, শিশি- বোতল, অর্থ -সম্পদ বলতে আমার কিছুই নেই।' এতটুকু বলেই দরবেশ দোকান থেকে বের হয়ে মাটিতে শুয়ে গেলেন এবং কালিমায়ে শাহাদাত "আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু" পাঠ করলেন। এভাবে প্রাণবায়ু উড়ে যাওয়ার পর দরবেশ নিস্তেজ হয়ে গেলেন।

এই একটি ঘটনা শায়খ ফরিদুদ্দিনের অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে দিল। তিনি ভাবলেন, বাস্তবেই তো দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা আমি দুনিয়ার পেছনে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আল্লাহ তা'আলাকে তো আসলেই আমি ভুলতে বসেছি। তাঁর কোনো ধ্যান ও ফিকির আজ আমার মধ্যে নেই। আর আল্লাহর এই নেক বান্দা কিভাবে প্রশান্তচিত্তে আল্লাহর দরবারে চলে গেলেন। অবশেষে এই ঘটনাটিই শায়খ ফরিদুদ্দিন আত্তার (রহ.) এর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। এ ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে একে গায়েবি পয়গাম, যা তাঁর হিদায়াতের ওসীলা হিসেবে কাজ করেছিল। তিনি সেদিনই ব্যবসা-বাণিজ্য অন্যের নিকট সোপর্দ করে দিলেন। আল্লাহর হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়ে তিনি এ পথে সাধনা শুরু করলেন। এমনকি এত বড় শায়খ বনে গেলেন যে, দুনিয়াবাসীর হিদায়াতের বাতিঘরে পরিণত হলো তাঁর সোনালী জীবন।

হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.)

শায়খ ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.) ছিলেন একজন বাদশাহ। এক রাতে তিনি দেখতে পেলেন, তাঁর মহলের ছাদে কে যেন টহল দিচ্ছে। ভাবলেন, কোনো চোর হয়তো চুরি করার নিয়তে এখানে এসেছে। পাকড়াও করে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে এই সময় তুমি কোত্থেকে আসলে? কী কাজে আসলে? লোকটি উত্তর দিল, 'আসলে আমার একটি উট হারিয়ে গেছে, সেই উটটি খুঁজছি।' ইবরাহীম ইবনে আদহাম বললেন, 'তোমার মাথা ঠিক আছে তো? উটের সঙ্গে মহলের ছাদের কি সম্পর্ক? উট হারিয়ে গেলে মাঠে গিয়ে খোঁজ নাও। এখানে মহলের ছাদে উট খোঁজা তো নির্বোধের কাজ। তুমি তো দেখি নিরেট বোকা।' জবাবে লোকটি বলল, 'মহলের ছাদে যদি উট পাওয়া না যায়,তাহলে মহলের ভেতরে বসে খোদাকেও পাওয়া যাবে না। আমি যদি নির্বোধ হই, তবে তো তুমি আরো বড় নির্বোধ। কারণ, এ মহলে বাস করে খোদাকে তালাশ করা তো আরো বেশি বোকামি। এতটুকু কথাতেই ইবরাহীম ইবনে আদহামের হৃদয় ঝাঁকুনি দিয়ে উঠলো। সম্পূর্ণ রাজত্বকে দূরে ঠেলে দিয়ে তিনি আল্লাহর পথে পা বাড়ালেন। এটাও ছিল মূলত আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এক গায়েবি ইশারা।

উপদেশ গ্রহণ করুন

আমাদের মত দুর্বলমনা মানুষ উক্ত ঘটনা থেকে এই উপদেশ গ্রহণ করা সমীচিন হবে না যে, তাঁর মতো আমরাও সবকিছু ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর পথে বের হয়ে যাবো। এমন করা আমাদের ন্যায় ভঙ্গুরদের ক্ষেত্রে অনুচিত। তবে ঘটনাটির মধ্যে উপদেশ লাভ করার বিষয়ও আছে। তাহলো, দুনিয়ার অর্থ-সম্পদ, আরাম-আয়েশ মানুষের হৃদয়ের গভীরে বদ্ধমূল হয়ে গেলে অর্থ-সম্পদের নেশায় মত্ত অন্তরে আল্লাহ তা'আলার মহব্বত আসে না। আর আল্লাহর মহব্বত হৃদয়ে উদ্ভাসিত থাকলে, দুনিয়ার মহব্বত সে হৃদয়ে বদ্ধমূল হতে পারে না। প্রয়োজনে অর্থ-সম্পদ তো থাকবেই। তাই বলে তা ভালোবাসার বস্তু হতে পারে না।

আমার আব্বাজান এবং দুনিয়ার ভালোবাসা

আমার আব্বাজান মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.)। আল্লাহ তাঁর মাকাম সমুন্নত করুন। আমীন। তাঁর ব্যক্তিজীবনে শরিয়ত এবং তরিকতের অনেক উপমা আল্লাহ আমাদেরকে দেখিয়েছেন। তাঁকে না পেলে আমরা বুঝতাম না যে, সুন্নাতসম্মত জীবন কেমন? তিনি জীবিতাবস্থায় সব কাজই করেছেন। দরস-তাদরীসের কাজ তিনি করেছেন। ফতওয়া লিখেছেন, লেখালেখি করেছেন, ওয়াজ-তাবলীগ করেছেন, পীর-মুরিদী করেছেন, পাশাপাশি বিবি-বাচ্চার লাল-পালনের জন্য, পারিবারিক হক পূরণ করার জন্য ব্যবসাও করেছেন। এত কিছু সত্ত্বেও দেখেছি তাঁর অন্তরে দুনিয়ার প্রতি ন্যূনতম মোহও ছিল না।

ওই বাগান আমার অন্তর থেকে বের হয়ে গেছে

আব্বাজানের বাগ-বাগিচা করার প্রতি শখ ছিল। পাকিস্তান গঠনের পূর্বে দেওবন্দে তিনি বড় শখ করে একটি বাগান করেছিলেন। দারুল উলূম দেওবন্দ-এ চাকুরি করার সময় বেতন ছিল কম; অথচ পরিবার ছিল বড়। এ স্বল্প বেতনে জীবন যাপন করতে আব্বাজান হিমশিম খেতেন। তবুও বহু কষ্ট করে কিছু টাকা জোগাড় করে তিনি একটি আম বাগান লাগিয়েছিলেন। যে বছর আম বাগানে প্রথম ফল ধরেছিল, সেই বছরেই পাকিস্তান গঠনের ঘোষণা হয়েছিল। তাই তিনি হিজরত করার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং অবশেষে পাকিস্তান

চলে আসলেন। আর আমাদের ওই বাগান এবং বাড়ি হিন্দুরা দখল করে নিয়ে গেল। পরবর্তীতে আব্বাজানের মুখে অনেকবার বলতে শুনেছি। তিনি বলতেন, "যেদিন ওই বাড়ি এবং বাগান থেকে বের হয়ে বাইরে কদম ফেলেছি, সেদিন থেকে ওই বাড়ি এবং বাগান আমার অন্তর থেকে মুছে গেছে। একবারের জন্য ভুলেও মনে আসে নি যে, কেমন বাগান আর কেমন বাড়ি আমি তৈরি করেছিলাম। কারণ, এসব কিছু তিনি অবশ্যই করেছিলেন, তবে হক আদায় করার লক্ষ্যে করেছেন। অন্তরে এগুলোর ভালোবাসা জিইয়ে রাখার জন্য তো তিনি এসব কিছু করেন নি।

দুনিয়া অনুগত হয়ে সামনে আসে!

আব্বাজানকে আজীবন দেখেছি, কেউ কোনো বিষয়ে তাঁর সঙ্গে অহেতুক ঝগড়া বাঁধলে তিনি সত্যের উপর থাকলেও বলতেন, "আরে ভাই, ঝগড়া ছাড়ো, যার জন্য ঝগড়া করছ, তা নিয়ে যাও।" এভাবে সব সময় তিনি নিজের হক ছেড়ে দিতেন। আর নবীজি (সা.)-এর এ হাদীসটি শুনাতেন। নবীজি (সা.) বলেছেন–

أَنَا زَعِيْمٌ بِبَيْتٍ فِيْ رَبْضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا

(ابود اود، كتاب الا دب ،باب فى حسن الخلق، رقم الحديث ٤٨٠٠)

"ওই ব্যক্তিকে জান্নাতে বাড়ি দেয়ার জিম্মাদারি আমি নিচ্ছি, যে ব্যক্তি সত্যের উপর থাকা সত্ত্বেও ঝগড়া-বিবাদ ছেড়ে দিয়েছে।" আব্বাজান সারা জীবন হাদীসটির উপর আমল করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে আমরা আফসোস করতাম। ভাবতাম, একটু জোর করলেই তিনি হকটি পেয়ে যেতেন। অথচ দেখেছি, তবুও তিনি নিজের হক ছেড়ে দিয়ে পৃথক হয়ে যেতেন। তার পরেই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দুনিয়া দান করেছেন। এমন লোকের নিকটেই দুনিয়া দুর্বল হয় প্রতিভাত হয়। যথা হাদীস শরীফে এসেছে -

أَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ (ابن ماجه، كتاب الزهد، باب الهم بالدنى ٤١٥٧)

অর্থাৎ– যে একবার দুনিয়ার প্রত্যাশাবিমুখ হবে, আল্লাহ তা'আলা সারা দুনিয়া তার সম্মুখে অবনত করে উপস্থিত করবেন। দুনিয়া তখন তার পদতলে এসে গড়াগড়ি করবে। তবুও তার হৃদয়ে দুনিয়ার প্রতি আগ্রহ জাগবে না।

দুনিয়া ছায়ার ন্যায়

জনৈক লোক দুনিয়ার একটি চমৎকার উপমা দিয়েছেন। বলেছেন, দুনিয়ার উপমা মানুষের ছায়ার মত। মানুষ যদি ছায়ার পেছনে দৌড়ে তাকে ধরতে চায়, তাহলে তা কখনো পারবে না। ছায়ার পেছনে যত দৌড়াবে, ছায়া তার চেয়েও অধিক গতিতে ভাগতে থাকবে। কিন্তু ছায়া থেকে মুখ ফিরিয়ে যদি তার উল্টো দিকে মানুষ চলতে শুরু করে, তাহলে ছায়াও সমগতিতে তার পেছনে পেছনে ছুটতে থাকবে। অনুরূপভাবে মহান আল্লাহও দুনিয়াকে এ রকম করে সৃষ্টি করেছেন। যদি মানুষ দুনিয়ার প্রার্থী হয়ে তাকে পাওয়ার লোভে তার পেছনে ছুটতে থাকে, তবে এ দুনিয়া কখনো ধরা দিবে না। দুনিয়া তখন আগে আগে ভাগতে থাকবে। তাকে ধরার সাধ্য থাকবে না। কিন্তু মানুষ যখন এ দুনিয়ার লোভ না করে তার প্রতি অনীহা দেখাবে, তখন দেখতে পাবে, দুনিয়া তার পদতলে কিভাবে থুবড়ে পড়ে। দুনিয়া কাছে আসার পর লাথি মেরে ফেলে দেয়া হয়েছে তবুও পুনরায় সে পায়ের উপর এসেছে। এরূপ দৃষ্টান্ত মোটেও বিরল নয়। তাই অন্তরাত্মাকে পবিত্র করে একবারমাত্র দুনিয়া বর্জন করে দেখা জরুরি। দুনিয়ার অসাড়তা বুঝলেই তবে কথাগুলো বুঝে আসবে। নবী করীম (সা.) যেসব হাদীসে দুনিয়ার অসাড়তা সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছেন, এসব হাদীস পড়ে দুনিয়ার মহব্বত হৃদয় থেকে দূর করে দেয়ার ফিকির করতে হবে।

বাহরাইন থেকে সম্পদের আগমন

عَنْ عَمْرِوبْنِ عَوْفِ الْاَنْصَارِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اِلَى الْبَحْرَيْنِ الخ (صحيح البخارى، رقم الحديث ٢٢٢٥)

হযরত আমর ইবনে আউফ আল-আনসারী (রা.) বলেন- হুযূর (সা.) হযরত উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা.)- কে বাহরাইনের গভর্নর করে পাঠানোর সময় তাঁকে এ দায়িত্ব দিয়েছিলেন যে, কাফির-মুশরিকদের উপর নির্ধারিত ট্যাক্স উসূল করবে। পরবর্তীতে বাহরাইনের সেই ট্যাক্স একবার মদীনায় এসেছিল। টাকা-পয়সা, কাপড়- চোপড়ে ভরপুর ছিল ট্যাক্সের সকল সম্পদ। হুযূর (সা.) এর অভ্যাস ছিল, তিনি ট্যাক্সের মালামাল সাহাবায়ে কেরামের মাঝে

বণ্টন করে দিতেন। সাহাবায়ে কেরাম যখন জানতে পারলেন, উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা.) ট্যাক্সের মালামাল মদীনাতে এনেছেন, তখন কিছু আনসার সাহাবা ফজরের পরেই মসজিদে নববীতে উপস্থিত হয়ে গেলেন। হুযূর (সা.) নামায পড়ে যখন ঘরে ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন আনসার সাহাবারা তাঁর সামনে এসে ঘোরাঘুরি করতে লাগলেন। কিন্তু তারা মুখে কোনো কিছুই বললেন না। সামনে এসে ঘোরাঘুরি করার উদ্দেশ্য, বাহরাইন থেকে আগত সম্পদ যেন তাদের মাঝে বণ্টন করে দেয়া হয়। ঘটনাটি সেই যামানার, যে যামানায় সাহাবায়ে কেরাম দারিদ্র্যসীমার নিচে পৌছে গিয়েছিল। দিনের পর দিন তাদের অনাহারে কেটে যেত। অন্নহীন-বস্ত্রহীন জীবন যাপনে তারা অতিষ্ট হয়ে উঠেছিল। আনসার সাহাবাদের এই কাণ্ড দেখে নবীজি মুসকি হাসলেন। বুঝে গেলেন তারা কি চাচ্ছেন। তাই তিনি বলে উঠলেন, 'আমার মনে হয় বাহারাইন থেকে উবাইদাহর আনীত সম্পদ সম্পর্কে তোমরা জানতে পেরেছ।' তারা উত্তর দিলেন, 'জ্বি হ্যাঁ, ইয়া রাসুলাল্লাহ (সা.)।' হুযূর (সা.) তাদেরকে বললেন, তাহলে তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর, ওসব সম্পদ তোমাদেরই দেয়া হবে।

তোমাদের ব্যাপারে দরিদ্র্যতার আশঙ্কা করছি না

পরক্ষণেই নবীজির অনুভূতি জাগল যে, সাহাবায়ে কেরামের এভাবে অর্থের জন্য চলে আসা, ভাব-ভঙ্গিমায় সম্পদের প্রত্যাশা করা এবং তার জন্য অপেক্ষা করা– এসব কাজ তাঁদেরকে দুনিয়ার প্রতি অনুরাগী করে তুলবে না তো? তাই তিনি সুসংবাদ শুনিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে উদ্দেশ করে বললেন–

فَوَاللّٰهِ مَا الْفَقْرَ اَخْشٰى عَلَيْكُمْ، وَلٰكِنِّىْ اَخْشٰى اَنْ تَبْسُطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بَسَطَتْ عَلٰى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوْهَا كَمَا تَنَافَسُوْهَا فَيُهْلِكَكُمْ كَمَا اَهْلَكَتْهُمْ (صحيح البخارى، كتاب الرقاق، باب مايحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، رقم الحديث ٦٤٢٥)

"আল্লাহর কসম! তোমাদের ব্যাপারে আমি দরিদ্রতার আশংকা করছি না। অর্থাৎ– আমি ভয় করছি না যে, তোমরা ক্ষুধা-পিপাসায়, বস্ত্রহীনতায় দিন

কাটাবে, কষ্ট ও পেরেশানি তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিবে। কারণ, 'আল্লাহ চাহেন তো' অনাগত যামানা মুসলমানদের সুখ ও প্রাচুর্যের যামানা। মূলত মুসলমানদের ভাগ্যে বঞ্চিত সকল দরিদ্রতা স্বয়ং নবীজি (সা.) সহ্য করেছেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, 'তিন তিন মাসব্যাপি আমাদের চুলায় আগুন জ্বলতো না। খেজুর আর পানি ছাড়া অন্য কোনো খাবার তখন আমরা খেতে পেতাম না। বিশ্বনবী (সা.) কখনো দু'বেলা রুটি পেট ভরে খেতে পারেন নি। ময়দার রুটি তো অনেক দূরের কথা, যবের রুটিরই এই অবস্থা ছিল। আসলে দরিদ্রতা কাকে বলে, তা দেখেছেন মহানবী (সা.)।

সাহাবায়ে কেরামের যামানায় অভাব-অনটন

হযরত আয়শা (রা.) বলেন, সেই সময় আমাদের অবস্থা এমন ছিল, একবার নকশিকরা একটি সুঁতি কাপড় আমাদের ঘরে কোত্থেকে যেন হাদিয়াস্বরূপ এসেছিল। কাপড়টি বেশি দামি ছিল না। অথচ পুরো মদীনার কোথাও কোনো বিয়ের অনুষ্ঠান হলে কনেকে সেই কাপড়টি পরিধান করানোর জন্য আমার নিকট সকলেই তা ধার নিত। বিয়ে-শাদিতে এই কাপড়টিই ছিল কনের জন্য মূল্যবান বস্ত্র। অতঃপর আয়শা (রা.) বলেন, অথচ আজ এ ধরনের কত কাপড় বাজারে লুটোপুটি খাচ্ছে। ওই কাপড়টি যদি এখন আমার বাদিকে দিই, তাহলে সেও নাক ছিটকাবে। ঘটনাটি থেকেই অনুধাবন করুন, নবী কারীম (সা.) এর যুগের অভাব-অনটন কত তীব্র ছিল।

এই দুনিয়া যেন তোমাদেরকে ধ্বংস না করে

তাই মহানবী (সা.) বলেছেন- অনাগত যুগে ব্যাপকভাবে তোমাদের নিকট দরিদ্রতা আসবে না। বাস্তবেই মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস খোঁজ করলে দেখা যায়, নবীজি (সা.) এর যুগের পর মুসলিম উম্মাহকে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ গ্রাস করতে পারেনি। বরং তারপর থেকেই শুরু হয়েছে তাদের জন্য প্রাচুর্যময় যুগ। তিনি আরো বলেছেন, অভাব-অনটন আসলেও ক্ষতির আশংকা করছি না। কারণ, তখন হয়ত কিছু পার্থিব ক্ষয়ক্ষতি হবে, কিন্তু গোমরাহি ব্যাপকভাবে ছড়াবে না। তবে আমি ভয় করছি, পূর্ববর্তী উম্মতের ধন-সম্পদের মত যখন পার্থিব

ধন-সম্পদ তোমাদের মাঝেও বিকশিত হবে, তোমাদের চতুর্পাশে অর্থ-সম্পদ যখন উতলে উঠবে, তখন তোমরা এ ধন-সম্পদের নেশায় পরস্পর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে যাবে। চিন্তা-চেতনায় তখন তোমাদের কেবল উচ্চাকাঙ্ক্ষা বিরাজ করবে। অমুকের বাড়ির মত বাড়ি, গাড়ির মত গাড়ি, পোশাকের মত পোশাক, বরং তার চেয়েও উন্নত জিনিস লাভ করতে উন্মত্ত হয়ে পড়বে। যার অনিবার্য পরিণতি হবে, এ দুনিয়ার নেশা তোমাদেরকে ঠিক সেভাবে ধ্বংস করে ছাড়বে, যেভাবে ধ্বংস করেছিল পূর্ববর্তী উম্মতদেরকে।

তোমাদের পদতলে যখন গালিচা বিছানো থাকবে

এক হাদীসে এসেছে, একবার নবীজি সাহাবায়ে কেরামের মাঝে তাশরীফ আনলেন এবং বললেন, যখন তোমাদের পদতলে গালিচা বিছানো থাকবে, তখন তোমাদের অবস্থা কেমন হবে? একথা শুনে সাহাবায়ে কেরামের মাঝে বিস্ময়ভাব ফুটে উঠলো। কারণ, গালিচা তো কল্পনাবিলাস বৈ কিছু নয়। যেখানে খেজুর পাতার চাটাই ভাগ্যে জোটে না। মাটিতে শুতে হয়, সেখানে গালিচা তো স্বপ্নের বস্তু। কোথায় গালিচা আর কোথায় আমরা। তাই তারা নবীজি (সা.)-কে প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.)

أَيْنَ لَنَا الْأَنْمَاطُ، قَالَ إِنَّهَا سَتَكُوْنُ

"আমরা গালিচা পাবো কোথায়?" হুযূর (সা.) উত্তর দিলেন, 'যদিও এখন গালিচা তোমাদের নিকট স্বপ্নের বস্তু মনে হয়; কিন্তু সে দিন বেশি দূরে নয়, তোমাদের নিকট গালিচাও থাকবে। [বুখারী শরীফ, কিতাবুল মানাক্বিব হাদীস নং-৩৬৩১]

এজন্যই হুযূর (সা.) বলেছেন, তোমাদের ব্যাপারে আমি দরিদ্রতার ভয় করছি না। তবে আমি সেই সময়ের ভাবনায় সন্ত্রস্ত, যেই সময় তোমাদের পদতলে কার্পেট-গালিচা বিছানো থাকবে। অর্থবৈভব তোমাদের আশেপাশে সরগরম থাকবে আর তোমরা আল্লাহকে ভুলে যাবে। দ্বীনের বিস্মৃতির কারণের দুনিয়া তোমাদের উপর বিজয় লাভ করবে।

জান্নাতের রুমাল এর চেয়েও উত্তম

হাদীস শরীফে এসেছে। একবার সিরিয়া থেকে এক রেশমি কাপড় রাসূল (সা.) এর নিকট আসল। সাহাবায়ে কেরাম ইতিপূর্বে এত মূল্যবান কাপড় দেখেননি। তাই তারা প্রত্যেকে রুমালটি হাতে নিয়ে দেখতে লাগলেন। এ অবস্থা দেখে হুযূর (সা.) সঙ্গে সঙ্গে ইরশাদ করলেন–

لَمَنَادِيْلُ سَعْدِبْنِ مُعَاذٍ فِى الْجَنَّةِ اَفْضَلُ مِنْ هٰذَا (صحيح البخارى، كتاب بدل الخبنق، باب ما جاء فى صفة الجنة، رقم الحديث ٣٢٤٩)

"তোমরা কাপড়টি দেখে বিস্মিত হচ্ছো কি? কাপড়টি তোমাদের নিকট কি খুব পছন্দ? আল্লাহ তা'আলা সা'দ ইবনে মু'আয (রা.)- কে জান্নাতে যে রুমাল দান করেছেন, সেটি এর চেয়েও বেশি উত্তম।"

মহানবী (সা.) এভাবে সাহাবায়ে কেরামের মনোযোগকে দুনিয়া থেকে ফিরিয়ে আখেরাতমুখী করে দিলেন। দুনিয়ার মহব্বত যেন তোমাদের প্রবঞ্চিত না করে। তার কারণে আখেরাতের নিয়ামতরাজি ভুলে বসো না। প্রতিটি পদক্ষেপে রাসূল (সা.) সাহাবায়ে কেরামের চিন্তা-চেতনায় দুনিয়ার মূল্যহীনতার কথা প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন। এ দুনিয়া তুচ্ছ বস্তু, তার সুখ-সমৃদ্ধি নিঃশেষিত। সুতরাং তাকে হৃদয় দেয়ার মত বস্তু সে নয়।

সমগ্র দুনিয়া মাছির একটি ডানার সমান

এক হাদীসে নবী করীম (সা.) বলেছেন–

لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ مَا سَقٰى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةً (جامع الترمذى، كتاب الزهد، رقم الحديث ٢٢٢١)

অর্থাৎ– দুনিয়ার মর্যাদা যদি আল্লাহ তা'আলার নিকট মাছির একটি ডানার সমানও হতো, তাহলে তিনি কোনো কাফিরকে এক ঢোক পানিও পান করাতেন না। দুনিয়ার মূল্যহীনতার কারণেই কাফিররা পার্থিব জগতে আয়েশি জীবন যাপন করতে পারে। আল্লাহর নাফরমানি করা সত্ত্বেও দুরাচারী কাফির গোষ্ঠি

কত সুখে জীবন কাটাচ্ছে। দুনিয়া এতই তুচ্ছ যে, তার মর্যাদা মাছির একটি ডানা বরাবরও নয়। যদি মাছির একটি ডানাসম তাৎপর্যও তার থাকত, তাহলে কোনো কাফিরের ভাগ্যে পানির একটি চুমুকও জুটতো না।

একবার কোন এক পথে হুযুর (সা.) সাহাবায়ে কেরামকে সঙ্গে নিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে দেখতে পেলেন, কানকাটা মৃত একটি ছাগল-ছানা পড়ে আছে। তিনি ছাগলের মৃত ছানাটির প্রতি ইঙ্গিত করে সাহাবায়ে কেরামকে প্রশ্ন করলেন, 'তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছ কি, যে এ ছাগল ছানাটিকে এক দিরহামের বিনিময়ে খরিদ করবে?' সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ' হে আল্লাহর রাসূল (সা.) এ ছানাটি যদি জীবিতও থাকত তাহলেও এক দিরহামের বিনিময়ে কেউ খরিদ করত না। কারণ, এটির কানকাটা ত্রুটিযুক্ত। আর এখন তো সে মৃত। মৃত লাশটি নিয়ে আমরা কি করবো?' অতঃপর হুযুর (সা.) বললেন, 'আল্লাহ তা'আলার নিকট এ পার্থিব জগত এবং তার সকল ধন-সম্পদের মূল্য তার চেয়েও তুচ্ছ। বকরির এ ছানাটির যেমনিভাবে কোনো মূল্য তোমাদের কাছে নেই, তেমনিভাবে এ দুনিয়ারও কোনো মূল্য আল্লাহর কাছে নেই।

তামাম দুনিয়া তাদের গোলামে পরিণত হয়েছে

সাহাবায়ে কেরামের অস্থিমজ্জায় নবী করীম (সা.) একথা বদ্ধমূল করে দিয়েছেন যে, দুনিয়ার প্রতি কেনো উৎসাহ থাকতে পারবে না। তাকে অন্তর দেয়া যাবে না। প্রয়োজন মুহূর্তে তাকে অবশ্যই কাজে লাগানো যাবে, কিন্তু ভালোবাসা যাবে না। এ কারণেই সাহাবায়ে কেরামের হৃদয় থেকে দুনিয়া চলে যাওয়ার পর সারা দুনিয়া তাদের গোলামে পরিণত হয়েছে। কিসরা তাদের কদমে আঁছড়ে পড়েছে, কাইজার তাদের পদতলে অবনত হয়েছে। অথচ তারা কিসরা-কাইজারের ধন-সম্পদের প্রতি চোখ তুলেও দেখেননি।

সিরিয়ার গভর্নর হযরত উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা.)

হযরত উমর (রা.) এর খিলাফতকালে সিরিয়ার গভর্নর ছিলেন হযরত উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা.)। সিরিয়ার অধিকাংশ এলাকা তাঁর হাতেই বিজয় হয়েছে। সে যুগের সিরিয়া আর আজকের সিরিয়া এক নয়। বর্তমানের

সিরিয়া, জর্দান, ফিলিস্তিন, লেবানন মিলে পুরাটা ছিল সে যুগের সিরিয়া। এ চারটি দেশ মিলে তখন ইসলামি খিলাফতের একটি প্রদেশ ছিলো। প্রদেশটি খুব উর্বর ছিল। অর্থ-সম্পদের ছড়াছড়ি ছিল। রোমরাজের পছন্দীয় ও লোভনীয় ভূমি ছিল এ সিরিয়ার ভূমি। হযরত উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা.) ছিলেন এ এলাকার গভর্নর। খলীফাতুল মুসলেমীন, হযরত উমর (রা.) মদীনাতে বসে এ বিশাল ইসলামী সাম্রাজ্য পরিচালনা করতেন। একবার তিনি পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে সিরিয়া গমন করলেন। সেই সুবাদে একদিন তিনি আবু উবাইদাহ (রা.)- কে বললেন, 'ভাই আবু উবাইদাহ! আমার মন চায়, আমার ভাইয়ের সেই বাড়িটি একটু দেখি, যেখানে তুমি থাক।'

উমর (রা.) ধারণা করেছিলেন, আবু উবাইদাহকে এত বিশাল প্রদেশের গভর্নর বানানো হয়েছে, তাই তার বাড়িটি দেখা প্রয়োজন। না জানি কত সম্পদ তার বাড়িতে পুঞ্জিভূত আছে।

সিরিয়ার গভর্নরের বসত বাড়ি

হযরত আবু উবাইদাহ বললেন,'আমীরুল মুমেনীন! আপনি আমার বাড়ি দেখে কি করবেন। কারণ, আমার বাড়ি দেখার পর চোখ মোছা ছাড়া আর কিছুই হবে না। তবুও উমর (রা.) পীড়াপিড়ি করলেন। বললেন " আমি দেখতে চাই।" অবশেষে হযরত আবু উবাইদাহ (রা.) আমীরুল মুমেনীনকে নিয়ে চললেন। যেতে যেতে শহরের পথ অতিক্রম করে তারা অনাবাদি ভূমিতে প্রবেশ করলেন। উমর (রা.) বললেন, "ভাই, আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ।" আবু উবাইদাহ উত্তর দিলেন, "এই তো আর সামান্য পথ।" এভাবে তারা পার্থিব প্রাচুর্যে ভরা দামেশক শহর পেছনে ফেলে রেখে এক জনমানবহীন প্রান্তরে গিয়ে পৌঁছলেন। আবু উবাইদাহ (রা.) সেখানে পৌঁছে একটি খেজুর পাতার ঝুপড়ির দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, "আমিরুল মুমেনীন! আমি এ গৃহে বাস করি।" উমর (রা.) খেজুর পাতার ছাউনিটিতে প্রবেশ করে চারদিক চোখ বুলিয়ে দেখতে পেলেন, একটি মাত্র জায়নামায ছাড়া ঘরে আর কোনো কিছু নেই। এ দৃশ্য দেখে হযরত উমর (রা.) বলে উঠলেন, "আবু উবাইদাহ! তুমি কি এখানেই থাক? থাকা-খাওয়ার আসবাবপত্র বলতে কিছুই তো এখানে নেই।

তাহলে তুমি এখানে থাক কিভাবে?"আবু উবাইদাহ উত্তর দিলেন, "আমিরুল মুমেনীন, প্রয়োজনীয় সকল আসবাবপত্র 'আলহামদুলিল্লাহ' এখানেই আছে। এই যে জায়নামাযটি দেখছেন, রাতের বেলা এটাতে দাঁড়িয়ে নামায পড়ি, আর ঘুমের সময় হলে এটার উপরেই শুয়ে পড়ি।" এই বলে তিনি ঝুপড়ির চালের দিকে হাত বাড়িয়ে একটি পাত্র বের করলেন। ঝুপড়ির অভ্যন্তরে অন্ধকারের কারণে পাত্রটি স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিল না। পাত্রটি বের করে বললেন,"আমিরুল মুমেনীন! এই যে আহারের পাত্র"। উমর (রা.) লক্ষ্য করলেন, পাত্রটি পানি দ্বারা ভর্তি। রুটির শুকনো দু'টি টুকরো ভিজিয়ে রাখা রয়েছে। তারপর আবু উবাইদাহ বললেন, "আমিরুল মুমেনীন! দিন-রাত তো রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যস্ত থাকি। তাই পানাহারের আয়োজন করার ফুরসত পাই না। এক মহিলা এক সাথে দু'-তিন দিনের রুটি পাকিয়ে দেয়, আমি সেই রুটিগুলো রেখে দেই আর শুকিয়ে গেলে পানিতে ভিজিয়ে রাখি, যেন রাতে ঘুমোনোর পূর্বে খেয়ে নিতে পারি।" [সিয়ারু আ'লা-মিন নুবালা, খণ্ড ১, পৃ.৭]

মার্কেট ভ্রমণ করি, তবে ক্রেতা নই

এই মর্মভেদী দৃশ্য অবলোকন করে হযরত উমর (রা.) চোখের অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না। আবু উবাইদাহ (রা.) বললেন, "আমিরুল মুমিনীন! আমি তো আগেই বলেছিলাম, আমার বাড়ি দেখলে চোখ নিংড়ানো ছাড়া কিছুই পাওয়া যাবে না।" উমর (রা.) বললেন, "আবু উবাইদাহ! এ পার্থিব জগতের সান্নিধ্য আমাদের সকলের জীবনকে পাল্টে দিয়েছে। কিন্তু আল্লাহর কসম! তুমি ঠিক আগের মতই রয়ে গিয়েছ, যেভাবে ছিল রাসূল (সা.) এর যুগে। এ দুনিয়া তোমাকে প্রভাবিত করতে পারেনি।" প্রকৃতপক্ষে এরাই নিম্নোক্ত চরণটির বাস্তব উপমা।

بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں،

"মার্কেট ভ্রমণ করলেও ক্রেতা নই।"

তামাম দুনিয়া চোখের সামনে উপস্থিত। কমনীয়রূপে তার প্রদর্শনী চলছে প্রতিনিয়ত। তার লাবণ্যতা ও সৌরভ সবই বিদ্যমান। কিন্তু আল্লাহর মহব্বত

হৃদয়ে এমনভাবে পুঞ্জীভূত ছিল যে, দুনিয়ার এসব চাকচিক্য তাদেরকে প্রতারি
করতে পারেনি। হযরত মাযযুব (রহ.) কত সুন্দরভাবে বলেছেন–

جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے
تو مجھ کو بھری بزم میں تنہا نظر آیا

"সূর্য যখন দীপ্তিমান হয়েছে, নক্ষত্ররাজি তখন চুপসে গেছে। তখন পূ
সমাবেশে আমি একাই দৃশ্যমান।"

এরাই হলেন সাহাবায়ে কেরাম, তাদের কদমতলে দুনিয়া আসার পরে
দুনিয়ার মহব্বতকে অন্তরে স্থান দেন নি। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল নবীজি (সা.)
এর দীক্ষা। তিনি দুনিয়ার গুরুত্বহীনতা সাহাবয়ে কেরামকে বারবা
বুঝিয়েছেন। দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী আর আখেরাত চিরস্থায়ী। দুনিয়ার নেয়াম
নিঃশেষিত আর আখেরাতের নিয়ামত অফুরন্ত এবং আখেরাতে শাস্তিও চি
অবধারিত– এ কথাগুলো তিনি বারবার বলেছেন। কুরআন ও হাদীস এজাতী
কথায় ভরপুর।

একদিন মরতেই হবে

একটু ভাবা দরকার, পার্থিব এ জীবন কত দিনের? একদিন, দুই দিন, তি
দিন নাকি কতদিন এ জীবনের মেয়াদ কেউ বলতে পারবে কি? সামনের এ
ঘণ্টা বরং এক মুহূর্তের গ্যারান্টি কারো নিকট আছে কি? মহা বিজ্ঞানী, দার্শনিক
শীর্ষ নেতা কেউ কি বলতে পারবে, এ ইহকালীন জীবন কত দিনের? তবু
মানুষ সম্পদের পাহাড় গড়ার তালে মগ্ন। সকাল-বিকাল, রাত-দিন শুধু দুনিয়া
ধান্ধাতেই ব্যস্ত। অথচ যেদিন ডাক আসবে, সবকিছু ছেড়ে সেদিন সকলকে
চলে যেতে হবে।

পার্থিব জগত প্রতারণার জাল

তাই কুরআন মজীদে বলা হয়েছে–

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُوْرِ (سورة حديد، ٢٠)

"পার্থিব জীবন প্রতারণার ঘর।" তাই এতে আত্ম প্রবঞ্চিত হ
আখেরাতের জীবন সম্পর্কে উদাসীনতা প্রদর্শন করো না। এই কথাটি হৃদ
স্থান দিতে পারলে তুমি যা কিছুই হও না কেন, বাড়ি-গাড়ি, মিল-কারখানা,

ব্যাংক-ব্যালেন্স, অর্থ-সম্পদ যা-ই তোমার কাছে থাকুক না কেন, কিন্তু যেহেতু তুমি এগুলোর সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক করনি, তাই তুমিও একজন যাহিদ। যুহদ এর নেয়ামতে তখন তুমিও ধন্য।

ইমাম গাযযালী (রহ.) বলেছেন, ধ্বংসের অতল গহবরে সবচেয়ে বেশি ওই ব্যক্তি নিমজ্জিত, যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ তেমন একটা উপার্জন করতে পারেনি। সে নিঃস্ব-অসহায়, অথচ তার অন্তর দুনিয়ার ভালোবাসায় পরিপূর্ণ। এমন ব্যক্তি যুহদ থেকে বঞ্চিত। দুনিয়ার ইশক ও মহব্বতে মত্ত থাকার কারণে তাকে 'যাহিদ' বলা যাবে না। সে ধ্বংসপ্রাপ্ত।

'যুহদ' অর্জন হবে কিভাবে?

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, 'যুহদ' অর্জন হয় কিভাবে? যুহদ লাভ করার পদ্ধতি হলো, কুরআন-হাদীসের বাণীসমূহ গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে। মউত এবং আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার মুরাকাবা করতে হবে। আখেরাতের পুরস্কার ও শাস্তি এবং দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ীত্বের কথা গভীরভাবে ভাবতে হবে। এ কাজটি প্রতিদিন ন্যূণতম পাঁচ-দশ মিনিট করে হলেও করতে হবে। এভাবে করলে দুনিয়ার ভালোবাসা অন্তর থেকে ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দুনিয়ার হাকীকত বোঝার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

অর্থ-সম্পদের নামই কি দুনিয়া?

"মাওলানা রুমী (রহ.) বলেছেন : যতক্ষণ পর্যন্ত পার্থিব ধন-সম্পদ মানুষের আশেপাশে থাকবে এবং মানুষের প্রয়োজনে কাজে আসবে তথা পানাহারের কাজে আসবে, উপার্জনের কাজে আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এ দুনিয়া জীবনের জন্য কল্যাণপ্রসূ ও কল্যাণকর এবং আল্লাহর অনুগ্রহ বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু এ পার্থিব ধন-সম্পদ যদি সবকিছু ভেদ করে হৃদয়ের কিশতিতে প্রবেশ করে আর মানুষ যদি সম্পদের মোহে এমনভাবে উঠে-পড়ে লাগে যে, অন্তিমপ্রয়াণ এখন শুধু সম্পদের ভাবনা ছাড়া আর কিছুই নেই, তাহলে বুঝতে হবে কিশতির অন্দরে পানি ঢুকে পড়েছে। এ পানি তার জীবনতরীকে ধ্বংস করেই তবে ক্ষান্ত হবে। তখন এ দুনিয়া তার জন্য বিবেচিত হবে "মাতাউল গুরুর" তথা ধোঁকার উপকরণরূপে। প্রতিভাত হবে তার জন্য ফিতনা তথা পরীক্ষারূপে। অবস্থার এ চিত্র সম্পর্কেই বলা হয়েছে, দুনিয়াটা মৃত লাশ আর তার প্রার্থী হলো কুকুরের ন্যায়। যারা দুনিয়াকে হৃদয়ে স্থান দিয়েছে, তাদের ক্ষেত্রেই এমন কথা প্রযোজ্য।"

অর্থ-সম্পদের নামই কি দুনিয়া?

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا۔ اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَابْتَغِ فِيْ مَا اٰتٰكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْاَرْضِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ (سورة القصص ٧٧) اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ۔ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

মুহতারাম সভাপতি সম্মানিত সুধী!

আপনাদের সামনে যে আয়াতটি তেলাওয়াত করা হল– স্বল্প সময়ের মধ্যে সংক্ষেপে এর কিছু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব।

কুরআনে পাকে ইরশাদ হয়েছে–

"আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন, তা দ্বারা পরকালের গৃহ অনুসন্ধান কর এবং পার্থিব জগত থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না। তুমি অনুগ্রহ কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ করেন না।"[সূরা আল-ক্বাসাস, আয়াত ৭৭]

একটি ভ্রান্ত ধারণা

উল্লিখিত আয়াত তেলাওয়াত করার পেছনে একটি কারণ আছে। তাহলো বর্তমান সমাজে একটি ভ্রান্ত ধারণা ব্যাপকতা লাভ করেছে। এমনকি সমাজের শিক্ষিত শ্রেণীও এ ভ্রান্তির শিকার। কুরআন মজীদের এ আয়াতটিতে সেই ভ্রান্তির নিরসন আছে। আছে চিকিৎসাও। ভ্রান্ত ধারণাটি হলো, বর্তমান বিশ্বে যদি কোনো ব্যক্তি নিজের জীবনকে দ্বীনের আলোয় সজ্জিত করতে চায়, যদি ইসলামের বিধিনিষেধ মোতাবেক নিজেকে চালাতে চায়, তাহলে তাকে দুনিয়া ছাড়তেই হবে। দুনিয়ার সুখ-শান্তি তাকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। দূরে ঠেলে দিতে হবে পার্থিব সহায়-সম্পদ ও স্বপ্ন। আর তখনই সম্ভব হবে দ্বীনের উপর চলার। ইসলামের পথে জীবন যাপন করার, অন্যথায় নয়। এ ভ্রান্ত ধারণার মূল কারণ হলো, পার্থিব জগত সম্পর্কে ইসলামের আসল দৃষ্টিভঙ্গি কি, আমরা তা জানি না। জানি না এই দুনিয়াটা কি? দুনিয়ার ধনসম্পদ ও সুখ-শান্তির তাৎপর্যই বা কি? কতটুকু পর্যন্ত তাকে গ্রহণ করা যাবে? তাকে কতটুকু বর্জন করতে হবে? এসব বিষয় সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্ট নয় বিধায় আমরা ভুল ধারণার শিকার।

কুরআন-হাদীসে দুনিয়ার নিন্দা

এই ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টির এও একটি কারণ যে, আমরা বারবার শুনে থাকি, কুরআন ও হাদীসে দুনিয়া সম্বন্ধে নিন্দা করা হয়েছে। এক হাদীসে এসেছে, নবী করীম (সা.) বলেছেন–

اَلدُّنْيَا جِيْفَةٌ وَطَالِبُوْهَا كِلَابٌ (كشف الخفاء للعجلوني رقم الحديث ١٣١٣)

"দুনিয়া একটি মৃত পশুর মত। আর দুনিয়া প্রার্থীরা হলো কুকুরের ন্যায়।"

যদিও কোনো হাদীসবিশারদ শাব্দিক বিচারে হাদীসটিকে জাল বলেছেন, কিন্তু মর্মার্থের দিক থেকে হাদীসটিকে বিশুদ্ধ বলে মেনে নিয়েছেন। সুতরাং মর্মার্থ দাঁড়ায়, পৃথিবী হলো মৃত প্রাণীর মত। আর তার পেছনে যারা ছুটে বেড়ায় তারা কুকুরের মত। এ মর্মে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে–

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ (سورة الحديد ٢٠)

"পার্থিব জীবন প্রতারণার উপকরণ বৈ কিছু নয়।" [সূরা হাদীদ, আয়াত ২০]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ (سورة التغابن ١٥)

"তোমার ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি কেবল পরীক্ষাস্বরূপ।" [সূরা তাগাবুন, আয়াত ১৫]

একদিকে কুরআন-হাদীসে দুনিয়া সম্পর্কে এ নিন্দা আমরা পাচ্ছি। কুরআন-হাদীসে এ দিকটি দেখে অনেক সময় মনে হয়, প্রকৃত মুসলমান হলে দুনিয়া আমাদেরকে ছাড়তেই হবে।

দুনিয়ার মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য

অন্যদিকে আপনারা হয়তো শুনেছেন, আল্লাহ তা'আলা এ দুনিয়ার প্রশংসাও করেছেন। অর্থ-সম্পদ প্রসঙ্গে বলেছেন, ফাযলুল্লাহ তথা আল্লাহর অনুগ্রহ। ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে বলেছে, ব্যবসার মাধ্যমে আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ কর। যথা সূরা জুম'আর যেখানে জুম'আর নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সেখানে তার পরেই বলা হয়েছে–

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْأَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ (سورة الجمعة ١٠)

"অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ কর।" [সূরা জুম'আ, আয়াত ১০]

এখানে অর্থ-বৈভব, ব্যবসা-বাণিজ্যকে আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া বলে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অনুরূপ পবিত্র কুরআনের কোনো কোনো জায়গায় পার্থিব সম্পদকে 'খায়র' তথা কল্যাণ শব্দে অভিহিত করা হয়েছে। তাছাড়া আমরা সকলেই তো আল্লাহর দরবারে এ দোয়া করি–

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

(سورة البقرة ٢٠١)

"হে প্রভু আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান করুন এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান করুন এবং আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করুন।" [সূরা বাক্বারাহ, আয়াত ২০১]

কুরআন মজীদের এসব বক্তব্য নিয়ে চিন্তা করলে এ দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় যে, একদিকে তো দুনিয়ার নিন্দা করা হচ্ছে, দুনিয়া-প্রার্থীকে তুলনা করা হচ্ছে কুকুরের সাথে, অপরদিকে দুনিয়ার এসব ধন-সম্পদকে বলা হচ্ছে,আল্লাহর অনুগ্রহ, কল্যাণ। তাহলে এখানে কোন দিকটাকে সঠিক বলবো আর কোন দিকটাকে বলবো বেঠিক?

আখেরাতের জন্য দুনিয়া ত্যাগ নিস্প্রয়োজন

মূলত কুরআন-হাদীস সঠিক তরিকায় অধ্যয়ন করলে দুনিয়া সম্পর্কে যে চিত্রটি ভেসে উঠে। তাহলো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) মোটেও চান না মানুষ দুনিয়াকে একেবারে ছেড়ে দিয়ে বসে থাকুক। এটা খৃস্টধর্মের মূলনীতি যে, মানুষ প্রভুর সান্নিধ্য লাভ করতে হলে অবশ্যই ধন-সম্পদ, স্ত্রী-সন্তান, ঘরবাড়ি সবকিছু ত্যাগ করতে হবে। তবেই লাভ করা যাবে আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য। অন্যথায় নয়। পক্ষান্তরে আমাদের রাসূল (সা.) আমাদেরকে যে জীবনের শিক্ষা দিয়েছেন, তার কোথাও বৈরাগ্যবাদ তথা দুনিয়া বর্জনের উল্লেখ নেই। কোথাও এই সবক নেই যে, তোমরা পার্থিব সম্পদ উপার্জন করতে পারবে না, ব্যবসা করতে পারবে না। ঘর-বাড়ি বানাতে পারবো না, স্ত্রী-পরিজনের সাথে রসালাপ করতে পারবে না, একসঙ্গে আহার করতে পারবে না। এসব খবরদারি ইসলামে নেই। হাঁ, ইসলাম একথা অবশ্যই বলেছে, এই দুনিয়া তোমাদের আখেরি মনযিল নয়। মূল লক্ষ্যও নয়। তাই এই দুনিয়াকে কেন্দ্র করে সকল কার্যক্রম হওয়াটা ভুল। দুনিয়াকে ঘিরেই সবকিছু- এ মানসিকতা ভ্রান্ত। ইসলামের বক্তব্য হলো, পৃথিবীটা তৈরি করা হয়েছে এজন্য যে, যেন এখানে বাস করেই তোমরা আখেরাতের জন্য তৈরি হতে পার। আর আখেরাতের জীবনকে মাথায় রেখে দুনিয়াকে তোমরা এমনভাবে গ্রহণ কর, যাতে দুনিয়ার প্রয়োজন মিটে যায় এবং আখেরাতের জীবনও হয় কল্যাণময়।

মৃত্যু সর্বজনস্বীকৃত সত্য

মৃত্যু এক স্পষ্ট বাস্তবতা। একজন নিকৃষ্ট কাফিরও মৃত্যুকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য। প্রত্যেক মানুষকেই একদিন মরতে হবে। এ কথাটি এমন এক বাস্তবতা, যা আজ পর্যন্ত কেউ অস্বীকার করতে পারেনি। এমনকি কোনো নাস্তিকও অস্বীকার করার সাহস করেনি। স্রষ্টাকে অস্বীকার করার ধৃষ্টতা দেখালেও মৃত্যুকে অস্বীকার করার ধৃষ্টতা নাস্তিকরাও দেখাতে পারেনি। চিরদিন

বেঁচে থাকার স্বপ্ন আজ পর্যন্ত কেউ দেখেনি। কে কখন মরবে এটা কারো জানা নেই। মহা বিজ্ঞানী, মহা চিকিৎসক, ধনকুবের এমনকি মহা দার্শনিকও বলতে পারবেন না, কার মৃত্যু কবে হবে।

আখেরাতের জীবনই আসল জীবন

মৃত্যুর পরে কি হয়? আজ পর্যন্ত কোনো বিজ্ঞানী, দার্শনিক এমন কোনো বিদ্যা আবিষ্কার করতে পারেন নি, যার মাধ্যমে মানুষ সরাসরি জানতে পারে মৃত্যুর পরে কী হয়? কি ধরনের অবস্থার মুখোমুখি হয় মৃত মানুষজন? পশ্চিমা জগত আজ এতটুকু মানতে শুরু করেছে যে, মৃত্যুর পর মনে হয় আরেকটি জীবন আছে। কিন্তু মৃত্যুর পরের সে জীবনের অবস্থা, সেখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে কোনো দার্শনিক বিজ্ঞানী আজও কোনো তথ্য দিতে পারেন নি।

একথা যখন সর্বজন স্বীকৃত সত্য যে, মানুষমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হয় এবং যেকোন মুহূর্তে এ মৃত্যু ঘণ্টা বেজে উঠতে পারে। উপরন্তু মৃত্যুর পরের পরিস্থিতিও সরাসরি কেউ জানে না। হ্যাঁ, আমরা একটি কালিমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-এর অর্থই হলো, হযরত মুহাম্মদ (সা.) ওহীর মাধ্যমে যেসব কথা আমাদেরকে জানিয়েছেন তার সব সত্য। এর মধ্যে মিথ্যার কোনো সম্ভাবনা নেই। আর মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, মৃত্যুর পর পরকালের জীবনই তোমাদের প্রকৃত জীবন। বর্তমান জীবনের শেষ মনজিল মৃত্যু। মরণোত্তর জীবনের কোনো শেষ নেই। বরং সে জীবন অনন্ত ও অসীম।

ইসলামের পয়গাম

ইসলামের পয়গাম হচ্ছে, 'তোমরা এ নশ্বর জগতে অবশ্যই থাকবে, অবশ্যই তোমরা পার্থিব এ জগত ভোগ করবে, তার নিয়ামতের স্বাদে স্পন্দিত হবে।' তাই বলে এ নশ্বর পৃথিবীটাই যেন তোমাদের আখেরি মিশন ও আখেরি মনজিল না হয়ে যায়। দুনিয়াটাকে তোমরা চূড়ান্ত টার্গেট মনে করো না।

পার্থিব জগতের একটি অনুপম দৃষ্টান্ত

এ পার্থিব জগতের একটি সুন্দর উপমা দিয়েছেন মাওলানা রুমী (রহ.)। কেউ যদি উপমাটি স্মরণ রাখতে পারে, তাহলে দুনিয়া সম্পর্কে ভ্রান্তির শিকার হবে না। তিনি বলেছেন, 'দুনিয়া হলো পানির মত আর মানুষের উদাহরণ

নৌকার মত। কেউ যদি পানি ছাড়া নৌকা চালাতে চায় তাহলে নৌকা চলবে না। কারণ, নৌকা চালানোর জন্য পানি অপরিহার্য। তেমনিভাবে পার্থিব ধন-সম্পদ ও জীবিকা উপার্জন ব্যতীত মানুষ চলতে পারে না। অতঃপর তিনি বলেন, এই পানি ততক্ষণ পর্যন্ত নৌকা চলতে সহযোগিতা করবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তা নৌকার আশেপাশে থাকবে। কিন্তু এই পানি যদি নৌকার বাইরে অবস্থান করার পরিবর্তে তার ভিতরে ঢুকে পড়ে, তাহলে এ পানিই নৌকা চলার অনুকূল শক্তি হওয়ার পরিবর্তে নৌকাকে ডুবিয়ে নাস্তানাবুদ করে ছাড়বে। মাওলানা রুমী (রহ.) বলেন, ঠিক তেমনি যতক্ষণ পর্যন্ত পার্থিব ধন-সম্পদ মানুষের আশেপাশে থাকবে এবং মানুষের প্রয়োজনে কাজে আসবে তথা পানাহারের কাজে আসবে, উপার্জনের কাজে আসবে। ততক্ষণ পর্যন্ত এ দুনিয়া জীবনের জন্য ফলপ্রসূ ও কল্যাণময় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু যদি এ পার্থিব ধন-সম্পদ সবকিছু ভেদ করে হৃদয়ের কিশতিতে প্রবেশ করে, আর মানুষ যদি সম্পদের মোহে এমনভাবে উঠে-পড়ে লাগে যে, অস্থিমজ্জায় এখন শুধু সম্পদের ভাবনা ছাড়া আর কিছু নেই। তাহলে বুঝতে হবে কিশতির অন্দরে পানি ঢুকে পড়েছে। এ পানি তার জীবন তরীকে ধ্বংস করে তবেই ক্ষান্ত হবে। তখন এ দুনিয়া তার জন্য প্রতিভাত হবে مَتَاعُ الْغُرُوْرِ তথা ধোঁকার উপকরণরূপে বিবেচিত হবে তার জন্য ফিতনা তথা পরীক্ষারূপে। অবস্থার এ চিত্রকেই বলা হয়েছে, দুনিয়া হলো মৃত লাশ আর দুনিয়ার প্রার্থী হলো কুকুরের ন্যায়। যারা দুনিয়াকে হৃদয়ে স্থান দিয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে এমন কথাই প্রযোজ্য। [মিফতাহুল উলূম, মসনবী, মাওলানা রুমী, খণ্ড-২, পৃ-৩৭]

দুনিয়া আখেরাতের একটি সিঁড়ি

প্রকৃতপক্ষে একজন মুসলমানের জন্য পয়গাম হলো, দুনিয়াতে বাস কর, আরাম আয়েশ ভোগ কর, তবে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন কর। যদি দুনিয়াকে এ অর্থে ভোগ কর যে, দুনিয়া হলো পরকালের সিঁড়ি, তাহলে দুনিয়া হবে তোমার জন্য কল্যাণ এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ ও দয়া। কিন্তু যদি এ ভেবে দুনিয়ার মাঝে ডুবে যাও যে, দুনিয়াই আমার সবকিছু, আমার ভোগ-বিলাসের শীর্ষ মঞ্জিল, দুনিয়ার কল্যাণই কল্যাণ, তাহলে যে দুনিয়ার তোমার জন্য সফলতার মাধ্যম হতো সে দুনিয়াই হবে তোমার ধ্বংসের কারণ।

দুনিয়া যখন দ্বীন হয়

এই উভয় প্রকার দৃষ্টিভঙ্গি আপন আপন স্থানে বাস্তব। দুনিয়া ধ্বংসের কারণও হতে পারে, দ্বীনও হতে পারে। যদি দুনিয়ার চেতনা মানুষের অস্থিমজ্জায় ঢুকে যায়, তার নেশায় যদি সারাক্ষণ মত্ত থাকে, তাহলে সে দুনিয়া আস্ত একটি মৃত লাশ আর তার প্রার্থী হবে কুকুর। পক্ষান্তরে যদি দুনিয়াকে ব্যবহার করা হয় আল্লাহর পথে, তাহলে দুনিয়া আর দুনিয়া থাকে না। সে দ্বীন হয়ে যায় এবং সাওয়াব ও প্রতিদানের উপায়স্থল হয়।

কারুনকে উপদেশ

দুনিয়া কিভাবে দ্বীন হয়? এর দিক-নির্দেশনা পবিত্র কুরআনে রয়েছে। আমি শুরুতে পবিত্র কুরআনের যে আয়াতটি তেলাওয়াত করেছি, সেটি সূরা কাসাসের একটি আয়াত। সেখানে কারুনের আলোচনা করা হয়েছে। কারুন মূসা (আ.) এর যামানার একজন ধনকুবের। সেকালে কোষাগারে সম্পদ রাখার জন্য বিশাল বিশাল তালা-চাবির সাহায্য নেয়া হতো। কারুনের কোষাগারের চাবি বহনের জন্য প্রয়োজন হতো নিয়মতান্ত্রিক একটি দলের। কেবল দু'-একজন তার চাবি বহন করতে পারতো না। এত বড় ধনী ছিল সে। পবিত্র কুরআনের যে আয়াতটি কারুনকে উপদেশ দেয়া হয়েছে। সেখানে আল্লাহ তা'আলা একথা বলেন নি যে, 'কারুন' তুমি সব জ্বালিয়ে ধন-সম্পদ থেকে হাত ধুয়ে ফেলো। সমস্ত সম্পদরাজি আগুনে জ্বালিয়ে দাও।' এ জাতীয় উপদেশ তাকে দেয়া হয়নি। বরং তাকে উপদেশ দেয়া হয়েছে–

وَابْتَغِ فِيمَآ اٰتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ

"আল্লাহ তা'আলা তোমাকে যে সম্পদ দিয়েছেন, যে টাকা-পয়সা, সম্মান-প্রসিদ্ধি,বাড়ি-বাহন ও চাকর-নওকর দান করেছেন, তা দিয়ে আখেরাতের কল্যাণ প্রার্থনা কর। আখেরাতের জীবন সাজাও।' সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা তাকে এ ইঙ্গিতও দিয়েছেন যে, মানুষ যতবড় বুদ্ধিমান, অভিজ্ঞ ও চতুরই হোক না কেন, তার সকল সম্পদ মূলত আল্লাহ তা'আলারই দান। কিন্তু কারুন তা মানতে পারেনি। সে বরং দাবি করে বসলো–

إِنَّمَآ أُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ عِنْدِيْ (سورة القصص ٧٨)

"আমার বিদ্যা-বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই আমি এ সম্পদ পেয়েছি।"
[সূরা ক্বাসাস-৭৮]

তার এ অযৌক্তিক দাবির উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তোমাকে যা কিছু দেয়া হয়েছে, এসবই আল্লাহর দান।" অন্যথায় এ পৃথিবীতে কত বুদ্ধিমান পড়ে আছে, বাজারে জুতা ক্ষয় করে চলছে, অথচ তাদেরকে একটি কথা জিজ্ঞেস করার কেউ নেই। আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, একথা মনে রেখো যে, তোমার অর্থ-সম্পদ, টাকা-পয়সা, বাড়ি-ঘোড়া তোমার বুদ্ধির জোরে আসেনি, বরং এসবকিছু তোমাকে আল্লাহ তা'আলাই দান করেছেন।

সমস্ত সম্পদ সদকা করে দেয়া হবে কি?

প্রশ্ন জাগতে পারে, তাহলে কি সমস্ত সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় সদকা করে দিতে হবে? কেউ কেউ এমনই মনে করে যে, সম্পদ আখেরাতের কাজে ব্যয় করার অর্থই হলো, যা কিছু আছে সব আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দেয়া। অথচ পবিত্র কুরআন এ জাতীয় ধারণার বিরোধিতা করছে। ইরশাদ হচ্ছে–

وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

"পার্থিব জগতে তোমার পাওনা ও অধিকার সম্পর্কে ভুলে যেওনা, যতটুকু তোমার পাওনা ততটুকু হাতছাড়া করো না।" তবে সম্পদ ব্যয় করবে এভাবে–

وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ

"আল্লাহ তা'আলা ধন-সম্পদ দান করে তোমার প্রতি যেভাবে অনুগ্রহ করেছেন, তমিও সেভাবে অপরের প্রতি অনুগ্রহশীল হও। অন্যদের সাথে সদাচরণ কর।" অতঃপর ইরশাদ হয়েছে–

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ

"এই সম্পদ দ্বারা জমিনের বুকে ফ্যাসাদ বিস্তার করো না।"

পৃথিবীতে ফ্যাসাদ বিস্তারের কারণ

আল্লাহ তা'আলা যেসব কার্যকলাপ হারাম ও অবৈধ ঘোষণা করেছেন, সেসব কার্যকলাপে মানুষ জড়িয়ে পড়লে পবিত্র কুরআনের ভাষায় তখনই

পৃথিবীতে ফ্যাসাদ ছড়িয়ে পড়ে। সম্পদ উপার্জনের যে পন্থা আল্লাহ তা'আলা অবৈধ ঘোষণা করেছেন, কেউ যদি সেই পন্থায় সম্পদ উপার্জন করতে চায়, তখনই বিস্তার লাভ করবে ফ্যাসাদের। যেমন চুরি করে সম্পদ উপার্জন করা, ডাকাতি করে সম্পদশালী হওয়া হারাম বা অবৈধ। কেউ যদি সম্পদ উপার্জনে এসব পন্থা গ্রহণ করে, তখনই সৃষ্টি হবে ফ্যাসাদ। তেমনিভাবে সুদ, জুয়া, ধোকা, বাটপারির মাধ্যমে কেউ ধনী হতে চাইলে নিশ্চিত ফ্যাসাদ সৃষ্টি হবে। তাই কুরআনের বক্তব্য হলো, সম্পদ উপার্জন কর এতে কোনো বাধা নেই। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, উপার্জনের পদ্ধতি যেন বৈধ হয়। অন্যথায় বিপদ অনিবার্য। ধনী হওয়ার যত বড় সম্ভাবনাই থাকুক, উপার্জন পদ্ধতি যদি হারাম হয় আমাদেরকে তা বর্জন করতে হবে। আর উপার্জন পদ্ধতি বৈধ হলে তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করতে হবে।

অর্থ-কড়ি দিয়ে শান্তি খরিদ করা যায় না

জেনে রাখুন, টাকা-পয়সা নিজে মানুষের কোনো উপকার করতে পারে না। ক্ষুৎপিপাসায় কেউ টাকা পয়সা খায় না। মানুষের জীবনে শান্তির উৎস জনটি। তাহলো, শান্তি আল্লাহ দান করেন। হারাম উপায়ে অর্থ উপার্জন করে যদি ব্যাংক ব্যালেন্স বড় করে ফেল, যদি সম্পদের পাহাড় গড়ে তোল, তাহলেই যে শান্তি আসবে এমনটি জরুরি নয়। বরং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, সম্পদের কুমির হওয়া সত্ত্বেও অব্যাহত অশান্তির তীব্র জ্বালায় ভুগছে। রাতের বেলা ঘুমের অষুধ খাওয়া ছাড়া ঘুমই আসে না। অর্থ-প্রতিপত্তি, টাকা-পয়সা, মিল-ফ্যাক্টরী, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকর নওকর সবই আছে; কিন্তু খাবার সামনে আসলে ক্ষুধা লাগে না। ঘুমোতে গেলে ঘুম আসে না। অন্যদিকে একজন দিনমজুর আট ঘন্টা ডিউটির পর পেট ভরে খায়। রাতের বেলা দিব্যি আরামে ঘুমোয়। এবার আপনারাই বলুন, এই দিনমজুর শান্তিতে আছে, না ওই বিশাল ধনকুবের? মূলত শান্তি আল্লাহ তা'আলার এক বিশেষ দান। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের জন্য একটি নির্দিষ্ট নিয়ম-রেখা টেনে দিয়েছেন, তারা যদি হালাল উপায় সম্পদ উপার্জন করে, তাহলে শান্তি দান করবেন। আর যদি অবৈধ উপায়ে শান্তির পাহাড়ও গড়ে তোলে শান্তির গন্ধও পাবে না।

দুনিয়াকে দ্বীন বানানোর তরিকা

সারকথা হলো, ইসলামের পয়গাম শুধু এটুকুই যে, সম্পদ উপার্জনের ক্ষেত্রে অবৈধ পথ ও পদ্ধতি বর্জন কর। অতঃপর অর্জিত সম্পদের উপর আরোপিত কর্তব্য তথা যাকাত, সদকা, দান-খয়রাত ইত্যাদি যথাযথভাবে আদায় কর। আল্লাহ তোমাদের প্রতি যেভাবে অনুগ্রহ করেছেন, তোমরাও মানবিকতার মাধ্যমে অপরের প্রতি সেভাবে অনুগ্রহ কর। আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞ হও। যেসব ধন সম্পদ আল্লাহ দান করেছেন, তার শুকরিয়া জ্ঞাপন কর।

এভাবে করলে তখন দুনিয়ার সকল অর্থ-সম্পদ ও নেয়ামতই দ্বীন হয়ে যাবে। বিনিময়ে প্রচুর সাওয়াব প্রতিদানও পাওয়া যাবে। তখন পানাহারেও সাওয়াব পাবে, ব্যবসা-বাণিজ্যেও প্রতিদান পাওয়া যাবে। আরাম-আয়েশও তখন সাওয়াবের উপকরণ হবে। শান্তির পায়রা তখন তোমাদের হাতের নাগালে থাকবে। কারণ, যে ব্যক্তি এভাবে দুনিয়াকে গ্রহণ করেছে যে, দুনিয়াকে মূল লক্ষ্যবস্তু বানায়নি; বরং মূল লক্ষ্য অর্জনের একটি মাধ্যম হিসাবে দুনিয়াকে স্রেফ ব্যবহার করেছে। দুনিয়াকে সে ব্যবহার করেছে আখেরাতের জন্য। তাই তো সে হারাম থেকে বেঁচে থেকেছে এবং নিজের উপর আরোপিত দায়িত্ব সঠিকভাবে আদায় করেছে। এভাবে চললেই দুনিয়া রূপান্তরিত হয় দ্বীনে। দুনিয়া তখন হয় 'ফাযলুল্লাহ' তথা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ ও দয়া। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ বিষয়ে সঠিক জ্ঞান দান করুন এবং সেই মোতাবেক চলার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

মিথ্যা এবং বর্তমানে তার ব্যাপক রূপ

"রক্তকনিকা যেভাবে শিরায়-উপশিরায় ছড়িয়ে পড়ে, তেমনিভাবে বর্তমানে মিথ্যাও আমাদের জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়েছে। চলা-ফেরা, উঠা-বসায় দেদারছে মিথ্যা কথা উচ্চারিত হচ্ছে। অনেক সময় কৌতুকচ্ছলেও আমরা মিথ্যা বলছি। মিথ্যা আজ সর্বত্র এত অধিক পরিমাণে বিস্তৃত যে, মানুষ তাকে অবৈধ ও গুনাহই মনে করে না। বরং মানুষের ধারণা এগুলো আমাদের নেকির মাঝে কোনো প্রভাব ফেলবে না।"

মিথ্যা এবং বর্তমানে তার ব্যাপক রূপ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا ـ اَمَّا بَعْدُ!

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ، اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ، وَاِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ـ فِيْ رِوَايَةٍ وَاِنْ صَامَ وَصَلّٰى وَزَعَمَ اَنَّهٗ مُسْلِمٌ ـ

(صحیح بخاری، کتاب الایمان، باب علامات المنافق حدیث نمبر ۳۳)

হামদ ও সালাতের পর!

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেছেন- এমন তিনটি স্বভাব রয়েছে, যা মুনাফিকের আলামত। তথা এ তিনটি স্বভাব কোনো মুসলমানের মাঝে থাকতে পারে না। যদি থাকে, তাহলে বুঝতে হবে সে মুনাফিক। সেই তিনটি স্বভাব হলো, মিথ্যা কথা বলা, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা এবং আমানতের খেয়ানত করা। এক হাদীসে এও বলা হয়েছে, যদিও ওই ব্যক্তি নামায পড়ে, রোযা রাখে এবং যদিও সে নিজেকে মুসলমান দাবি করে। কিন্তু মূলত তাকে মুসলমান হিসেবে অভিহিত করার যোগ্য সে নয়। কারণ, মুসলমান হওয়ার মৌলিক গুণাবলী সে বর্জন করেছে।

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ ধর্ম

আল্লাহই জানেন, আমাদের মাঝে এ ধারণা কোথেকে জেঁকে বসলো যে, ইসলাম কেবল নামায রোযার নাম। নামায পড়লাম, রোযা রাখলাম আর মুসলমান হয়ে গেলাম। মুসলমান হিসেবে অন্য কোনো কর্তব্য আমার উপর নেই। কর্মক্ষেত্রে ইসলামের কোনো তোয়াক্কা নেই। মিথ্যা- ধোঁকা- প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ উপার্জনে ব্যস্ত, হালাল-হারামের কোনো বাছ-বিচার নেই, যবানের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, ওয়াদার কোনো মূল্য নেই, আমানতে খেয়ানত করা হচ্ছে। আর এজন্য উপরোক্ত ভুল ধারনাই দায়ী যে, ইসলাম শুধু নামায-রোযার নাম। তাই নামায রোযাকেই শুধু পরিপূর্ণ ইসলাম মনে করা মারাত্মক ভুল। মহানবী (সা.) বলে দিয়েছেন, এমন ব্যক্তি নামায কিংবা রোযা আদায় করলেও মুসলমান দাবি করার যোগ্য নয়। যদিও তাকে কাফির ফতওয়া দেয়া যাবে না। যেহেতু কাফির ফতওয়া দেয়া খুব কঠিন ব্যাপার। তাই ফতওয়া দিয়ে এমন ব্যক্তিকে ইসলামের চৌহদ্দি থেকে বের করা দেয়া সম্ভব না হলেও সে তার কাজকর্ম কাফির-মুনাফিকের মতো করছে বলে ধরা হবে।

নবী কারীম (সা.) বলেছেন, 'মুনাফিকের আলামত তিনটি। এক. মিথ্যা বলা। দুই. ওয়াদা ভঙ্গ করা। তিন. আমানতের খেয়ানত করা।' এই তিনটি বিষয় নিয়ে একটু সবিস্তারে আলোচনা করার ইচ্ছা রাখি। কারণ, এই তিনটি বিষয় সম্পর্কে সাধারণত মানুষ সঠিক ও ব্যাপক ধারণা রাখে না। অথচ এ তিনটি বিষয় বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে।

আইয়্যামে জাহিলিয়াত ও মিথ্যা

মুনাফিকের নিদর্শনসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম নিদর্শন হলো, মিথ্যা কথা বলা। মিথ্যা কথা এমন জঘন্যতম পাপ, যা সকল সম্প্রদায়ের নিকটেই মহাপাপ হিসেবে চিহ্নিত। এমনকি জাহিলিয়্যাতের যুগের মানুষও মিথ্যা বলাকে মারাত্মক পাপ মনে করতো। যেমন মহানবী (সা.) যখন রোমের বাদশাহর নিকট ইসলামের প্রতি আহ্বান জানিয়ে পত্র প্রেরণ করলেন। তখন রোমের বাদশাহ চিঠি পড়ে তার দরবারস্থ লোকদেরকে বললো, যদি আমার এদেশে এমন কোনো লোক থাকে, যে নবুওয়তের দাবিদার লোকটি সম্পর্কে কিছু জানে, তাহলে তাকে আমার নিকট পাঠিয়ে দিবে, যেন আমি তার কাছে নতুন নবীর অবস্থা জানতে পারি। জানতে পারি তিনি কেমন ব্যক্তি? কী তাঁর পরিচয়?

ঘটনাক্রমে সে সময় হযরত আবু সুফিয়ান (রা.) ব্যবসায়িক কাজে রোমে গিয়েছিল। তিনি তখন পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেন নি। লোকেরা তাকেই বাদশাহের দরবারে নিয়ে গেল। দরবারে পৌঁছার পর বাদশাহ তাকে একের পর এক প্রশ্ন করতে লাগলেন। প্রথমেই প্রশ্ন করলেন, 'নবুওয়াতের দাবিদার লোকটিকে তুমি কি চিন? কোন গোত্রে তাঁর জন্ম? এবং সেই বংশের কদর কেমন? আরবে তার প্রসিদ্ধি কেমন?' আবু সুফিয়ান (রা.) উত্তর দিলেন, 'অভিজাত গোত্রেই তাঁর জন্ম। সমগ্র আরববাসী তাঁর বংশের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে।' বাদশাহ তার জাওয়াবকে সমর্থন জানিয়ে বললেন, 'তুমি ঠিকই বলেছো আল্লাহর নবীরা সম্ভ্রান্ত বংশেই জন্মগ্রহণ করে থাকেন?' অতঃপর বাদশাহ পুনরায় প্রশ্ন করলেন, 'তাঁর অনুসারীগণ সমাজের কোন শ্রেণীর মানুষ- নিম্ন শ্রেণীর সাধারণ মানুষ, না নেতৃস্থানীয় উচ্চশ্রেণীর মানুষ। আবু সুফিয়ান উত্তর দিলেন, 'তার অধিকাংশ অনুসারী সমাজের নিম্নশ্রেণীর।' বাদশাহ এবারও সমর্থন জ্ঞাপন করে বললেন, 'হ্যাঁ, প্রথম পর্যায়ে নবীদের অনুসারীরা সাধারণত নিম্ন শ্রেণীর লোকেরাই হয়ে থাকে।' তারপর বাদশাহ প্রশ্ন করলেন, 'তাঁর সাথে তোমাদের যুদ্ধ হলে তিনি বিজয় লাভ করেন, না তোমরা বিজয়ী হও?" সে সময় পর্যন্ত যেহেতু ইসলাম ও কুফরের মাঝে মাত্র দু'টি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল– বদর যুদ্ধ ওহুদ যুদ্ধ। আর ওহুদ যুদ্ধে মুসলমানরা কিছুটা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল, তাই আবু সুফিয়ান উত্তর দিলেন, কখনো তিনি বিজয়ী হন আবার কখনো আমরা।'

মিথ্যা বলতে পারি না

হযরত আবু সুফিয়ান (রা.) ইসলাম গ্রহণ করার পর বলতেন, সে সময় আমি যেহেতু কাফির ছিলাম, তাই আমার মন চাচ্ছিল আমি এমন কথা বলি, যার ফলে বাদশাহর অন্তরে মহানবী (সা.) এর বিরুদ্ধে কোনো প্রতিক্রিয়া উদ্রেক হয়। কিন্তু বাদশাহর প্রশ্নের উত্তরে এ ধরনের কোনো কথা বলার সুযোগ পেলাম না। কারণ, তাঁর প্রশ্নের উত্তর দেয়া আমার নৈতিক দায়িত্ব থাকলেও আমি তো মিথ্যা বলতে পারি না। ফলে আমার সকল কথাই রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পক্ষেই যাচ্ছিল। মোটকথা, জাহিলিয়্যাত যুগের লোকেরা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে মিথ্যাকে পাপ মনে করতো। ইসলামের ছায়াতলে আসার পরে মিথ্যা বলার তো প্রশ্নই উঠে না। [সহীহ বুখারী শরীফ, হাদীস নং-৭]

মিথ্যা মেডিক্যাল সার্টিফিকেট

দুঃখের বিষয়, বর্তমানে আমরা মিথ্যাচর্চায় ব্যাপকভাবে লিপ্ত। এমনকি যারা হালাল- হারাম, জায়েয- নাজায়েযের প্রতি খেয়াল রেখে শরীয়ত অনুযায়ী চলার চেষ্টা করেন, তারাও অনেক সময় মিথ্যাকে মিথ্যা মনে করেন না। অথচ তা মিথ্যা। মিথ্যার প্রতি এরূপ ধারণা রাখার কারণে তারা ডাবল গুনাহে লিপ্ত হচ্ছে। এক মিথ্যা বলার গুনাহ। দুই, গুনাহকে গুনাহ মনে না করার গুনাহ। আমি এক লোক সম্পর্কে জানি, যিনি নামায-রোযা যিকির-আযকারের খুব গুরুত্ব দেন। অত্যন্ত নেককার। বুযুর্গানে দ্বীনের সাথে ওঠা-বসাও করেন। তিনি সে সময় চাকুরী করতেন বিদেশে। একবার তিনি যখন দেশে আসলেন, আমার সাথে সাক্ষাত করতে আসলেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আবার কবে যাচ্ছেন?' তিনি উত্তর দিলেন, ' দেশে আরো আট-দশদিন থাকবো। অবশ্য আমার ছুটি শেষ হয়ে গেছে, গতকালই আমি অতিরিক্ত ছুটি নেয়ার জন্য একটি মেডিক্যাল সার্টিফিকেট পাঠিয়ে দিয়েছি।' তিনি মেডিক্যাল সার্টিফিকেটের কথা এমনভাবে বললেন, যেন এটা খুবই স্বাভাবিক কথা। এতে চিন্তার কোনো কারণ নেই। আমি বললাম, 'মেডিক্যাল সার্টিফিকেট কেন পাঠালেন?' তিনি উত্তর দিলেন, 'অতিরিক্ত ছুটি নেয়ার জন্য।' যেহেতু বিনা কারণে ছুটি চাইলে ছুটি পেতাম না, তাই একটি মেডিক্যাল সার্টিফিকেট তৈরী করে পাঠিয়ে দিলাম। ওই সার্টিফিকেটের বদৌলতে ছুটি মিলে যাবে। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এই সার্টিফিকেটে আপনি কি লিখলেন?' তিনি বললেন, 'লিখেছি, বিশেষ অসুস্থতার কারণে সফর করা সম্ভব নয়।'

দ্বীন কি শুধু নামায-রোযার নাম?

তাকে বললাম, 'দ্বীনদারী কি কেবল নামায-রোযা আর যিকির-আযকারের নাম? অথচ বুযুর্গানে দ্বীনের সাথে আপনার সম্পর্ক, আর আপনি কিনা এই মিথ্যা সার্টিফিকেট পাঠালেন।' যেহেতু তিনি ভালো মানুষ ছিলেন, তাই বিনাবাক্যে স্বীকার করলেন এবং বললেন, 'আমি এই প্রথম আপনার মুখ থেকে শুনলাম এটা কোনো অন্যায় কাজ।' আমি বললাম, 'তাহলে বলুন মিথ্যা কাকে বলে?' তিনি বললেন, 'কিন্তু অতিরিক্ত ছুটি নেয়ার পন্থা কি?' আমি বললাম, '

যে কয়দিনের ছুটি পাওনা, সে কয়দিনেরই ছুটি নিন। এর চেয়ে অতিরিক্ত ছুটির প্রয়োজন হলে বিনা বেতনের ছুটি ভোগ করুণ। কিন্তু এ মিথ্যা সার্টিফিকেট পাঠানো তো মোটেও জায়েয নেই।'

আজকাল আমাদের ধারণা, বানোয়াট মেডিক্যাল সার্টিফিকেট মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত নয়। আর ধর্ম কেবল নামায-রোযার নাম। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে দেদারসে মিথ্যা বললেও তার প্রতি কোনো তোয়াক্কা নেই।

মিথ্যা সুপারিশ করা

আমি একবার সৌদি আরব সফরকালে জিদ্দায় ছিলাম, তখন একজন শিক্ষিত অভিজাত সচেতন দ্বীনদার মুরব্বীর একখানা সুপারিশমূলক পত্র আমার কাছে পৌছলো। তিনি উক্ত চিঠিতে লিখেছেন, পত্রবাহক ভারতের নাগরিক, এখন পাকিস্তান যেতে চায়। সুতরাং আপনি পাকিস্তান হাই কমিশনে এর জন্য একটু সুপারিশ করে একে একটি পাকিস্তানী পাসপোর্ট বের করে দিন। আপনি শুধু এটুকু বললেই চলবে যে, এ লোক পাকিস্তানের নাগরিক; এখানে অর্থাৎ সৌদি আরবে তার পাসপোর্ট হারিয়ে গেছে। এ ব্যক্তি যেহেতু ব্যক্তিগতভাবে নিজেও পাকিস্তান হাই কমিশনে দরখাস্ত দিয়ে রেখেছে যে, তার পাসপোর্ট হারিয়ে গেছে। কাজেই আপনি একটু সুপারিশ করার সাথে সাথে কাজ হয়ে যাবে।

একটু চিন্তা করে দেখুন, পবিত্র মাটিতে ওমরাহ পালন করা হচ্ছে, হজ্জ আদায় করা হচ্ছে, তাওয়াফ-সায়ী করা হচ্ছে, অথচ এই জালিয়াতি ও ধোঁকাবাজীও চলছে। কেমন যেন এটা দ্বীনের কোনো অংশ নয়। দ্বীন-শরীয়তের সাথে এর কোনো সম্পর্কই নেই। মানুষ মনে করে, যদি ইচ্ছে করে পরিকল্পিতভাবে মিথ্যাকে 'মিথ্যা' মনে করা বলা হয়, তাহলেই তা মিথ্যা হিসেবে বিবেচিত হবে, অন্যথায় নয়। সুতরাং ডাক্তারের মাধ্যেমে মিথ্যা ডাক্তারি সার্টিফিকেট বানিয়ে নেয়া, কারো মাধ্যমে মিথ্যা সুপারিশ করানো অথবা মিথ্যা মামলা দায়ের করা– এগুলো কোনো মিথ্যাই নয়। অথচ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

"যবান থেকে নিসৃত প্রতিটি শব্দ হুবহু তোমাদের আমলনামায় রেকর্ড করা হচ্ছে।"

ছোটদের সাথেও মিথ্যা বলো না

একবার নবী কারীম (সা.) এর সামনে এক মহিলা একটি বাচ্চাকে কোলে নেয়ার চেষ্টা করছিল। কিন্তু বাচ্চাটি কিছুতেই মহিলার কাছে আসছিল না। তাই মহিলা বাচ্চাটিকে কাছে আনার জন্য বলল, বেটা, এদিকে এসো, আমি তোমাকে একটা জিনিস দিবো। রাসূল (সা.) তার একথা শুনে জিজ্ঞেস করলেন, সত্যিই কি তোমার কোনো জিনিস দেয়ার ইচ্ছে আছে, নাকি এমনিই একে কাছে আনার উদ্দেশ্যে বলছো? মহিলা উত্তর করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স্রা.) আমি তাকে খেজুর দেয়ার ইচ্ছে করেছি, সে আমার কাছে আসলে আমি তাকে খেজুর দিবো। রাসূল (সা.) বললেন, 'যদি খেজুর দেয়ার নিয়ত না থাকতো, যদি শুধু তাকে ভুলিয়ে কাছে আনার উদ্দেশ্যে এ কথা বলতে, তাহলে তোমার আমলনামায় একটি মিথ্যা কথা বলার গুনাহ লিখে দেয়া হতো। [আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং-৪৯৯]

উপরোক্ত হাদীস আমাদেরকে এই শিক্ষা দেয় যে, শিশুদের সাথেও মিথ্যা বলা যাবে না এবং শিশুদের সাথেও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা যাবে না। কারণ, এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ তাদের কচি মন থেকে মিথ্যার জঘন্যতা উঠে যাবে। মিথ্যা হয়ে পড়বে তাদের কাছে এক স্বাভাবিক বিষয়।

হাসি বা কৌতুকচ্ছলেও মিথ্যা বলো না

আমরা তো অনেক সময় হাসি-তামাশা কিংবা ঠাট্টা-কৌতুক করার সময়ও মিথ্যা বলে ফেলি। অথচ নবী কারীম (সা.) এরূপ স্থলেও মিথ্যা কথা বলতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, আফসোস, ওই ব্যক্তির জন্য রয়েছে ভয়াবহ শাস্তি, যে কেবল মানুষকে হাসানোর উদ্দেশ্য মিথ্যা কথা বলে। [আবু দাউদ হাদীস নং-৪৯৯০]

নবীজি (সা.) এর কৌতুক

মহানবীও (সা.) মাঝে-মাঝে কৌতুক করতেন, আনন্দদায়ক কথা বলতেন। কিন্তু তিনি কৌতুকের নামে বাস্তবতা বিবর্জিত মিথ্যা কথা বলেননি। তাঁর কৌতুক কেমন ছিল, এ সম্পর্কে হাদীস শরীফে বিভিন্ন ঘটনা বর্ণিত রয়েছে। যেমন– একবার এক বৃদ্ধা মহানবী (সা.) এর খেদমতে এসে আরজ করলো, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.) আমার জন্য দোয়া করুন, আমি যেন জান্নাতে

প্রবেশ করতে পারি। নবীজি (সা.) উত্তর দিলেন, ' কোনো বৃদ্ধা জান্নাতে যাবে না।' একথা শুনে বৃদ্ধা কাঁদতে আরম্ভ করলো। অতঃপর নবী কারীম (সা.) এ কথার ব্যাখ্যা করে বললেন, কোনো মহিলা বৃদ্ধাবস্থায় জান্নাতে যাবে না। বরং সকল মহিলাই যুবতী হয়ে জান্নাতে যাবে।

তাই বলতে চাচ্ছি, নবী কারীম (সা.) এর কৌতুকের মধ্যে বাস্তবতাবিবর্জিত মিথ্যার কোনো কিছু ছিলো না। [শামায়েলে তিরমিযী]

কৌতুকের এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত

এক গ্রাম্য সাহাবী রাসূল (সা.) এর দরবারে এসে দরখাস্ত করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে একটি উট দান করুন। হুযূর (সা.) বললেন, 'আমি তোমাকে বরং একটি উটের বাচ্চুর দিবো?' সাহাবী বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি উটের বাচ্চুর দিয়ে কী করবো। কারণ, আমার তো প্রয়োজন বাহনের উপযুক্ত উট। মহানবী (সা.) বললেন, 'তোমাকে যেকোনো উটই দেয়া হোক না কেন, তা কোনো না কোনো উটের বাচ্চাই তো হবে।'

এটাই ছিলো মহানবী (সা.) এর কৌতুক। তিনি কৌতুকচ্ছলেও কখনো মিথ্যা কথা বলেন নি। কৌতুকের মুহূর্তেও লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন অসতর্কতার কারণে কোনো মিথ্যা কথা বের হয়ে না যায়। আজকাল তো আমাদের সমাজে মিথ্যার উপর রচিত হাজারো গল্প উপন্যাস ছড়িয়ে আছে। আমরা জানি, এগুলোর ভিত্তিই মিথ্যার উপর। তবুও আমরা খোশ-গল্পে এগুলো নির্দ্বিধায় চর্চা করি। এসবই মিথ্যার শামিল। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে হেফাজত করুন। আমীন। [শামায়েলে তিরমিযী]

মিথ্যা চারিত্রিক সার্টিফিকেট

এটা তো বর্তমানে এত ব্যাপক আকারে ধারণ করেছে যে, অনেক দ্বীনদার ও সচেতন লোকও এতে লিপ্ত হয়ে যাচ্ছেন। হয়তো নিজে এ ধরনের মিথ্যা সার্টিফিকেট বের করে অথবা অন্যকে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করে। আর সার্টিফিকেট যিনি দেন, তিনি নির্দ্বিধায় লিখে দেন যে, আমি এ লোকটিকে দীর্ঘ পাঁচ বছর যাবত চিনি। আমার জানামতে এ ব্যক্তি খুব ভালো চরিত্রের অধিকারী। কর্মদক্ষতাও যথেষ্ট রয়েছে ইত্যাদি। অথচ সার্টিফিকেটদাতা এ লোকটিকে জীবনে দেখেছে কিনা সন্দেহ। তবুও সার্টিফিকেটদাতা ও গ্রহীতা

কারো মনে একবারের জন্যও এ কথাটি আসে না যে, তারা একটি অন্যায় কাজ করছে। উপরন্তু সার্টিফিকেটদাতা মনে করে, যেহেতু সে একজন মুসলমানের প্রয়োজন মিটিয়েছে, তাই অনেক বড় নেক কাজ করেছে। এতে অনেক সাওয়াব পাওয়া যাবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, সার্টিফিকেটদাতা যদি ওই লোকটির চরিত্র সম্পর্কে কিছু না জানে, তাহলে তার জন্য এ ধরনের সার্টিফিকেট দেয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে না-জায়েয ও হারাম। অপরদিকে সার্টিফিকেট গ্রহীতার জন্যও জায়েয নেই এমন লোক থেকে সার্টিফিকেট নেয়া, যে তার সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল নয়। মোটকথা, এ ধরনের ক্ষেত্রে উভয়ই গুনাহগার হবে।

কারো চরিত্র সম্পর্কে জানার দু'টি পন্থা

হযরত উমর (রা.) এর নিকট এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে বলল, 'হযরত! সে তো খুবই ভালো মানুষ।' উমর (রা.) বললেন, 'তুমি কিভাবে জানো, সে উন্নত চরিত্রের অধিকারী? তুমি কি তার সাথে লেনদেন করে দেখেছো?' লোকটি উত্তর দিলেন, না, আমি তার সাথে কখনো কোনো লেনদেন করিনি।' অতঃপর হযরত উমর (রা.) প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, তাহলে তুমি তার সাথে কখনো কি সফর করেছো?' সে বলল, 'না, তার সাথে কখনো কোনো সফর করিনি।' তখন হযরত উমর (রা.) বললেন, 'তাহলে তুমি কিভাবে বুঝলে যে, সে ভালো মানুষ। কারণ, মানুষের আখলাক-চরিত্র নির্ণয় করা যায় তখন, যখন তার সাথে কোনো প্রকার লেনদেন করা হয়। লেনদেনে যদি তাকে নিখুঁত পাওয়া যায়, তাহলে সে নিখুঁত। মানুষের চরিত্র নির্ণয়ের অপর আরেকটি পন্থা হলো তার সাথে সফর করা। কারণ, সফরের সময় মানুষ তার বাহ্যিক আবরণ থেকে আসল চেহারা নিয়ে বেরিয়ে আসে। তার স্বভাব- চরিত্র, আচার-আচরণ, আধ্যাত্মিক অবস্থা রুচি ও মন-মানসিকতা, আগ্রহ-অনাগ্রহ সবকিছুই সফরের মাধ্যমে প্রকাশ হয়ে যায়। সুতরাং যদি তুমি লেনদেন ও সফরের অভিজ্ঞতা অর্জন করে থাকো, তাহলে তোমার জন্য এ কথা বলা ঠিক ছিল যে, লোকটি খুবই সৎ মানুষ। কিন্তু তুমি যখন তার সাথে উক্ত দুটি পন্থার কোনো পন্থাই অবলম্বন করোনি, তখন বুঝা গেলো তুমি তার সম্পর্কে কিছুই জানো না। কাজেই তার সম্পর্কে কোনো মন্তব্য না করে তোমার নীরব থাকাই উচিত। না তাকে ভালো বলবে, না মন্দ বলবে। কোনো লোক যদি তার সম্পর্কে তোমার নিকট জানতে চায়, তাহলে তুমি তাকে

ততটুকুই বলো, যা তুমি জানো। যেমন বলতে পারো, আমি তো তাকে মসজিদে নামায পড়তে দেখি, এর চেয়ে বেশি কিছু আমার জানা নেই।

সার্টিফিকেট এক প্রকারের সাক্ষ্য

কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন—

إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

'তবে যারা জেনে-শুনে সত্যের সাক্ষ্য দেয়।'

জেনে রাখুন, এই সার্টিফিকেট শরীয়তের দৃষ্টিতে এক ধরনের সাক্ষ্য। সুতরাং যে ব্যক্তি সার্টিফিকেটে স্বাক্ষর করেছে, সে কার্যত সাক্ষ্য প্রদান করেছে। অথচ, উল্লিখিত আয়াত দ্বারা একথা প্রতীয়মান হয় যে, সাক্ষ্য দেয়া কেবল তখনই জায়েয হবে, যখন সাক্ষ্যদাতা বিষয়টি নিজে প্রত্যক্ষ করে নিশ্চয়তার সাথে বলতে পারবে যে, বাস্তবে ব্যাপারটা এমনই। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ব্যতীত অন্য কেউ সাক্ষ্য দিতে পারবে না। আজকাল তো কারো সম্পর্কে কিছু না জেনেই চারিত্রিক সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। এর দ্বারা কিন্তু মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার গুনাহ হবে। আর মিথ্যা সাক্ষ্য এমন জঘন্যতম গুনাহ যে হুযূর (সা.) একে শিরকের গুনাহের সাথে উল্লেখ করেছেন।

মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান শিরকের সমতুল্য

হাদীস শরীফে এসেছে, নবী কারীম (সা.) একবার হেলান দিয়ে উপবিষ্ট ছিলেন। এমতাবস্থায় সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আমি তোমাদের বলবো কি যে, বড় বড় গুনাহ কী কী? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! অবশ্যই বলুন।' রাসূল (সা.) বললেন, 'বড় বড় গুনাহ হলো আল্লাহ তা'আলার সাথে শরীক স্থাপন করা ও পিতা-মাতার নাফরমানী করা।' একথা বলে হুযূর (সা.) হেলানাবস্থা থেকে সোজা হয়ে বসে পড়লেন এবং বললেন, 'মিথ্যা সাক্ষ্য'— একথাটি তিনবার বলেছেন। [মুসলিম শরীফ, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং-১৪৩]

এবার অনুধাবন করুন মিথ্যা সাক্ষ্যদানের ভয়াবহতা। হুযূর (সা.) একদিকে একে শিরকের সাথে একত্রে উল্লেখ করেছেন, অন্যদিকে কথাটি তিনি তিন তিনবার বলেছেন। প্রথমে তো তিনি হেলান দিয়ে বসে ছিলেন, একথা

বলার সময় সোজা হয়ে বসে গেলেন। পরন্তু স্বয়ং পবিত্র কুরআনেও একে শিরকের সাথে মিলিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। যথা এরশাদ হয়েছে–

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْرِ (سورة الحج ٣)

'তোমরা মূর্তিপূজার অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাকো আর বেঁচে থাকো মিথ্যা বলা থেকে।' এতেই প্রতীয়মান হয় যে,মিথ্যা বলা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া কতবড় ভয়াবহ ব্যাপার।

সার্টিফিকেটদাতা গুনাহগার হবে

মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া মিথ্যা কথা বলার চেয়ে জঘন্যতম অপরাধ। কারণ, এর দ্বারা কয়েকটি গুনাহর সম্মিলন ঘটে। যথা- এক. মিথ্যা কথা বলার গুনাহ। দুই. অন্যকে বিভ্রান্তিতে ফেলার গুনাহ। কারণ, আপনি তো এই বানোয়াট সার্টিফিকেট প্রদানের মাধ্যমে লোকটি সম্পর্কে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেন। এই মিথ্যা সার্টিফিকেট যখন অন্য লোকের হাতে পৌঁছবে, সে ভাববে লোকটি তো ভালো। আর এভাবে তাকে ভালো ও সৎ মনে করে যখন তার সাথে লেনদেন, কাজ কারবারে জড়িয়ে পড়বে, তখন এর দায়দায়িত্ব আপনার কাঁধেও বর্তাবে। অথবা মনে করুন, আপনি আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেন, যার ফলে আপনার মিথ্যা সাক্ষ্যর উপর ভিত্তি করে আদালত কারো বিপক্ষে রায় দিলো। ওই রায়ের ফলে সে যতটুকু ক্ষতির সম্মুখীন হবে, তার সবই আপনার ঘাড়ে আসবে। তাই মনে রাখবেন, এ মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের গুনাহ কোনো সাধারণ গুনাহ নয়।

আদালতে মিথ্যা

আজকাল তো আদালতের অবস্থা এমন হয়েছে, অন্য কোনো জায়গায় কেউ মিথ্যা বলুক বা না বলুক, আদালতে মিথ্যা অবশ্যই বলবে। এমনকি অনেক সময় লোকমুখে এই পর্যন্তও শোনা যায় যে, বলা হয় থাকে, ভাই এখানে সত্য বলতে অসুবিধা কি? এটা তো আদালত নয় যে, মিথ্যা বলতেই হবে। অর্থাৎ মিথ্যা বলার জায়গা হলো যেন আদালত। সেখানে গিয়ে মিথ্যা বলো। এখানে যখন আমরা পরস্পর কথা বলছি, সত্য বলো। অথচ, আদালতে সাক্ষ্য প্রদান মানে শিরকতুল্য গুনাহ। তাছাড়া এটা কয়েকটি গুনাহের সমষ্টিও।

মোটকথা, জেনে-শুনে মিথ্যা সার্টিফিকেট প্রদান করা, ডাক্তারের একজন সুস্থ মানুষকে অসুস্থ বলে মেডিকেল সার্টিফিকেট দিয়ে দেয়া পরীক্ষায় পাশ না

করা সত্ত্বেও কাউকে পাশের সার্টিফিকেট দিয়ে দেয়া। অথবা কারো চরিত্র সম্পর্কে না জেনে কাউকে চারিত্রিক সার্টিফিকেট দিয়ে দেয়া– এসবই মিথ্যার শামিল।

মাদরাসার জন্য সত্যায়নপত্র প্রদান সাক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত

আমার কাছে অনেকে মাদরাসার সত্যায়ন করার জন্য এসে থাকেন। সত্যায়নপত্রে লিখতে হয়, বাস্তবেই মাদরাসাটির অস্তিত্ব আছে, মাদরাসাটিতে এই এই শিক্ষা দেয়া হয়। ছাত্রসংখ্যা এত ইত্যাদি। উক্ত সত্যায়নপত্রের উদ্দেশ্য হলো, মানুষ যেন আশ্বস্ত হয়ে ওই মাদরাসায় দান-খয়রাত করে। এমতাবস্থায় এ সত্যায়নপত্র লিখতে অবশ্য মন চায়। কিন্তু এ ব্যাপারে আমি আমার মুহতারাম আব্বা মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেব (রহ.)- কে দেখেছি, যখন তার নিকট কেউ এ ধরনের সত্যায়নপত্র নিতে আসতো, তখন তিনি এই বলে অপারগতা প্রকাশ করতেন যে, ভাই, এটাও এক ধরনের সাক্ষ্য দেয়া। কাজেই মাদরাসার অবস্থা না জেনে সত্যায়ন লেখা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। কারণ, এই পরিস্থিতিতে এটা মিথ্যা সাক্ষ্যরূপে গণ্য হবে। হ্যাঁ, কোনো মাদরাসা সম্পর্কে যদি তিনি কিছু জানতেন, তাহলে যতটুকু জানা আছে ততটুকু লিখতেন।

বইতে অভিমত লিখা মানে সাক্ষ্য দেয়া

অনেকেই বইয়ের ব্যাপারে অভিমত লিখানোর জন্য এসে বলে, আমি বইটি লিখেছি, আপনি এটিকে সমর্থন জানিয়ে নির্ভরযোগ্য বলে একটি অভিমত লিখে দিন। অথচ, বই আগাগোড়া না পড়ে মন্তব্য প্রকাশ করা কি সম্ভব? যারা মনে করে, আমি দু'কলম লিখে দিলে কি এমন ক্ষতি হবে, তাদের জেনে রাখা আবশ্যক, কোনো বইতে অভিমত লেখার অর্থ হলো ওই বই সম্পর্কে ভালো হওয়ার সাক্ষ্য দেয়া। অথচ, আদ্যোপান্ত না জেনে অভিমত লিখে দেয়াকে মানুষ কোনো অন্যায়ই মনে করে না। বরং অনেকে বলে থাকে; ভাই, সামান্য একটু কাজ নিয়ে অমুকের কাছে গিয়েছিলাম। যদি দু'কলম লিখে দিতেন তার কী এমন ক্ষতি হতো! একটি সার্টিফিকেট লিখে দিলে কী এমন লোকসান হতো? লোকটি বড় অহংকারী।

ভাই, মূলত প্রতিটি শব্দের হিসাব পেশ করতে হবে। যে শব্দটি আমরা উচ্চারণ করছি, যে শব্দটি কলম দ্বারা লিখছি, তার সবকিছুই আল্লাহ তা'আলার

নিকট রেকর্ড হচ্ছে। প্রতিটি শব্দ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে যে, শব্দটি কি বলেছিলে, কেন বলেছিলে, জেনে-বুঝে বলেছিলে নাকি ভুলবশত বলেছিলে?

মিথ্যা হতে বেঁচে থাকুন

বর্তমানে আমাদের সমাজে মিথ্যা ভাইরাসের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। যথেষ্ট ধার্মিক, নামাযী, যিকির আযকারে অভ্যস্ত, বুযুর্গদের সংশ্রবপ্রাপ্ত লোকজনও এ ব্যাধিতে আক্রান্ত। এদের অনেকেই মিথ্যা বলা কিংবা মিথ্যা সার্টিফিকেট প্রদানকে খারাপ মনে করে না। অথচ, উল্লিখিত হাদীসে রাসূল (সা.) মিথ্যাকে মুনাফিকের চিহ্ন হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, যার মধ্যে উক্ত কথাগুলোও অন্তর্ভুক্ত। এ থেকে বেঁচে থাকা এবং সতর্ক থাকাও দ্বীনদারীর অংশবিশেষ। এগুলো দ্বীনের বহির্ভূত মনে করা নিতান্ত পথভ্রষ্টতা বৈ কিছু নয়। তাই এসব বিষয় থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

যেসব ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা যাবে

অবশ্য কিছু কিছু ক্ষেত্র এমনও রয়েছে, যেখানে আল্লাহ তা'আলা মিথ্যা বলার অনুমতি দিয়েছেন। যথা– কারো জীবনে যদি এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে, মিথ্যা ছাড়া প্রাণ বাঁচানো যাবে না অথবা মিথ্যা না বললে এমন কঠিক নির্যাতনের আশংকা রয়েছে যে, তা সহ্য করার মতো নয়। এমনকি মিথ্যা না বললে প্রাণহানিরও সংশয় রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়ত মিথ্যা বলার অনুমতি প্রদান করে। কিন্তু এক্ষেত্রেও শরীয়তের বিধান হলো, কথাকে এভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলতে হবে, যাতে সাময়িক বিপদ দূর হয়। শরীয়তের পরিভাষায় একে 'তা'রীয' বা 'তাওরিয়াহ' বলে। যার অর্থ হলো, এমন শব্দে কথা বলবে, যার বাহ্যিক এক অর্থ; কিন্তু বাস্তবে তার ভিন্ন অর্থ। এমন দুর্বোধ্য শব্দ চয়ন করতে হবে, যাতে মিথ্যা বলার প্রয়োজন না হয়।

আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এর মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকার ঘটনা

হিজরতের সময় যখন হযরত আবু বকর (রা.) রাসূল (সা.) এর সাথে মদীনার উদ্দেশ্য যাত্রা শুরু করেন, তখন মক্কার কাফিরগোষ্ঠি তাদের গ্রেফতার করার উদ্দেশ্যে নিজেদের গুপ্তচর ছড়িয়ে দেয়। সাথে সাথে এ ঘোষণাও দেয়া হয়, যে ব্যক্তি রাসূল (সা.) কে গ্রেফতার করে আনতে সক্ষম হবে, তাকে একশত উট পুরস্কার দেয়া হবে। সে পরিস্থিতিতে মক্কার সকল কাফিরই হুযূর

(সা.)- কে খোঁজ করার কাজে খুবই ব্যস্ত ছিল। পথিমধ্যে আবু বকর সিদ্দিক (রা)- এর পূর্বপরিচিত এমন এক লোকের সাথে সাক্ষাত হলো, যে কেবল হযরত আবু বকর (রা.)- কে চিনতো, হুযূর (সা.)- কে চিনতো না। লোকটি আবু বকর (রা.) কে প্রশ্ন করলো, তোমার সঙ্গীটি কে? সে সময় হযরত আবু বকর (রা.) মনে-প্রাণে চাচ্ছিলেন, রাসূল (সা.) সম্পর্কে কেউ যেন কিছু জানতে না পারে। কারণ, এতে শত্রুপক্ষ টের পেলে বিপদের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। যদি তিনি সত্য কথা বলেন, তাহলে রাসূল (সা.) এর জীবনের উপর হুমকি আসে। অন্যদিকে মিথ্যাও বলতে পারছেন না। এ ধরনের বিপদের সময় স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই পথ বের করে দেন। হযরত আবু বকর (রা.) উত্তরে বললেন–

هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِىْ يَهْدِيْنِى السَّبِيْلَ

অর্থাৎ– ইনি আমার পথ-প্রদর্শক, আমাকে পথ দেখান। হযরত আবু বকর (রা.) এমন এক কথায় উত্তর দিলেন, যা শুনে ওই ব্যক্তি মনে করলো, সাধারণত মরুভূমির সফরকালে লোকেরা যেমনিভাবে পথ দেখানোর জন্য অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শক সাথে রাখে, তদ্রূপ ইনিও ওরকম কোনো পথ প্রদর্শক হবেন। কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) এর অন্তরে ছিলো, ধর্মের পথপ্রদর্শক এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও জান্নাতের পথপ্রদর্শক।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, এমন কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েও হযরত আবু বকর (রা.) মিথ্যাকে সতর্কতার সাথে বর্জন করে এমন শব্দে উত্তর দিলেন, যাতে প্রয়োজনও মিটে গেলো এবং মিথ্যাও বলতে হলো না। [বুখারী শরীফ, হাদীস নং- ৩৯১১]

আসলে যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা এমন পবিত্র অন্তর দান করেছেন, তারা মনে-মনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে যে, জীবনে কখনো বাস্তববিরোধী কথা এবং মিথ্যা বলবো না, আল্লাহ তাদেরকে এ ধরনের বিপদের মুহূর্তে গায়েবী মদদ করেন।

হযরত গাঙ্গুহী (রহ.) এর ঘটনা

হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.)। যিনি ১৮৫৭ সালের ইংরেজবিরোধী আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নেতা ছিলেন। যে আন্দোলনে হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.) এবং হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.) সহ অন্যান্য আকাবিরে দেওবন্দ সর্বাত্মক ভূমিকা রেখেছেন।

পবিত্র এই জিহাদী আন্দোলনে যারা অংশ গ্রহণ করেছিলেন, ইংরেজরা তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানার হুকুম দিয়ে দিলো। রাস্তার মোড়ে মোড়ে ফাঁসির কাষ্ঠ ঝুলানো হলো। প্রতিটি মহল্লায় তথাকথিত আদালত কায়েম করে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হলো। যেখানে যাকেই সন্দেহ হতো, তাকেই ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির করা হতো। আর ম্যাজিস্ট্রেটও বিচারের নামে প্রহসন চালিয়ে নির্দেশ দিয়ে দিতো– একে ফাঁসি দিয়ে দাও। সাথে সাথে তাকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দেয়া হতো। সে সময় মিরাঠের এ জাতীয় এক আদালতে হযরত গাঙ্গুহী (রহ.) এর বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের হলো। তাই তাঁকেও আদালতে হাজির হতে হলো। আদালতে পৌঁছার পর ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনার কাছে কোনো অস্ত্র আছে কি?' (কারণ, তার নামে এ বলেই মামলা করা হয়েছে যে,বন্দুক আছে। আর বাস্তবেও বন্দুক ছিলো)। হযরতকে ম্যাজিস্ট্রেট যখন এ প্রশ্ন করে, তখন তাঁর হাতে ছিলো তাসবীহ। তিনি তাসবীহ উঁচিয়ে ধরে বললেন, এই আমাদের অস্ত্র। তিনি এ কথা বলেননি যে, আমার নিকট অস্ত্র নেই। কারণ, তাহলে তো তা মিথ্যা হয়ে যেতো। হযরতের বলার ঢং এবং তাসবীহ দেখানোর স্টাইল দেখে মনে হচ্ছিল– ইনি একজন দুনিয়াত্যাগী আত্মভোলা সাদাসিধে দরবেশ।

এসব ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দারা বিস্ময়করভাবে মুক্তি লাভ করেন। হযরত গাঙ্গুহী (রহ.) এর প্রশ্নোত্তর চলছিল। ইত্যবসরে এক গ্রাম্য ব্যক্তি সেখানে আসলো এবং হযরতকে দেখেই বলে উঠলো, আরে! একে কোত্থেকে ধরে নিয়ে এসেছো? এতো আমাদের মহল্লার মসজিদের মুয়াজ্জিন। এভাবেই হযরত গাঙ্গুহী (রহ.) মুক্তি পেয়ে গেলেন।

হযরত নানুতুবী (রহ) এর ঘটনা

সে সময় হযরত কাসেম নানুতুবী (রহ.) এর বিরুদ্ধেও ইংরেজরা গ্রেফতারী পরওয়ানা জারী করেছিল। পুলিশ চারিদিকে তাঁকে হন্যে হয়ে খুঁজছিল। এসময় হযরত নানুতুবী (রহ.) দারুল উলূম দেওবন্দ সংলগ্ন ছাত্তাহ মসজিদে অবস্থান করছিলেন। পুলিশ খুঁজতে-খুঁজতে সেখানে চলে গেলো। মসজিদের ভেতর হযরত একাই ছিলেন। যারা হযরত নানুতুবী (রহ.) কে ইতোপূর্বে দেখেনি, তাদের ধারণা ছিলো, এতবড় আলেম, নিশ্চয় তিনি শানদার জুব্বা-কোবা পরিহিত অবস্থায় থাকেন। অথচ, তিনি তো এসব কিছুই পরতেন

না। তিনি সর্বদা একটি সাধারণ লুঙ্গি ও একটি সাধারণ পাঞ্জাবী পরে থাকতেন। পুলিশ মসজিদে ঢুকে হযরত নানুতুবী (রহ.) কে দেখে মনে করলো, এ বোধ হয় কোনো খাদেম হবে। তাই প্রশ্ন করলো, মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম কোথায় আছেন? হযরত নানুতুবী (রহ.) সাথে সাথে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং সেখান থেকেও এক কদম পিছিয়ে গেলেন। আর বললেন, একটু আগেও এখানে ছিল। এ উত্তর দ্বারা তিনি একথা বোঝাতে চাইলেন যে, এখন এখানে নেই। তবুও এ সঙ্গীন মুহূর্তেও যবান থেকে মিথ্যা কথা বের করলেন না। অবশেষে পুলিশ ফিরে চলে গেলো।

আল্লাহর প্রিয় বান্দারা কঠিন বিপদের মুহূর্তে এমনই করেন। তাওরিয়া তথা দুর্বোধ্য কথার আশ্রয় নিয়ে সাময়িক কাজ চালিয়ে যান এবং বিপদ থেকে কেটে উঠেন। তবুও তাঁরা সরাসরি মিথ্যা কথা বলেন না। অবশ্য এই তাওরিয়াও যদি কাজ না হয়, তাহলে শরীয়ত তখন মিথ্যা বলার অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু এই অনুমতিকে প্রয়োজন-অপ্রয়োজন সর্বক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা, যেমনটি বর্তমানে হচ্ছে সম্পূর্ণ হারাম। কারণ, এর দ্বারা মিথ্যা সাক্ষ্যের গুনাহ হয়। আল্লাহ পাক আমাদেরকে হেফাযত করুন। আমীন।

শিশুদের অন্তরে মিথ্যার প্রতি ঘৃণা জাগিয়ে তুলুন

শিশুদের অন্তরে শৈশব থেকেই গুনাহের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করতে হবে। নিজেকেও গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এমনভাবে কথা বলুন, যাতে তাদের কোমলমতি অন্তরে মিথ্যার স্থান না হয়, বরং ঘৃণা জন্মে। সত্যের প্রতি যেন তাদের স্পৃহা জাগে। সত্যের প্রতি ভালোবাসা যেন তাদের হৃদয়ে সৃষ্টি হয়। শিশুদের সামনে মিথ্যা বলা উচিত নয়। কারণ, শিশু যখন দেখবে তার পিতা-মাতা দৈনন্দিন জীবনে মিথ্যা বলছে, তখন তার কচি মনও বলে উঠবে মিথ্যা বলা বুঝি প্রয়োজনেরই একটা অংশ। সত্যবাদিতার গুরুত্ব এবং তার প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধাবোধ তার অন্তরে বুনে দিতে হবে। কারণ, নবুওতের পর শ্রেষ্ঠ মর্যাদা হলো সিদ্দীকের। আর সিদ্দীক মানেই তো সবচেয়ে বড় সত্যবাদী, যার কথার মধ্যে মিথ্যার লেশমাত্র নেই।

কাজের মাধ্যমেও মিথ্যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে

যবান দ্বারা যেমনি মিথ্যা বলা হয়, তেমনি কাজের মাধ্যমেও মিথ্যার প্রকাশ ঘটতে পারে। অনেক সময় কোনো কোনো মানুষের কর্মকাণ্ড হয় বাস্তবতা পরিপন্থী। যেমন নবী কারীম (সা.) বলেছেন–

اَلْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَا لَلَابِسِ ثَوْبَىْ زُوْرٍ

(ابوداؤد, كتاب الأدب، رقم الحديث: ٤٩٩٧)

'কোন ব্যক্তি নিজের কর্মকাণ্ডে যদি নিজেকে এমন অধিকারী রূপে প্রকাশ করে, যাঁ তার মধ্যে নেই, তাহলে সে যেন মিথ্যার পোশাক পরিধানকারী।'

এ হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কেউ যদি নিজের কর্মকাণ্ড দ্বারা এমন কিছু প্রকাশ করতে চায়, যা বাস্তবে তার মধ্যে নেই, তাহলে সে গুনাহগার হবে। যথা কেউ বাস্তবে ধনী নয়, অথচ নিজের কাজ-কর্ম, চলা-ফেরা উঠা-বসা জীবন যাপনের মাধ্যমে সে একথা প্রকাশ করতে চায় যে, সে একজন ধনী, তাহলে এটাও আমলী মিথ্যা। অথবা এর বিপরীতে কোনো ধনাঢ্য লোক যদি তার কাজকর্মে নিজেকে এমনভাবে প্রকাশ করে যে, মনে হয় তার কাছে কিছুই নেই– একান্ত নিঃস্ব, দরিদ্র্য ও অসহায় ব্যক্তি, একেও রাসূলুল্লাহ (সা.) আমলী মিথ্যা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং যে কাজ করলে মানুষের ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়, তাও মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত।

নিজের নামের সাথে সাইয়্যিদ লেখা

অনেকে নিজের নামের সাথে এমন সব পদবী বা উপাধি যোগ করে, যা বাস্তবতা পরিপন্থী। প্রসিদ্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে কোনো প্রকার যাচাই-বাছাই না করে লিখতে শুরু করে। যেমন অনেকেই নিজের নামের সাথে সাইয়্যিদ লিখে। অথচ বাস্তবে সে সাইয়্যিদ নয়। কারণ, সাইয়্যিদ বলা হয় এমন ব্যক্তিকে যে পিতার দিক থেকে হুযূর (সা.) এর বংশধর হয়। কিছু কিছু লোক মায়ের দিক থেকে হুযূর (সা.) এর বংশধর হওয়া সত্ত্বেও নিজের নামের সাথে সাইয়্যিদ লিখে থাকে। এটাও সঠিক নয়। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত সাইয়্যিদ হওয়া সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য সূত্র না পাওয়া যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সাইয়্যিদ লিখা জায়েয হবে না। অবশ্য যাচাই-বাছাইয়ের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, যদি কোনো খান্দান সম্পর্কে লোকমুখে প্রসিদ্ধি থাকে যে, অমুক খান্দান সাইয়্যিদ, তাহলে সাইয়্যিদ

শব্দটি লিখা যাবে। কিন্তু তাহকীক কিংবা প্রসিদ্ধি ব্যতীত যার তার সাথে 'সাইয়্যিদ' শব্দটি যোগ করলে গুনাহগার হবে।

মাওলানা ও প্রফেসর শব্দের ব্যবহার

অনেকে আবার প্রফেসর নয়; অথচ নিজের নামের সাথে প্রফেসর লিখে। এটা মিথ্যা বলার শামিল। কারণ, প্রফেসর একটি বিশেষ পরিভাষিক শব্দ, যা বিশেষ লোকদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমন– আলেম বা মাওলানা শব্দদ্বয় দ্বারা ওই ব্যক্তিকে বুঝায়, যে নিয়মতান্ত্রিকভাবে কোনো উসতাজের কাছে পড়েছে, দরসে নিজামীর সিলেবাস সমাপ্ত করে কোনো মাদরাসা থেকে ফারিগ হয়েছে। অথচ আজ অনেকে নিয়মিত পড়াশুনা না করা সত্ত্বেও এবং মাদরাসা থেকে ফারিগ না হওয়া সত্ত্বেও নিজের নামের সাথে মাওলানা যোগ করে, যা বাস্তবতা পরিপন্থী ও জ্বলন্ত মিথ্যা। অথচ আমরা এগুলোকে মিথ্যাই মনে করি না। এসব বিষয় যে গুনাহর কাজ, তাও মনে করি না। মূলত এসবই মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত এবং ভয়াবহ কবীরা গুনাহ। তাই এগুলো থেকে নিজেকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে মুক্ত রাখতে হবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে এ সকল গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দিন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের প্রচলিত দৃষ্টান্ত

“ওয়াদা খেলাফ তথা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের প্রচলিত এমন অনেক রূপ আছে, যেগুলো আমরা ওয়াদা খেলাফের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে রেখেছি। অথচ, যদি প্রশ্ন করা হয়, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা কেমন? উত্তরে সকলেই বলবে, কবীরা গুনাহ— জঘন্যতম পাপ। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আমরা মারাত্মক এ গুনাহটি থেকে কতটুকু বেঁচে থাকি? প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের এমন কিছু দৃষ্টান্ত বর্তমান সমাজে আছে, যেগুলোকে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গই মনে করি না।”

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের প্রচলিত দৃষ্টান্ত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا ـ اَمَّا بَعْدُ!

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ، اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ، وَاِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَفِيْ رِوَايَةٍ اِنْ صَامَ وَصَلّٰى وَزَعَمَ اَنَّهٗ مُسْلِمٌ

(صحیح بخاری، کتاب الایمان، باب علامات المنافق حدیث نمبر ۳۳)

যথাসম্ভব ওয়াদা রক্ষা করা উচিত

গত জুম'আয় উক্ত হাদীসে বর্ণিত মুনাফিকের তিনটি নিদর্শন হতে একটি অর্থাৎ মিথ্যা (ও বর্তমানে তার প্রচলিত ব্যবহার) সম্পর্কে 'আলহামদুলিল্লাহ' কিছুটা বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত হাদীসে মুনাফিকের দ্বিতীয় নিদর্শন হিসেবে হুযূর (সা.) যেটিকে উল্লেখ করেছেন, তাহলো–

وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ

কাউকে কোনো প্রতিশ্রুতি দিলে রক্ষা করে না। মুমিনের কাজ হলো প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূরণ করা। এক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান হলো, কেউ কারো

সাথে কোনো ওয়াদা করার পর যদি তা পূরণের ক্ষেত্রে মারাত্মক ওজর কিংবা যুক্তিসঙ্গত বড় কোনো বাধা দেখা দেয়, যার ফলে ওয়াদা পূরণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে, তাহলে যার সাথে ওয়াদা করা হয়েছে তাকে জানিয়ে দিতে হবে ...এই সমস্যার কারণে আমি আমার ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে পারছি না; তাই আমি কৃত ওয়াদা বাতিল করছি। যথা কেউ যদি কাউকে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, অমুক তারিখে এক হাজার টাকা দিবো। পরে দেখা গেল,ওয়াদাকারীর নিকট কোনো টাকা নেই, ফুরিয়ে গেছে। এখন সেই পূর্বের পজিশনে আর নেই, যার ফলে তাকে সাহায্য করতে পারে এবং তাকে এক হাজার টাকা দিতে পারে। তাহলে এ অবস্থায় কর্তব্য হলো, প্রতিশ্রুত ব্যক্তিকে জানিয়ে দিবে, আমি তোমাকে যে এক হাজার টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তা আর পারছি না। যেহেতু আমি পূর্বের পজিশনে নেই যে, প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবো। কিন্তু ওয়াদা রক্ষা করার মতো অবস্থা থাকলে এবং শরীয় কোন বাধা না থাকলে ওয়াদা পূরণ একান্ত জরুরী।

বাগদান করা একটি ওয়াদা

যেমন কেউ কারো সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে কথা দিলো। তাহলে এটাও এক প্রকার ওয়াদা। তাই যথাসম্ভব তা রক্ষা করার চেষ্টা করতে হবে। তবে যদি কোনো অসুবিধা দেখা দেয়, যেমন কথা দেয়ার পর জানা গেলো, এমন কোনো সমস্যা আছে, যার ফলে পাত্র-পাত্রীর মাঝে মিল হবে না। তাদের পরস্পরের রুচি ও মেজাজের মাঝে রয়েছে বিস্তর তফাৎ, অথবা এমন কথা জানা গেলো যা পূর্বে জানা ছিল না। এসকল অবস্থায় অপর পক্ষকে জানিয়ে দিতে হবে যে,আপনাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, এখন তা অমুক অসুবিধার কারণে রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো ওজর বা কারণ দেখা না দেবে, ওয়াদা পূরণ করা ওয়াজিব। কোনো ওজর না থাকা সত্ত্বেও যদি ওয়াদা পূরণ না করে, তাহলে উল্লিখিত হাদীসের আলোকে সে মুনাফিকের শামিল হবে।

হযরত হুযাইফা (রা.) ও আবু জাহলের ঘটনা

আল্লাহু আকবার। মহানবী (সা.) এমন কঠিন ওয়াদাও রক্ষা করেছেন, যা আজকাল কল্পনাও করা যায় না। বিখ্যাত সাহাবী হযরত হুযাইফা (রা.), যিনি

রাসূল (সা.) এর গোপন কথা জানতেন। তাঁর ঘটনা বলছি। হযরত হুযাইফা (রা.) ও তাঁর পিতা ইয়ামান (রা.) মুসলমান হওয়ার পর রাসূলে কারীম (সা.) এর খিদমতে মদীনা যাচ্ছিলেন। অন্যদিকে ইসলামের অন্যতম দুশমন আবু জাহল রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার লক্ষ্যে সৈন্যসহ মদীনা যাচ্ছিলো।

পথিমধ্যে আবু জাহলের সাথে হুযাইফা (রা.) এর সাক্ষাৎ হয়ে গেল। আবু জাহল তাদেরকে আটক করে জিজ্ঞেস করলো, কোথায় যাচ্ছো? প্রতি উত্তরে তাঁরা বললেন, আমরা মহানবী (সা.) এর খেদমতে মদীনা শরীফ যাচ্ছি। আবু জাহল একথা শোনামাত্র বলে উঠলো, তাহলে তো তোমাদের ছাড়া যাবে না। কারণ, তোমরা মদীনায় গিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শরীক হবে। তাঁরা বললেন, আমরা মহানবী (সা.)-এর সাথে কেবল সাক্ষাত করবো; আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবো না। আবু জাহল বললো, তাহলে আমাদের সাথে ওয়াদাবদ্ধ হও যে, সেখানে গিয়ে মুহাম্মদ (সা.) এর সাথে শুধু সাক্ষাত করবে, যুদ্ধে শরীক হবে না। তাঁরা আবু জাহলের সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হলেন। আবু জাহল তাঁদেরকে ছেড়ে দিলো। তাঁরা যখন নবী করিম (সা.) এর দরবারে পৌঁছলেন, তখন তিনি সাহাবায়ে কেরামদের নিয়ে বদর অভিমুখে যুদ্ধ করার লক্ষ্যে মদীনা থেকে রওনা হয়ে গিয়েছিলেন। পথে তাঁদের সাথে সাক্ষাত হলো।

সত্য-মিথ্যার প্রথম লড়াই বদর যুদ্ধ

একটু ভেবে দেখুন,হক ও বাতিলের প্রথম লড়াই, ইসলামের প্রথম জিহাদ বদর যুদ্ধ, যা প্রায় আসন্ন, যা এমন এক যুদ্ধ যে, পবিত্র কুরআন তাকে 'ইয়াওমুল ফুরকান তথা হক-বাতিলের পার্থক্যকারী দিন হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। আর এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবীগণ আল্লাহ তা'আলার নিকট বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হয়ে যাচ্ছেন। তাঁদেরকে বদরী সাহাবী হিসেবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। বদরী সাহাবীদের নাম ওযিফা হিসেবেও পাঠ করা হয়। এদের নামের বরকতে আল্লাহ তা'আলা দোয়া কবুল করেন। যাদের সম্পর্কে নবী করিম (সা.) সুসংবাদ দিয়েছেন যে, বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবায়ে কেরামকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিয়েছেন, সেই জিহাদ সংঘটিত হতে যাচ্ছে।

যে ওয়াদা গর্দানের উপর তরবারী রেখে নেয়া হয়েছে

মহানবী (সা.) এর সাথে সাক্ষাতের পর হযরত হুযাইফা (রা.) প্রথমে ঘটনার বিবরণ তুলে ধরলেন। অতঃপর তাঁরা দরখাস্ত পেশ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি বদর যুদ্ধে যাচ্ছেন, আমাদেরও ইচ্ছা আপনার সাথে জিহাদে শরীক হওয়ার। আর আবু জাহলের সাথে যে ওয়াদা করেছি, তা তো সে গর্দানের উপর তরবারী রেখে আমাদের কাছ থেকে আদায় করেছে। তখন যদি আমরা তার কথায় অসম্মতি প্রকাশ করতাম আর ওয়াদাবদ্ধ না হতাম, সে আমাদেরকে আটকে রাখতো। সুতরাং ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদেরকে ইসলামের এই প্রথম জিহাদে অংশ গ্রহণ করার অনুমতি দিন, যাতে আমরাও তার ফযীলত লাভে ধন্য হতে পারি। [আল-ইসাবাহ খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩১৬]

তোমরা যবান দিয়ে এসেছো

কিন্তু উত্তরে মহানবী (সা.) বললেন, তোমরা তাদের সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে কথা দিয়ে এসেছো এবং তোমাদেরকে তারা এ শর্তে মুক্তি দিয়েছে যে, তোমরা এখানে এসে শুধু সাক্ষাত করবে। তোমাদের নবীর সাথে জিহাদে অংশ গ্রহণ করবে না। অতএব, যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার অনুমতি তোমাদেরকে দেয়া যাবে না।

এটা মানব জীবনের এক কঠিনতম পরীক্ষার মুহূর্ত। একজন মানুষ তার ওয়াদার প্রতি কতটুকু যত্নবান, তার পরীক্ষা এমন মুহূর্তে হয়ে থাকে। আমাদের মতো কমজোর মুমিন হলে কত বাহানা খুঁজে বের করা হতো। হয়তো বলতো, তাদের সাথে কৃত ওয়াদা খাঁটি দিলে করিনি। তারা তো আমাদের থেকে জোরপূর্বক ওয়াদা আদায় করেছে। আল্লাহই ভালো জানেন, এভাবে আরো কত টালবাহানা আমরা পেশ করতাম। হয়ত এ বাহানা বের করতাম, রাসূল (সা)-এর সাথে জিহাদে শামিল হয়ে কুফরের মুকাবিলা করাই ছিলো সময়ের দাবি। কারণ, মুসলিম মুজাহিদের সংখ্যা মাত্র ৩১৩জন যাদের অধিকাংশই নিরস্ত্র। সুতরাং সেখানে প্রতিটি মানুষের মূল্য বর্ণনাতীত। যাদের নিকট ছিলো মাত্র ৭০টি উট, ২টি ঘোড়া, আর ৮ খানা তলোয়ার। অবশিষ্টদের কারো হাতে লাঠি, কারো হাতে পাথর ইত্যাদি ছিল। মুজাহিদদের এই ক্ষুদ্র বাহিনী মুকাবিলা করতে যাচ্ছিলো এক হাজার সশস্ত্র যোদ্ধার। তাই জনশক্তির প্রয়োজন ছিলো

প্রকট। তা সত্ত্বেও মহানবী (সা.) বললেন, তাদেরকে প্রদত্ত ওয়াদা ও কথা অবশ্যই রক্ষা করতে হবে, এর খেলাফ করা যাবে না।

জিহাদের উদ্দেশ্য

এ জিহাদ ছিল না কোনো রাজ্য বা ক্ষমতা দখলের জন্য; বরং জিহাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সত্যকে মিথ্যার উপর বিজয়ী করা। এ ক্ষেত্রে যদি সেই সত্যকে উপেক্ষা করে জিহাদ করা হয়, গুনাহে লিপ্ত হয়ে যদি দ্বীনের কাজ করা হয়, তাহলে তা মোটেও দ্বীনের কাজ হিসেবে গণ্য হবে না। আজ আমাদের সকল চেষ্টা ও শ্রম বিফলে যাচ্ছে। তার কারণ হলো, আমরা চাই ইসলামের প্রচার প্রসার ও তাকে প্রতিষ্ঠাকরণ। প্রয়োজনে এর জন্য যত বড় জঘন্যতম গুনাহর কাজ কিংবা হারাম কাজ করা হোক না কেন, তবুও দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। তাই আজ সব সময় আমাদের মাথায় বাহানা ঘুরতে থাকে। অনেক সময় বলে থাকি, এখন সময়ের দাবি মতে কাজ করা প্রয়োজন। তাই শরীয়তের অমুক বিধান আপাতত ছেড়ে দাও। সর্ব প্রথম সময়ের দাবি আদায় করো এবং অমুক কাজটি করো।

একেই বলে ওয়াদা রক্ষা

যেহেতু নবী কারীম (সা.) ও সাহাবায়ে কেরামের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ করা। গনিমত অর্জন কিংবা বীর হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। ইসলামী শরীয়তের বিধান হলো কৃত ওয়াদা পূর্ণ করতে হবে। তাই হযরত হুযাইফা (রা.) ও তাঁর পিতা ইয়ামান (রা.) কে বদরের মতো এত বড় ফযীলতপূর্ণ যুদ্ধ থেকে বঞ্চিত রাখা হলো। কারণ, তারা তো জিহাদে শরীক না হওয়ার ওয়াদা শত্রুবাহিনীর নিকট করে এসেছিলেন। একেই বলে ওয়াদার যথার্থ হেফাজত।

হযরত মু'আবিয়া (রা.) এর ঘটনা

আধুনিক বিশ্বে এরূপ কোনো দৃষ্টান্ত খুঁজে না পাওয়া গেলেও মহানবী (সা.) এর গোলামদের মাঝে এর দৃষ্টান্ত অনেক। যেমন হযরত মু'আবিয়া (রা.) এর ঘটনা। অবশ্য কিছু কিছু লোক অজ্ঞতাবশত এই মহান সাহাবীর সমালোচনা ও তাঁর শানে বেয়াদবি করে নিজের আখেরাতকে বরবাদ করে থাকে। ওয়াদা রক্ষা সম্পর্কে এই মহান সাহাবীর একটি বিরল ঘটনা শুনুন।

যুদ্ধের কৌশল

হযরত মু'আবিয়া (রা.) যেহেতু সিরিয়ায় বাস করতেন, তাই তৎকালীন সুপার পাওয়ার ও পরাশক্তি রোমানদের সাথে তাঁর সর্বদাই যুদ্ধ লেগে থাকতো। একবার হযরত মু'আবিয়া (রা.) রোমানদের সাথে যুদ্ধবিরতির চুক্তি করলেন। একটি তারিখ নির্দিষ্ট করে পরস্পর ওয়াদাবদ্ধ হলেন যে, অমুক তারিখ পর্যন্ত আমরা যুদ্ধ করবো না। যুদ্ধবিরতি চুক্তির সময়সীমা শেষ হওয়ার পূর্বেই হযরত মু'আবিয়া (রা.) চিন্তা করলেন, মেয়াদ তো আপন স্থানে ঠিকই আছে, এ মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই যদি আমি আমার সেনাবাহিনী রোমান সীমান্তে নিয়ে রাখি, তাহলে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই আমি হঠাৎ আক্রমণ করে দিবো। ফলে এতে শত্রুপক্ষ প্রস্তুতি নেয়ার সুযোগ পাবে না। এখানে আসতেও তাদের যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন হবে। এরপর হয়তো মুসলমানগণ আক্রমণ করবে। সুতরাং আমি যদি মুজাহিদ বাহিনীকে পূর্বেই সীমান্তে নিয়ে রাখি, তাহলে সহজেই অল্প সময়ে বিজয় লাভ করতে পারবো।

এটাও চুক্তিভঙ্গ

উক্ত চিন্তা-ভাবনা করে হযরত মু'আবিয়া (রা.) স্বীয় মুজাহিদ বাহিনীকে রোমান সীমান্ত বরাবর নিয়ে গেলেন। কিছু মুজাহিদকে সীমান্তের ভেতর পাঠিয়েও দিলেন, সাথে সাথে মুজাহিদ বাহিনীকে আক্রমণের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত রাখলেন। আর যখনই যুদ্ধবিরতি চুক্তির শেষ দিনের সূর্য অস্ত গেলো, সাথে সাথে মুজাহিদ বাহিনীকে আক্রমণের জন্য সামনে এগুনোর নির্দেশ দিলেন। হযরত মু'আবিয়া (রা.) এর এ কৌশল খুবই সফল প্রমাণিত হলো। কারণ, রোমানদল আকস্মিক এ আক্রমণের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। ফলে হযরত মু'আবিয়া (রা.) এর মুজাহিদ বাহিনী শহরের পর শহর, গ্রামের পর গ্রাম জয় করে বিজয়ের নেশায় এগিয়ে চললো। ইত্যবকাশে হযরত মু'আবিয়া (রা) পেছন দিক থেকে এক ঘোড়সাওয়ারকে দ্রুত সামনের দিকে ছুটে আসতে দেখলেন। তিনি তাকে দেখতে পেয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং ভাবলেন, এ ঘোড়াসওয়ার হয়তো হযরত আমীরুল মুমিনীনের নতুন কোনো পয়গাম নিয়ে আসছে। ঘোড়াসওয়ার যখন হযরত মু'আবিয়া (রা.) এর কাছাকাছি পৌঁছলো, তখন সে উচ্চস্বরে বলতে লাগলো—

اَللّٰهُ اَكْبَرُ قِفُوْا عِبَادَ اللّٰهِ قِفُوْا عِبَادَ اللّٰهِ

অর্থাৎ হে আল্লাহর বান্দাগণ। দাঁড়াও, হে আল্লাহর বান্দাগণ দাঁড়াও। সে যখন আরো নিকটবর্তী হলো তখন মু'আবিয়া (রা.) তাকে চিনতে পারলেন যে, ইনি তো হযরত আমর ইবনে আবাসা (রা.)। হযরত আমীরে মু'আবিয়া (রা.) প্রশ্ন করলেন, কি ব্যাপার? আমর ইবনে আবসা উত্তর করলেন–

وَفَاءٌ لَا غَدَرٌ وَفَاءٌ لَا غَدَرٌ

অর্থাৎ ওয়াদা পূরণ করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য, গাদ্দারী নয়। মু'আবিয়া (রা.) বললেন, আমি তো কোনো চুক্তি ভঙ্গ করিনি। আমি তো যুদ্ধ বিরতি চুক্তির সময়সীমা শেষ হওয়ার পরেই আক্রমণ করেছি। উমর ইবনে আবাসা (রা.) বললেন, যদিও চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর আক্রমণ করা হয়েছে; কিন্তু আপনি তো চুক্তি সময়ের ভেতরই মুজাহিদ বাহিনী রোম সীমান্তে নিয়ে এসেছেন এবং কিছুসংখ্যক মুজাহিদ বাহিনী রোম সীমান্তের ভিতরে ঢুকে পড়েছে, যা যুদ্ধবিরতি চুক্তির লংঘন ছিলো। কারণ, আমি নিজ কানে মহানবী (সা.) কে বলতে শুনেছি–

مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَحِلَّنَّهُ وَلَا يَشُدَّنَّهُ إِلَى أَنْ يَّمْضِيَ أَجَلٌ لَهُ أَوْ يَنْبُذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ (ترمزى، كتاب الجهاد، الحديث ١٥٨)

"অর্থাৎ যখন কোনো জাতির সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হবে, তখন চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে কিংবা প্রকাশ্যে এ ঘোষণার পূর্বে (যে, আমরা চুক্তি ভেঙ্গে দিচ্ছি) চুক্তি লংঘন করতে পারবে না। সুতরাং মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে কিংবা প্রাকাশ্যভাবে চুক্তি খতমের ঘোষণা করার পূর্বে শত্রুসীমান্তে সৈন্য সমাবেশ মহানবী (সা.) এর উল্লিখিত বাণীর ভিত্তিতে জায়েয হয়নি।

বিজিত এলাকা ফেরত দিলেন

এখানে লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হলো, একটি বিজয়ী দল, যারা একের পর এক শত্রু এলাকা বিজয় করে চলেছে, শত্রুদলের বিশাল এলাকা যারা পদানত করেছে, যারা বিজয়ের নেশায় মত্ত, তাদেরকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা

কত বড় বিশাল ব্যাপার। কিন্তু রাসূলের গোলাম, খোদাপ্রেমিক হযরত মু'আবিয়া (রা.) এর কানে যখন একথা পড়লো যে, ওয়াদা পূরণ করা মুসলমানদের উপর ওয়াজিব, তখন সাথে সাথে তিনি মুজাহিদ বাহিনীকে নির্দেশ দিলেন, যতখানি এলাকা বিজিত হয়েছে তার সবটুকুই ফেতর দিয়ে দাও। সুতরাং সাথে সাথে তারা পূর্ণ এলাকা ফেরত দিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্তে ফিরে আসলেন। চুক্তি পূরণ করতে গিয়ে এমন বিরল ঘটনার দৃষ্টান্ত দুনিয়ার মধ্যে অন্য কোনো জাতি পেশ করতে পারবে না। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টি যেহেতু কোনো ভূ-খণ্ডের প্রতি ছিলো না কিংবা কোনো ক্ষমতা বা নেতৃত্বও তাঁদের উদ্দেশ্য ছিলো না, তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ, তাই তাঁরা যখন জানতে পারলেন, ওয়াদা খেলাফ করা জায়েয নেই, আর এ ক্ষেত্রে ওয়াদা খেলাফের কিছুটা সম্ভাবনা আছে, কাজেই তারা বিজিত এলাকা ছেড়ে ফিরে আসলেন। একেই বলে ওয়াদা রক্ষা করা। যবান থেকে কোনো কথা বের হওয়ার সাথে সাথে তার খিলাফ হবে না।

হযরত ফারুকে আ'যম (রা.) এর ঘটনা

ফারুকে আ'যম হযরত উমর (রা.) যখন বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয় করলেন, তখন তিনি সেখানকার খৃষ্টান ও ইয়াহুদিদের সাথে এ চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন যে, আমরা তোমাদের জান-মালের হিফাজত করবো, বিনিময়ে তোমরা আমাদেরকে জিযিয়া প্রদান করবে। চুক্তিমাফিক তারা প্রতি বছর জিযিয়া আদায় হতে লাগলো। একবার মুসলমানদের অন্য শত্রুদের সাথে যুদ্ধ সংঘটিত হলে বাইতুল মুকাদ্দাসের হেফাজতে নিয়োজিত মুজাহিদদেরকে উক্ত যুদ্ধের জন্য পাঠানোর প্রয়োজন দেখা দিল। এক মুসলমান প্রস্তাব করলো, বাইতুল মুকাদ্দাসে যেহেতু অনেক মুজাহিদ আছে, তাই তাদেরকে যুদ্ধের ময়দানে পাঠিয়ে দেয়া হোক। প্রস্তাবটি হযরত ফারুকে আ'যম (রা.) এর মনঃপুত হয়। তিনি তা-ই করলেন। কিন্তু সাথে সাথে এ নির্দেশও জারি করে দিলেন, বাইতুল মুকাদ্দাস এলাকায় বসবাসরত সকল ইয়াহুদি ও খৃষ্টানকে সমবেত করে একথা বলে দাও,আমরা তোমাদের জান-মালের নিরাপত্তার গ্যারান্টি নিয়েছিলাম এবং এর বিনিময়ে তোমাদের থেকে জিযিয়াও আদায় করে আসছিলাম আর এ কাজে এখানে একদল মুজাহিদ নিয়োজিত ছিল। কিন্তু এখন এসব মুজাহিদদের অন্যত্র প্রয়োজন দেখা দেয়ায় তারই তাগিদে তাদেরকে অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হচ্ছে।

তাই আমরা তোমাদের জান-মালের হিফাযতের গ্যারান্টি আর দিতে পারছি না। সুতরাং তোমরা আমাদিগকে জিযিয়া হিসেবে যে ট্যাক্স আদায় করেছো, তা ফেরত দিচ্ছি। তোমরা নিজেদের হিফাযতের ব্যবস্থা নিজেরাই করে নাও। এমনই ছিলো মুসলমানদের ঐতিহ্য ও আদর্শ। অন্য কোনো জাতি এমন বিরল দৃষ্টান্ত পেশ করতে পারবে কি?

ওয়াদা ভঙ্গের প্রচলিত রূপ

নবীজি (সা.) এর ভাষ্যমতে ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা মুনাফিকের লক্ষণ। তাই সকল মুসলমানকেই এ গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা উচিত। গত জুম'আয় মিথ্যার বর্তমান প্রচলিত রূপ সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেছিলাম। যেগুলোকে আমরা মিথ্যার তালিকা থেকে বাদ দিয়ে রেখেছিলাম এবং দেদারসে করে যাচ্ছিলাম। তদ্রূপ ওয়াদা ভঙ্গেরও প্রচলিত এমন অনেক রূপ আছে, যেগুলোকে আমরা ওয়াদা ভঙ্গই মনে করি না। অথচ যদি প্রশ্ন করা হয়, ওয়াদা ভঙ্গ করা কেমন? উত্তরে সকলেই বলবে, কবীরা গুনাহ- জঘন্যতম পাপ। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আমরা এ মারাত্মক গুনাহ থেকে কতটুকু বেঁচে থাকি? ওয়াদা খেলাফের এমন কিছু প্রচলিত রূপ বর্তমান সমাজে আছে, যেগুলোকে আমরা ওয়াদা খেলাফ হিসেবে মোটেও মনে করি না।

দেশের আইন মেনে চলা ওয়াজিব

এ পর্যায়ে আমি এমন একটি কথা বলতে চাই- যা সম্পর্কে আমরা প্রায়শ উদাসীনতার পরিচয় দেই। এমনকি ব্যাপারটিকে ধর্মীয় ব্যাপারও মনে করি না। এজন্য আমার মুহতারাম আব্বা মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেব (রহ.) বলতেন, ওয়াদা কেবল যবানের মাধ্যমেই হয় না, আমলের মাধ্যমেও হয়। যথা কোনো ব্যক্তি কোনো দেশের নাগরিক হিসেবে বসবাস করার অর্থ, সে ওই দেশের সরকারের সাথে এই মর্মে ওয়াদাবদ্ধ যে, আমি আপনার রাষ্ট্রের আইন-কানুন মেনে চলবো। এক্ষেত্রে ওই দেশের আইন-কানুনের পাবন্দি এই ব্যক্তি করতেই হবে এটা তার জন্য ওয়াজিব। অবশ্য ওই দেশের আইন যদি এমন হয় যে, যা মেনে চললে গুনাহগার হতে হবে, তাহলে এক্ষেত্রে মেনে চলা নাজায়েয হবে। কারণ, এই সম্পর্কে নবী কারীম (সা.) এর ইরশাদ হচ্ছে-

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী হবে এমন কাজে কোন সৃষ্টর আনুগত্য জায়েয নেই।'

সুতরাং শরীয়ত পরিপন্থী দেশীয় আইন মেনে চলা ওয়াজিব তো নয়-ই বরং জায়েযও নেই। আর যেসব আইন শরীয়ত পরিপন্থী নয়, সেগুলো এজন্য মেনে চলতে হবে, যেহেতু আপনি রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া মূলত এ ওয়াদায় আবদ্ধ হওয়া যে, আমি রাষ্ট্রের সকল আইন-কানুন মেনে চলবো। তাই এই ওয়াদা পূরণ করতেই হবে। অন্যথায় হাদীসের ভাষ্যমতে মুনাফিকের অন্তর্ভুক্ত হবে।

হযরত মূসা (আ.) ও ফিরাউনের আইন

এ প্রসঙ্গে আমার আব্বাজান হযরত মূসা (আ.) এর ঘটনা শোনাতেন। মূসা (আ.) বাস করতেন ফিরাউনের রাজ্যে। নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে তিনি এক কিবতিকে ঘুষি মেরে হত্যা করেছিলেন। প্রসিদ্ধ এ ঘটনাটি কুরআন মজীদেও উল্লেখ রয়েছে। হযরত মূসা (আ.) ঘটনার জন্য ইসতেগফার করতেন এবং বলতেন–

لَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ

অর্থাৎ আমি তার উপর অন্যায় করে একটি গুনাহ করে ফেলেছি। হযরত মূসা (আ.) বিষয়টিকে অন্যায় ও গুনাহ মনে করে ইসতেগফার করতেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মূসা (আ.) এর হত্যাকৃত লোকটি তো কিবতী সম্প্রদায়ের হরবী। (অর্থাৎ সে অমুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক, যার সাথে কোনো নিরাপত্তা চুক্তি হয়নি) উপরন্তু লোকটি তো কাফির ছিলো। হরবী কাফিরকে হত্যা করলে আবার কিসের গুনাহ? এর উত্তরে আব্বাজান বলতেন, হযরত মূসা (আ.) তাদের শহরে বসবাস করার মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে এই ওয়াদা করেছিলেন যে, আমি তোমাদের দেশের সংবিধান মেনে চলবো। আর তাদের দেশীয় সংবিধানে কাউকে হত্যা করা নিষেধ ছিল। তাই কিবতিকে হত্যা করা আইনের পরিপন্থী কাজ ছিল।

মোটকথা, রাষ্ট্রের সকল নাগরিক মুসলিম হোক বা অমুসলিম হোক; মূলত দেশীয় প্রশাসনের সাথে এ মর্মে ওয়াদাবদ্ধ যে, সে দেশের সকল আইন-নিয়ম মেনে চলবে। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত দেশের আইন শরীয়ত পরিপন্থী না হবে,ততক্ষণ পর্যন্ত তার উপর আইন মেনে চলা ওয়াজিব।

ভিসা একটি ওয়াদা

বিদেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে কোনো রাষ্ট্রের ভিসা নেয়া মানে সেই রাষ্ট্রের সাথে ওয়াদাবদ্ধ হওয়া। এমনকি সেই রাষ্ট্র অমুসলিম হলেও। যেমন অনেকেই ভারত, আমেরিকা বা ইউরোপের ভিসা নিয়ে থাকে। কোনো রাষ্ট্রের ভিসা নেওয়ার অর্থ হলো, সেই রাষ্ট্রের সঙ্গে এ ওয়াদায় আবদ্ধ হওয়া যে, যতক্ষণ পর্যন্ত এ রাষ্ট্রের আইন আল্লাহ তা'আলার কোনো বিধান লংঘন করতে বাধ্য না করে, সেই আইন মেনে চলতে হবে। হ্যাঁ, যে আইন আল্লাহর নাফরমানি করতে বাধ্য করে, সে আইন মান্য করা বৈধ নয়। সুতরাং যে জাতীয় আইন আল্লাহর হুকুমের পরিপন্থী নয়; কিংবা অসহনীয় জুলুমের কারণও নয়, সেই জাতীয় আইন মেনে চলা ওয়াদা পালনের শামিল।

ট্রাফিক আইন মানতে হবে

যথা– দেশের প্রচলিত ট্রাফিক আইনে লালবাতি জ্বললে থেমে যেতে হয়, সবুজবাতি জ্বললে চলতে হয়। গাড়ি কখনো ডানে ঘোরাতে হয়, কখনো বাঁয়ে। দেশের একজন নাগরিক হিসাবে আপনি এই ট্রাফিক আইন মেনে চলতে বাধ্য। যেহেতু এই মর্মে আপনি সরকারের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই কোনো ব্যক্তি ট্রাফিক আইন অমান্য করলে ওয়াদা ভঙ্গ করার গুনাহ করবে। অথচ আজকাল মানুষ ট্রাফিক আইন ভঙ্গ করাকে কোনো গুনাহই মনে করে না। অনেক সময় তো ট্রাফিক আইন অমান্য করে পার পেতে পারলেই নিজেকে চালাক মনে করে।

দুনিয়া ও আখেরাতে জবাবদিহি করতে হবে

দেখুন, ট্রাফিক আইন লংঘন করা কয়েকটি গুনাহ। প্রথমত ওয়াদা ভঙ্গের গুনাহ, দ্বিতীয়ত ট্রাফিক আইন দ্বারা উদ্দেশ্য হয়, সুষ্ঠু ও সুশৃংখল নাগরিক জীবনের বাস্তবায়নে সহযোগিতা করা, যাতে সাধারণ নাগরিক অযথা কষ্টের শিকার না হতে হয়। কাজেই ট্রাফিক আইন লংঘনের কারণে যদি কাউকে কষ্ট দেয়া হয়, তাহলে দুনিয়া ও আখেরাতে তাকে দায়ী থাকতে হবে।

এটাও দ্বীনের বিধান

এসব কথা বলছি এজন্য যে, সাধারণত মানুষ এগুলোকে নিছক দুনিয়াবি কথাবার্তা মনে করে এবং এগুলো মেনে চলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না।

মনে রাখবেন, এটাও মহান আল্লাহর দ্বীনের অংশ, যা আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজন। দ্বীনদারী শুধু নির্দিষ্ট কিছু আনুষ্ঠানিকতার নাম নয়। মোটকথা, যেসব আইন গুনাহর প্রতি অপরিহার্যভাবে ধাবিত করে, সেই আইন মেনে চলা জায়েয নয়। আর যে জাতীয় আইন নির্মম কষ্টের কারণ হয়, তাও মানা জরুরি নয়। হ্যাঁ, যে জাতীয় আইন এ ধরনের নয়, সেগুলো আমাদেরকে অবশ্যই মেনে চলতে হবে। এমনও বহু কাজ আছে যেগুলোর সঙ্গে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা জড়িত। অথচ আমরা অন্যায় কিংবা গুনাহ মনে করি না; বরং আমরা হরদম এ জাতীয় কাজের মাধ্যমে গুনাহের জালে আটকে পড়ি। এ জাতীয় বিষয় থেকে সতর্কতার সাথে বেঁচে থাকা আবশ্যক। আমাদের জীবনে প্রতিমুহূর্ত ও ক্ষেত্রের জন্য শরীয়তের বিধান আছে। তাই সর্বক্ষেত্রে দ্বীনের প্রতি লক্ষ্য না রাখা দ্বীনদারি কিংবা ধর্মের পরিপন্থী।

মুনাফিকের দুটি আলামত সম্বন্ধে আলোকপাত করা হলো। তৃতীয় আলামত হলো– আমানতের খেয়ানত করা। তার গুরুত্ব ও ফযিলত অপরিসীম।
খেয়ানতের ব্যাপারেও আমরা উদাসীনতা ও ভুল ধারণার শিকার। যেহেতু বহু কাজ এমনও আছে, যা মূলত খেয়ানত। অথচ আমরা খেয়ানত মনে করি না। সময়ের স্বল্পতার কারণে পরবর্তীতে অর্থাৎ আগামী জুম'আয় এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হবে- ইনশাআল্লাহ।

যে কথাগুলো আমরা এখানে আলোচনা করলাম। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে আমল করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

اٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

খিয়ানত ও তার প্রচলিত রূপ

"মানুষের নিকট সবচে' বড় আমানত যা থেকে কেউই মুক্ত নয়,তার অস্তিত্ব, তার জীবন, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, তার সময় ও সামর্থ। মানুষ মনে করে তার হাত-পা, চোখ-কান, যবান প্রভৃতির মালিক সে নিজেই। এ ধারণা সঠিক নয়। বরং এসব কিছু আমাদের নিকট আমানত। আল্লাহ তা'আলা এগুলো আমাদেরকে ব্যবহারের জন্য দান করেছেন। আমরা এগুলোর মালিক নই যে, যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করবো। তাই এই আমানতের দাবি হলো, নিজের জীবন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, যোগ্যতা, শক্তি সামর্থ প্রভৃতিকে ওই কাজেই লাগাতে হবে, যে কাজের জন্য এগুলো আমাদেরকে দেয়া হয়েছে। এছাড়া অন্য কাজে ব্যবহার করলে তখন আমানতের খেয়ানত হবে।"

খিয়ানত ও তার প্রচলিত রূপ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا - اَمَّا بَعْدُ!

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَفِىْ رِوَايَةٍ اِنْ صَامَ وَصَلّٰى وَزَعَمَ اَنَّهٗ مُسْلِمٌ

(صحیح بخاری، کتاب الایمان، باب علامات المنافق حدیث نمبر ۳۳)

হামদ ও সালাতের পর

উপরিউক্ত হাদীসে রাসূল (সা.) মুনাফিকের তিনটি আলামতের বিবরণ দিয়ে ইঙ্গিত করেছেন যে, এ তিনটি কাজ কোনো ঈমানদারের হতে পারে না। তাই এ তিনটি চরিত্র যার মধ্যে পাওয়া যাবে, তাকে সত্যিকার অর্থে মুমিন ও মুসলমান বলা যাবে না। (বিধানমতে বাহ্যত যদিও সে মুমিন কিংবা মুসলমানই থেকে যায়)। দুটি আলামতের কথা বিগত দু'জুমআয় সবিস্তারে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা আমল করার তাওফিক দান করুণ. আমীন।

আমানতের গুরুত্ব

মুনাফিকের তৃতীয় নিদর্শন হলো, আমানতে খেয়ানত করা। অর্থাৎ খেয়ানত করা কোনো মুসলমানের কাজ নয়; বরং মুনাফিকের কাজ। কুরআন মজীদের বহু আয়াতে এবং বহু হাদীস শরীফে আমানত রক্ষা ও তার দাবি পূরণের প্রতি জোর তাগিদ দেয়া হয়েছে। যথা- কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

'আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যাবতীয় আমানত তার যোগ্য প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দেয়ার।'

আমানতের গুরুত্ব এত বেশি যে, এক হাদীসে নবী কারীম (সা.) বলেছেন-

لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ (مسند احمد۔ جلد ۳ ص ۱۳۵)

যার মধ্যে আমানত নেই, তার মধ্যে ঈমান নেই।' ঈমানের অপরিহার্য দাবি হলো, ঈমানদার লোক 'আমীন' তথা বিশ্বস্ত হবেন। তিনি কারো আমানতের খিয়ানত কোনোভাবেই করবেন না।

আমানত সম্বন্ধে ভুল ধারণা

আজকের মজলিসে যে কথার প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই, তাহলো আমরা আমানতের সীমারেখাকে খুবই সংকীর্ণ করে ফেলেছি। আমাদের ধারণামতে কেউ যদি আমার নিকট এসে বলে, টাকার এ থলিটি আপনার নিকট আমানত রাখলাম। প্রয়োজন হলে তখন নিয়ে যাবো। কেবল এটাই আমানত। তাই এখানে খেয়ানত করলে, সকল টাকা লুটপুটে খেয়ে ফেললে কিংবা টাকা ফেরত চাওয়ার পর আমানত গ্রহীতা অস্বীকার করলে, তাহলে আমরা একেই মনে করি খেয়ানত। আমানত খিয়ানত সম্পর্কে আমাদের মস্তিষ্কে এর চেয়ে বেশি কিছু নেই। হ্যাঁ, এটাও অবশ্যই 'আমানতে খেয়ানত'। কিন্তু কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় আমানত কেবল এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং আমানতের মর্মার্থ আরো ব্যাপক ও বিস্তৃত। এমন অনেক বিষয় রয়েছে, যা আমানতের শামিল; অথচ আমরা তা জানি না। সেগুলোর সঙ্গে আমানতের মতোই আচরণ করতে হবে।

আমানতের অর্থ

আমানত আরবী শব্দ, যার অর্থ হলো কারো উপর কোনো বিষয়ে ভরসা করা। সুতরাং প্রত্যেক ওই জিনিস, যা অন্যের নিকট এ মর্মে সোপর্দ করা হয় যে, সোপর্দকারী তার উপর এই ভরসা করে যে, সে এর হক পূর্ণরূপে আদায় করবে– একেই ইসলামী শরীয়তে বলা হয় আমানত। অতএব, কেউ যদি কোনো কাজ, জিনিস কিংবা অর্থকড়ি কারো নিকট এই ভরসাসহ সোপর্দ করে যে, সে সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে স্বীয় দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে আদায় করবে, এতে কোনো প্রকার গাফলতি করবে না– তাহলে এটাকেও আমানত বলা হবে। এভাবে আমানতের ব্যাপক অর্থ যদি আমরা অনুধাবন করি, তাহলে অনেক জিনিস এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

'আলাছতু' দিবসের প্রতিশ্রুতি

আল্লাহ তা'আলা 'আলাছতু' দিবসে মানবজাতি থেকে এ মর্মে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন যে, আমি তোমাদের প্রভু নই কি? তোমরা কি আমার আনুগত্য করবে না? মানবজাতির প্রতিটি সদস্যই সেদিন স্বীকার করেছিল যে, আপনি অবশ্যই আমাদের প্রভু, নিঃসন্দেহে আমরা আপনার আনুগত্য করবো। এ অঙ্গীকারকে কুরআন মজীদের সূরায়ে আহযাবের শেষ রুকুতে (আয়াত নং-৭২) আমানত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا

আমি আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে আমানত পেশ করেছিলাম। অতঃপর তারা এই আমানতের বোঝা বহন করতে অস্বীকার করলো, সকলেই এ আমানত বহন করতে ভয় পেয়েছে। কিন্তু যখন মানবজাতির সামনে এই আমানত পেশ করা হলো, তখন তারা বীরের মত অগ্রসর হয়ে এই বোঝা বহন করার স্বীকৃতি জানাল। যার কারণে আল্লাহ বলেন, মানুষ অত্যন্ত জালিম ও অজ্ঞ যে, এত বিশাল কঠিন বোঝা গ্রহণ করতে এগিয়ে আসলো। অথচ একটুও ভাবলো না যে, এ বোঝা বহনে ব্যর্থতার পরিচয় দিলে পরিণাম নাজুক ও ভয়াবহ হয়ে যায় কিনা।

মোটকথা, দায়িত্বের এ বোঝাকে আল্লাহ তা'আলা আমানত বলে আখ্যায়িত করলেন।

আমাদের এ জীবন আমানত

কী সেই আমানত, যা মানুষের নিকট পেশ করা হয়েছে, এ প্রসঙ্গে কুরআন মজীদের তাফসীরকারগণ লিখেছেন, মানবজাতিকে বলা হয়েছিল, তোমাদের এমন এক জীবন দান করা হবে যে জীবনে ভালো কাজ করার স্বাধীনতা থাকবে, মন্দ কাজ করারও স্বাধীনতা থাকবে। যখন তোমরা সৎ কাজ করবে, আমার সন্তুষ্টি অর্জন করে চিরস্থায়ী জান্নাত লাভ করবে। আর অসৎ কাজ করলে আমার গজবের শিকার হবে এবং দোযখের চিরস্থায়ী আযাব তোমাদের ভোগ করতে হবে। এবার বলো, আমার এ প্রস্তাবে তোমরা সম্মত কিনা? দেখা গেল এ জাতীয় প্রস্তাব শুনে আল্লাহর অন্যান্য সৃষ্ট তো ভয় পেয়ে অস্বীকৃতি জানালো। কিন্তু মানবজাতি এ বোঝা বহন করতে প্রস্তুত হয়ে গেল। হাফিয সিরাজী নিম্নোক্ত পংক্তিতে এ কথাই বলেছেন—

آسمان بار امانت نتوانند کشید ☆ قرعہ فال بنام من دیوانہ زد

আসমান তো পারলো না এ বোঝা বহন করতে; তাই সে অস্বীকার করলো যে, এটা আমার সাধ্যের বাইরে। কিন্তু মাটির মানুষ এ বোঝা বহন করায় আমার নামে তা এসে গেল।

সারকথা পবিত্র কুরআনের আলোকে আমাদের জীবনও এক প্রকার আমানত।

মানবদেহ একটি আমানত

আমাদের গোটা জীবনটাই আমাদের নিকট আমানত। এ আমানতের দাবি হলো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) এর বিধিবিধানমাফিক আমাদের জীবন পরিচালিত করা। মানুষের নিকট সবচেয়ে বড় আমানত, যা থেকে কেউই মুক্ত নয়, তার অস্তিত্ব, তার জীবন, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার সময় ও তার শক্তি সামর্থ্য। মানুষ মনে করে— তার হাত-পা, চোখ-কান প্রভৃতির মালিক সে নিজেই। এ ধারণা সঠিক নয়; বরং আমাদের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আমাদের নিকট আমানত। আমরা এগুলোর মালিক নই যে, যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করবো। এগুলো নিয়ামত হিসেবে আল্লাহ তা'আলা আমাদের নিকট আমানত

রেখেছেন। তাই এর দাবি হল, নিজের জীবন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যোগ্যতা, শক্তি-সামর্থ প্রভৃতিকে ওই কাজেই লাগাতে হবে, যে কাজের জন্য এগুলো আমাদেরকে দেয়া হয়েছে। এছাড়া অন্য কাজে ব্যবহার করলে আমানতের খেয়ানত হবে, যা সম্পূর্ণরূপে হারাম।

চোখ একটি আমানত

তদ্রূপ চোখও আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত একটি নেয়ামত। এ এমন এক অতুলনীয় নেয়ামত, যার বিনিময়ে সকল সম্পদ ব্যয় করলেও হুবহু তা পাওয়া যায় না। এ মহান নেয়ামতটি আমাদের নিকট অবহেলিত। কারণ, জন্মের পর থেকে এ মেশিনটি আমাদের সাথেই আছে এবং নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তাকে অর্জন করার জন্য আমাদেরকে কোনো টাকা-পয়সা খরচ করতে হয়নি। কিন্তু দৃষ্টিশক্তিতে কোনো গোলমাল দেখা দিলে কিংবা দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে যাবার কোনো শংকা দেখা দিলে তখনই বোঝা যায় তার মূল্য। এ সময় মানুষ একটি চোখের দৃষ্টি সচল রাখার জন্য প্রয়োজনে নিজের সকল সহায়-সম্বল ব্যয় করতেও প্রস্তুত। এ চোখ আল্লাহপ্রদত্ত এমন এক মেশিন, যা কোনো সময় সার্ভিসিং করারও প্রয়োজন হয় না। তার কোনো মাসিক খরচও নেই, ট্যাক্সও নেই। শুধুই বিনা পয়সায় পাওয়া যাচ্ছে।

তবে এই মেশিন আমাদের নিকট আল্লাহ প্রদত্ত একটি আমানত। তিনি বলে দিয়েছেন তার ব্যবহার পদ্ধতি কী হবে। এ চোখ দিয়ে বিশ্বকে দেখ, পৃথিবীর সৌন্দর্য অবগাহন কর– সবকিছু কর। কিন্তু নির্দিষ্ট কয়েকটি ক্ষেত্রে এ চোখ ব্যবহার করো না। সুতরাং এ সহজলভ্য মহান নেয়ামতকে সকল ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। যথা– এ চোখ দিয়ে পরনারীর (গাইরে মাহরাম) প্রতি তাকানো যাবে না। কারণ, আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন। তাই পরনারীর প্রতি তাকালে আল্লাহর দেয়া আমানতের খেয়ানত হবে। এজন্য কুরআন মজীদেও পরনারীর প্রতি তাকানোকে খেয়ানত বলা হয়েছে। যথা বলা হয়েছে–

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ (سورة غافر ـ ١٩)

অর্থাৎ চোখের খেয়ানত সম্পর্কেও আল্লাহ তা'আলা জানেন যে, তুমি চোখকে তাঁর নিষিদ্ধ ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছো। এর দৃষ্টান্ত এভাবে দেয়া যেতে পারে যে, কেউ কারো নিকট সম্পদ আমানত রাখল এখন এ আমানতের গ্রহীতা মালিকের অনুমতি কিংবা উপস্থিতি ছাড়াই আড়ালে-আবডালে এ সম্পদ ব্যবহার

করে। ঠিক এরূপ আচরণ আল্লাহর দেয়া নেয়ামতের সাথেও করে, অথচ এ নির্বোধ কি জানে না, আল্লাহর নিকট বান্দার কোনো আমলই গোপন নয়। এ কারণেই চোখের খিয়ানত এক মারাত্মক গুনাহ। কুরআন মজীদে ও হাদীস শরীফে এ সম্পর্কে বহু সতর্কবাণী এসেছে।

যদি আল্লাহপ্রদত্ত এই নেয়ামত ও আমানত তথা চোখকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়, তাহলে তার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়। হাদীস শরীফে এসেছে, কোনো ব্যক্তি যদি ঘরে এসে স্বীয় স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসার নয়নে তাকায় এবং স্ত্রীও স্বামীর দিকে একইভাবে তাকায়, তাহলে আল্লাহ তা'আলার উভয়ের দিকে নিজ রহমতের দৃষ্টিতে তাকান। যেহেতু এ ব্যক্তি আমানতকে সঠিক স্থানে সঠিকভাবে ব্যবহার করেছে। যদিও সে ব্যক্তিগত তৃপ্তি, প্রশান্তি ও কার্য হাসিলের জন্য কাজটি করে থাকে। তবুও সে তো আল্লাহ তা'আলার হুকুম অনুযায়ী কাজটি করেছে। তাই তাঁর উপর রহমত নাযিল হয়।

কান একটি আমানত

শোনার জন্য আল্লাহ তা'আলা কান দান করেছেন। নির্দিষ্ট কিছু জিনিস ছাড়া সব কিছুই শোনা যাবে এ কান দিয়ে। যথা আল্লাহ তা'আলা এ কান দ্বারা গান, বাদ্য, গীবত, মিথ্যা ও ভ্রান্ত কথা শুনতে নিষেধ করেছেন। তাই এসব নিষিদ্ধ ক্ষেত্রে ব্যবহার করলেও তাও খেয়ানতের অন্তর্ভুক্ত হবে, যা মারাত্মক গুনাহ।

যবান একটি আমানত

যবান আল্লাহপ্রদত্ত এমন এক অনন্য নেয়ামত, যা জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত চলে। মানুষ যবানকে সামান্য হেলিয়ে কত কাজ নিচ্ছে। যবান আল্লাহ তা'আলার এত বড় নেয়ামত যে, সামান্য হেলিয়ে একবার 'সুবহানাল্লাহ' কিংবা 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে দাও, তাহলে হাদীস শরীফে এসেছে, আ'মলের অর্ধেক পাল্লা পূর্ণ হয়ে যাবে। তাই এ যবানকে মূল্যায়ন করে আখেরাতের সঞ্চয় করা উচিত। কিন্তু যদি এই যবানকেই গীবতের কাজে, মিথ্যা বলার মধ্যে কিংবা কোনো মুসলমানকে কষ্ট দেয়ার নিমিত্তে ব্যবহার করা হয়। তবে আমানতের খেয়ানত করা হবে।

আত্মহত্যা হারাম কেন?

আমাদের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই শুধু নয়; বরং আমাদের গোটা দেহ, আমাদের পূর্ণ জীবন আল্লাহপ্রদত্ত আমানত। অনেকে মনে করে শরীর আমাদের নিজস্ব। বিধায় তার সাথে যেমন তেমন অরচরণ করা যাবে। ধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল। বরং এই শরীর আল্লাহপ্রদত্ত একটি আমানত। এ কারণেই আত্মহত্যা ইসলামী শরীয়াহর দৃষ্টিতে জঘন্যতম হারাম। শরীর যদি আমাদের নিজস্বই হতো, তাহলে আত্মহত্যা হারাম হবে কেন? হারাম হওয়ার কারণ এটাই যে, আমাদের প্রাণ, শরীর, অস্তিত্ব, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসহ সবই আমাদের মালিকানাধীন নয়। সবেরই মালিক মহান আল্লাহ তা'আলা। যেমন এ বইটির মালিক আমি, এখন যদি আমি কাউকে বইটি দিয়ে দেই, তাহলে এটা জায়েয হবে। পক্ষান্তরে কেউ যদি বলে, তুমি আমাকে মেরে ফেলো, আমার জীবন শেষ করে দাও। স্ট্যাম্প পেপারে লিখে দস্তখত করে, সীল মেরে দিলো যে, তুমি আমাকে হত্যা করে দাও। এতসবকিছু করার পরেও তার জন্য এ ব্যক্তিকে হত্যা করা জায়েয হবে না। কারণ, সে নিজেই তো এ জীবনের মালিক নয়। জীবন যদি কারো মালিকানাধীন হতো, তাহলে মেরে ফেলার অনুমতিদান সঠিক হতো। সুতরাং অন্যকে এ জীবন-প্রাণ শেষ করে দেয়ার কোনো অধিকার তার হাতে নেই।

গুনাহর কাজ করা খেয়ানত

আল্লাহ তা'আলা আমাদের জীবন, শক্তি ও যোগ্যতাকে আমানতস্বরূপ দান করেছেন। মূলত গভীর দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে আমাদের পুরো জীবনটাই একটি আমানত। কাজেই আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা এমন কোনো কাজ যেন না হয়, যা খেয়ানতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। আমানত সম্বন্ধে প্রচলিত সংকীর্ণ ধারণা ভুল। অর্থাৎ কেউ যদি টাকার ব্যাগ আমানত রেখে বলে, এটা রাখুন। তারপর টাকাগুলো সিন্দুকে ভরে তালা লাগিয়ে দেয়া হল। অতঃপর আমানত গ্রহীতা কোনো এক সুযোগে টাকাগুলো বের করে খরচ করে ফেলল। কিংবা আমানতদাতা নিজের টাকা ফেরত চাইলে গ্রহীতা অস্বীকার করে বসলো। তাহলে এটা আমানতের খেয়ানত হবে, অন্যথায় নয়। আমানত সম্পর্কে এ ধরনের সংকীর্ণ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ, আমাদের পুরো জীবনটাই তো একটি আমানত এবং প্রতিটি কাজ ও কথাও একেকটি আমানত।

আলোচ্য হাদীসটিতে যে বর্ণিত হয়েছে, আমানতে খেয়ানত করা মুনাফিকের নিদর্শন। এর সঠিক মর্মার্থ হলো, চোখের গুনাহ, কানের গুনাহ, যবানের গুনাহ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গুনাহসহ সকল গুনাহই খেয়ানতের মধ্যে গণ্য। সুতরাং এগুলোর মাধ্যমে গুনাহ করা কোনো মুমিনের কাজ নয়; বরং মুনাফিকের কাজ।

আ'রিয়াতের জিনিস আমানত

উপরিউক্ত বিষয়গুলো আমানতের সাথে সংশ্লিষ্ট সাধারণ আলোচনা। এ প্রসঙ্গে কিছু বিশেষ কথাও আছে। যেগুলো আমরা আমানত মনে করি না। হেতু আমানতের মতো আচরণও করা হয় না। যথা আ'রিয়াতে আনীত বস্তু। আ'রিয়াত বলা হয়, যথা এক ব্যক্তির একটা জিনিস প্রয়োজন; কিন্তু তার কাছে নেই। এ কারণে জিনিসটি আরেকজনের নিকট থেকে ব্যবহারের জন্য চেয়ে আনলো। যেমন বলল, ভাই, আমার অমুক জিনিসটি দরকার, কিছু সময়ের জন্য আমাকে দিন। এটাকেই বলা হয় আ'রিয়াত। আ'রিয়াতের জিনিসের বিধান আমানতি জিনিসের বিধানের মতই।

অথবা মনে করুন, আমার একটি বই পড়তে ইচ্ছে করছে, যা আমার নিকট নেই। তাই আমি আরেকজন থেকে ওই বইটি এই বলে চেয়ে আনলাম যে, পড়া শেষে ফেরত দিয়ে দিবো। এখন এই বইটি শরীয়তের দৃষ্টিকোণে আমার নিকট আ'রিয়াত। আর আ'রিয়াতি জিনিসের বিধান যেহেতু আমানতি জিনিসের মতোই, তাই মালিকের ইচ্ছার বিপরীত ক্ষেত্রে ওই জিনিস ব্যবহার করা জায়েয নয়। জিনিসটি যেভাবে ব্যবহার করলে মালিক অসন্তুষ্ট হবে, সেভাবে ব্যবহার করা যাবে না। আ'রিয়াত হিসাবে আনীত বস্তু যথাসময়ে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আন্তরিক হতে হবে।

প্লেটটি আমানত

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) তার বহু ওয়াজে বারবার এ ব্যাপারে সতর্ক করেছেন যে, কেউ যদি আন্তরিকতা দেখিয়ে আপনার ঘরে কোনো খানা পাঠায়, তখন সঠিক পদ্ধতি তো এটাই ছিল যে, খাবার অন্য প্লেটে রেখে সাথে সাথে তার প্লেট ফিরিয়ে দেয়া। কিন্তু আজকাল যা হয়, তাতে মনে হয় যেন ওই লোক আপনার ঘরে খানা পাঠিয়ে অন্যায় করে ফেলেছে। কারণ,

আজকাল যে খানা পাঠায়, সে প্লেট থেকেই বঞ্চিত হয়ে যায়। যার বাড়িতে খাবার পাঠানো হয়, তার বাড়িতে এই বেচারার প্লেট গড়াগড়ি করতে থাকে। যার প্লেট তাকে ফিরিয়ে দেয়ার চিন্তাও মাথায় আসে না। অনেক ক্ষেত্রে তো শেষ পর্যন্ত নিজেই ব্যবহার আরম্ভ করে দেয়। এটাও আমানতের খেয়ানত। যেহেতু এ জাতীয় পাত্র ইত্যাদি আ'রিয়াতের অন্তর্ভুক্ত, এগুলোর মালিক বানিয়ে দেয়া হয় না বিধায় এ ধরনের পাত্র ব্যবহার করা কিংবা ফেরত দেয়ার নামও না নেয়া আমানতে খেয়ানত করা।

বইটি আপনার নিকট আমানত

আপনি কারো থেকে পড়ার উদ্দেশ্যে একটি বই নিলেন। পড়ার পর বইটি আর ফেরত দেননি। তাহলে এটাও খেয়ানত। অথচ বর্তমানে তো কিছু কিছু ভুল মস্তিষ্কসম্পন্ন লোক এমনও মন্তব্য করে যে, বই চুরি করা বৈধ। এ ধরনের লোকের নিকট যখন বই চুরি করা বৈধ, তখন বই সংশ্লিষ্ট খেয়ানতও তাদের নিকট অবশ্যই বৈধ হবে। এদেরকে দেখা যায় পড়ার জন্য বই নিয়ে আর ফেরত দেয়ার নাম নেয় না। অথচ এটাও খিয়ানতের মধ্যে বিবেচিত হবে। আ'রিয়াতের সকল বস্তুই এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত যে, তা খুব যত্নসহকারে রাখতে হবে। মালিকের মর্জি পরিপন্থী ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। করলে জায়েয হবে না। আ'রিয়াতের জিনিস আপনার হাতে যেভাবেই আসুক না কেন এই বিধান প্রযোজ্য।

চাকুরির নির্ধারিত সময় আমানত

কেউ চাকুরি নেয়ার সময় যদি আট ঘণ্টা ডিউটির উপর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়, তাহলে আট ঘণ্টা সে প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রি করলো। এই আট ঘণ্টা সময় তার নিকট প্রতিষ্ঠানের বা ব্যক্তির আমানত। সুতরাং এই আট ঘণ্টা সময়ের মধ্যে যদি সে এক মিনিটও এমন অন্য কোনো কাজে ব্যয় করে যে কাজে সময় ব্যয় করার অনুমতি মালিক বা প্রতিষ্ঠান দেয় নি, তাহলে এটাও আমানতের খেয়ানত হবে। যথা ডিউটিকালীন আপনার কোনো বন্ধু বা আত্মীয় আসলো আর আপনি তাকে সঙ্গে করে হোটেলে গিয়ে আড্ডা শুরু করে দিলেন। কর্তৃপক্ষের নিকট ছুটি নেন নি। তাহলে এর দ্বারা আপনি আমানতের খেয়ানত করলেন।

এবার চিন্তা করুন, আমরা কত উদাসীনতার মধ্যে লিপ্ত। আমাদের বিক্রিত সময়কে অন্য কাজে ব্যয় করছি। ফলে মাস শেষে যে বেতন নিচ্ছি, সেটা পরিপূর্ণ হালাল হচ্ছে না। কারণ, পরিপূর্ণ সময় তো আমরা চাকুরিতে ব্যয় করি নি।

দারুল উলূম দেওবন্দের সম্মানিত শিক্ষকগণ

দারুল উলূম দেওবন্দ এর সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দের জীবনাচারের প্রতি লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, যেন আল্লাহ তা'আলা তাঁদের মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরামের যুগের স্মৃতি পুনরুজ্জীবিত করেছেন। দেওবন্দের মুহতারাম শিক্ষকদের মাসিক বেতন তখন দশ থেকে পনের টাকার বেশি ছিলো না। এর পরেও যেহেতু বেতন নির্ধারণের মাধ্যমে নিজেদের সময়কে মাদরাসার নিকট বিক্রি করে দিয়েছিলেন, এজন্য তাঁরা নিয়ম করে নিয়েছিলেন যে, মাদরাসার নির্ধারিত সময়ে যদি কোনো বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন দেখা করতে আসতো। তাহলে তাদের আসার সঙ্গে-সঙ্গে ঘড়ি দেখে সময় লিখে নিতেন এবং তাড়াতাড়ি সাক্ষাৎপ্রার্থীর সাথে প্রয়োজন সেরে বিদায় দিয়ে পুনরায় ঘড়ি দেখে সময় লিখে নিতেন। এভাবে পুরো মাস নোট করে রেখে মাসের শেষে তাঁরা নিজেরাই এ দরখাস্ত পেশ করতেন। এ মাসে আমি এত সময় মাদরাসার কাজে ব্যয় করতে পারি নি, নিজের কাজে লাগিয়েছি। অতএব, সময় অনুপাতে আমার বেতন কেটে নেয়া হোক। যেহেতু পূর্ণ বেতন আমার জন্য হালাল হবে না। এর বিপরীতে আমাদের অবস্থা হলো আমরা আরো পাওয়ার জন্য দরখাস্ত পেশ করি। বেতন কাটার জন্য দরখাস্ত দেয়ার কথা আমরা কল্পনাও করি না।

হযরত শাইখুল হিন্দ (রহ.) এর বেতন

শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (রহ.) দারুল উলূম দেওবন্দের প্রথম ছাত্র ছিলেন। তাঁর মাধ্যমেই দারুল উলূমের ইলমি সফর শুরু হয়। আল্লাহ তা'আলা ইলম, মা'রিফাত ও তাকওয়ায় শাইখুল হিন্দকে অনেক উঁচু মর্যাদা দান করেছিলেন। যে সময় তিনি দারুল উলূমের শাইখুল হাদীস ছিলেন, তখন তাঁর বেতন ছিল মাত্র দশ টাকা। পরবর্তীতে তাঁর বয়স ও অভিজ্ঞতার কথা বিবেচনা করে মজলিসে শুরার সদস্যবৃন্দ সিদ্ধান্ত নিলেন যে, যেহেতু হযরতের বেতন একেবারেই অল্প। সে তুলনায় ব্যস্ততা ও খরচ অনেক

বেশি, তাই তাঁর বেতন বাড়ানো হবে। দশ টাকার স্থলে পনের টাকা করে দেয়া হবে। শুরার এ সিদ্ধান্ত হযরত যখন জানলেন, জিজ্ঞেস করলেন, পনের টাকা দেয়া হবে কেন? বলা হলো, দারুল উলূমের মজলিসে শুরা এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তখন তিনি এতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে দারুল উলূমের মুহতামিম বরাবর এ মর্মে দরখাস্ত লিখলেন যে, হযরত, শুনেছি আমার বেতন দশ টাকা থেকে পনের টাকা করা হয়েছে। অথচ আমার এখন বয়স বেড়ে গেছে। আগে খুব উদ্দীপনার সাথে দু'-তিন ঘন্টা পর্যন্ত সবক পড়াতাম। কিন্তু এখন আগের মতো পারি না। বরং তুলনামূলক কম পড়াই। মাদরাসায় সময়ও কম দেই। অতএব, আমার বেতন বাড়ানোর কোনো বৈধ কারণ দেখছি না বিধায় আমার বেতন যা বাড়ানো হয়েছে, তা প্রত্যাহার করা হোক আর আমাকে পূর্বের ন্যায় দশ টাকাই দেয়া হোক।

লোকেরা হযরতের নিকট এসে পীড়াপীড়ি শুরু করে দিল যে, হযরত! আপনি তাকওয়া ও পরহেযগারীর কারণে বর্ধিত বেতন ফেরত দিচ্ছেন। কিন্তু অন্যান্য শিক্ষকের জন্য এটা সমস্যার কারণ হবে। আপনার কারণে তাদের বেতন বাড়বে না। কাজেই আপনি এটা গ্রহণ করুন। এতদসত্ত্বেও হযরত তা কবুল করেন নি। যেহেতু সর্বদা তাঁর হৃদয়ে এ চেতনা বদ্ধমূল ছিল যে, এ পার্থিব জগত সামান্য কয়েক দিনের, হতে পারে আজই অথবা কালই তার পরিসমাপ্তি ঘটবে। যে বেতন আমি পাচ্ছি, সে বেতন পরিপূর্ণ হালাল না হলে আল্লাহ তা'আলার দরবারে লজ্জিত হতে হবে।

দারুল উলূম দেওবন্দ অন্য দশটি ইউনিভার্সিটির মতো নয় যে, শিক্ষক ক্লাশ করলেন আর ছাত্ররাও পড়ে নিলো, ব্যস। বরং দারুল উলূম দেওবন্দ তো এ সমস্ত বুযুর্গদের তাকওয়ার প্রতিফলন ও নির্যাস, যা গড়ে উঠেছে মহান আল্লাহর ভয়, জবাবদিহিতা ও খিদমতের মানসিকতার মাধ্যমে।

সারকথা হলো, আমরা সময়কে চাকুরির চুক্তির মাধ্যমে বিক্রি করে দিয়েছি। এ সময় আমাদের নিকট আমানত। এর মধ্যে যেন কোনো প্রকার খেয়ানত না হয়।

বর্তমানে চলছে অধিকার আদায়ের যুগ

আজকাল মানুষ অধিকার আদায়ের নিমিত্তে সকল শক্তি ব্যয় করে। মিছিল মিটিং এ স্লোগান ফেনায়িত করা হচ্ছে যে, আমাদের অধিকার পূর্ণ করা হোক।

প্রত্যেকের দাবি হলো, আমাকে আমার অধিকার বুঝিয়ে দেয়া হোক। কিন্তু কারো চিন্তায় এ কথা নেই যে, অন্যের ব্যাপারে আমার উপর যে অধিকার আছে, তা যথাযথভাবে আদায় করছি না তো? দাবি জানায় বেতন বাড়ানোর পদোন্নতি দেয়ার, ছুটি-সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করার। কিন্তু যে দায়িত্ব আমার উপর বর্তেছে, তা কতটুকু আদায় করছি এ ফিকির কারো নেই।

দায়িত্ব সচেতন হোন

আমি অন্যের নিকট হতে নিজের অধিকার আদায় করার ব্যাপারে পুরোপুরি সচেতন। আমার নিকট অন্যের অধিকারের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। এরূপ মনমানসিকতা যতদিন থাকবে, মনে রাখবেন ততদিন কারো অধিকারই আদায় হবে না। অধিকার আদায়ের একমাত্র পথ ও পদ্ধতি সেটাই, যা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল (সা.) আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। তাহলো প্রত্যেকেই নিজ দায়িত্বের ব্যাপারে সচেতন হবে। যে দায়িত্ব আমাকে দেয়া হয়েছে, তা যথাযথভাবে আমি আদায় করছি কিনা। এরূপ দায়িত্ব সচেতনতা যখন সবার মাঝে সৃষ্টি হবে, তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে সকলেরই অধিকার আদায় হয়ে যাবে। স্বামীর মাঝে যদি এ চেতনাবোধ আসে যে, আমি স্ত্রীর হক বা অধিকার যথাযথভাবে পূর্ণ করবো। তাহলে তো স্ত্রীর অধিকার পূর্ণ হয়ে গেলো। তেমনি স্ত্রীর মাঝে যদি এ অনুভূতি থাকে যে, স্বামীর হক তথা অধিকারের ব্যাপারে আমি পূর্ণ সচেতন হবো, তাহলে স্বামীর অধিকারও পূর্ণ হয়ে যাবে। শ্রমিকের অন্তরে যদি এ দায়িত্ব সচেতনতা আসে যে, আমি মালিকের হক তথা অধিকারের প্রতি সযত্ন হবো এবং নিজ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে আদায় করবো, তাহলে মালিকের অধিকার পূরণ হয়ে যাবে। তদ্রূপ মালিকও যদি এরূপ কর্তব্যবোধ নিজ অন্তরে সৃষ্টি করতে পারেন যে, আমি আমার শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে তালবাহানা করবো না; বরং আমার উপর তাদের যে অধিকার আছে, তা সুষ্ঠুভাবে আদায় করবো, তাহলে শ্রমিকের অধিকারও তারা পেয়ে যাবে। মোটকথা, যতদিন পর্যন্ত এ কর্তব্যবোধ ও দায়িত্ব সচেতনতা হৃদয়ে জাগ্রত না হবে, ততদিন অধিকার আদায়ের স্লোগানই মুখরিত হবে। বিভিন্ন সংগঠন জন্ম নিবে, মিটিং-মিছিল হবে, কিন্তু কাজের বেলায় কিছুই হবে না। বরং সকলের অধিকারই অপূর্ণ রয়ে যাবে। আল্লাহর সামনে এসব দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কে আমাদেরকে জাবাবদিহি করতে হবে। তিনি অধিকার ও দায়িত্ব সম্বন্ধে

আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করবেন– এরূপ অনুভূতি আমাদের হৃদয়ে সৃষ্টি করা না গেলে অধিকার আদায়ের কোনো কর্মসূচীই ফলপ্রসূ হবে না। অএতব, শান্তি ও নিরাপত্তার পথ একটাই যে, প্রত্যেককে দায়িত্ব সচেতন হতে হবে, অন্যের অধিকারের প্রতি যত্নবান হতে হবে এবং যথাযথ আদায়ে সচেষ্ট হতে হবে।

এটা মাপে কম দেয়ার অন্তর্ভুক্ত

চাকুরির নির্ধারিত সময়ও আমাদের নিকট এক প্রকার আমানত। কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ـ الَّذِيْنَ إِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ـ وَإِذَا كَالُوْهُمْ أَوْوَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ (سورة التطفيف ١ـ٣)

যারা মাপে কম করে তাদের জন্য দুর্ভোগ, যারা লোকের কাছ থেকে যখন মেপে নেয়, তখন পূর্ণ মাত্রায় নেয় এবং যখন লোকদেরকে মেপে দেয় কিংবা ওজন করে দেয় তখন কম করে দেয়। [সূরা আত্ তাতফীক, আয়াত ১-৩]

মানুষের ধারণা, মাপে বা ওজনে কম দিয়ে ধোঁকা দেয়া শুধু ক্রয়-বিক্রয় কিংবা সওদার ক্ষেত্রেই হয়; অথচ উলামায়ে কেরাম লিখেছেন–

اَلتَّطْفِيْفُ فِيْ كُلِّ شَيْئٍ

ওজনে কম দেয়া সকল কিছুতেই পাওয়া যায়। সুতরাং আট ঘন্টার ডিউটিতে যদি কেউ কিছু সময় ফাঁকি দেয়, সেও ওজনে কম করছে।

আলোচ্য আয়াতগুলোর আলোকে সেও গুনাহগার হবে। তাই এসকল ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকা উচিত।

পদ দায়িত্বের একটি ফাঁদ

আজকাল সরকারী অফিসে কোনো কাজের প্রয়োজন হলে সেতো এক মহা মুসিবত। কাজ উদ্ধার করা তখন অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। বারবার অফিসে ধর্ণা দিতে হয়। কোনো সময় হয়ত অফিসারকে পাওয়া যায় না। কখনো বা শুনতে হয় আজ আর কাজ হবে না। পরের দিন গেলে বলে, আগামী দিন এসো। তবুও কাজ হয় না। কারণ, আমাদের দায়িত্ব সচেতনতা ও আমানতের অনুভূতি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কেউ কোনো পদে থাকলে এটাকে নিজের স্বার্থ উদ্ধারের উপকরণ মনে করা উচিত নয়, বরং একে দায়িত্বের একটি জাল মনে করা

উচিত। রাষ্ট্রক্ষমতা, প্রশাসন, বিভিন্ন পদ এগুলো প্রতিটিই দায়িত্বের ফাঁদ। যা এমন কঠিন দায়িত্ব যে, দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.) এর ভাষায়, যদি সুদূর ফুরাত নদীর তীরেও একটি কুকুর না খেয়ে মারা যায়, তাহলে আমার ভয় হয় কিয়ামতের দিবসে আল্লাহ তা'আলা যদি আমাকে প্রশ্ন করে বসেন যে, হে উমর,তোমার খেলাফতের সময় অমুক কুকুর ক্ষুধা-পিপাসায় মারা গেল কেন? তখন আমি কি জবাব দিব।

এমন লোক খেলাফতের উপযুক্ত নয়

বর্ণিত হঁয়েছে, হযরত উমর (রা.) যখন আততায়ীর আক্রমণে মারাত্মকভাবে আহত হলেন, তখন কিছু কিছু সাহাবী তাঁর খিদমতে এসে আরজ করলেন, 'হযরত! আপনি তো দুনিয়া ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। তাই আপনার পরবর্তী খলিফার নাম প্রস্তাব করে যান।' এসব সাহাবাদের থেকে কেউ কেউ এ প্রস্তাবও পেশ করলেন যে, আপনার পরে খলিফা হিসাবে আপনার ছেলে আব্দুল্লাহর নাম প্রস্তাব করুন। উমর (রা.) উত্তর দিলেন, 'না, যে নিজের স্ত্রীকে তালাক দেয়ার নিয়ম জানে না, তোমরা আমাকে বলা দিচ্ছ তাকে পরবর্তী খলিফা নির্বাচন করার। [আল্লামা সুয়ূতীকৃত তারীখুল খুলাফা পৃ-১১৩]

মূল ঘটনা ছিল, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাসূল (সা.) এর যুগে স্বীয় স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দিয়ে দিলেন। অথচ নিয়ম হলো, হায়েয চলাকালীন তালাক দেয়া জায়েয নেই। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) এর নিকট মাসআলাটি অজানা ছিল। ঘটনাটি যখন রাসূল (সা.) জানলেন, তখন বললেন, 'এটা তোমার ভুল হয়েছে বিধায় তালাক রুজু করো তথা ফিরিয়ে নাও। পরবর্তীতে যদি তালাক দিতেই হয়, তাহলে হায়েয অবস্থায় নয়; বরং পবিত্র অবস্থায় দিও।

উমর (রা.) উক্ত ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত করে বলেছেন, 'তোমরা এমন লোককে খলিফা বানাতে চাও, যে নিজ স্ত্রীকে পর্যন্ত তালাক দিতে জানে না।

[প্রাগুক্ত ১১৩ পৃ.]

উমর (রা.) এর কর্তব্যবোধ

অতঃপর হযরত উমর (রা.) বললেন, মূলত ব্যাপার হলো খিলাফতের এই মহান দায়িত্বের ফাঁদ খাত্তাবের বংশধরদের একজনের কাঁধে পড়েছে– এটাই

যথেষ্ট।' কথাটি দ্বারা হযরত উমর (রা.) বোঝাতে চাইলেন যে, বার বছর পর্যন্ত এ ফাঁদে আমি আটকা পড়ে আছি– এটাই যথেষ্ট। এ বংশের অন্য কারো গলায় আর এ ফাঁদ পরাতে চাই না। যেহেতু জানা নেই, আল্লাহ তা'আলার নিকট যদি আমাকে এ মহান দায়িত্বের হিসেব দিতে হয়, তাহলে আমার অবস্থা কেমন হবে। হযরত উমর ফারুক (রা.) তো সেই মহান মর্যাদাবান ব্যক্তি, যাঁর সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন–

عُمَرُ فِي الْجَنَّةِ

অর্থাৎ– উমর জান্নাতী।

এ সুসংবাদের পর তাঁর বেহেশতি হওয়া সম্পর্কে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহও নেই। এতদসত্ত্বেও হযরত উমর ফারুক (রা.) এর হৃদয়ে আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতা ও দায়িত্বের ভয় এবং অনুভূতি এমনই ছিল। [তারীখে তাবারী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৯২]

একবার হযরত উমর (রা.) বলেছেন, কিয়ামতের দিন যদি এ দায়িত্বের হিসাব-কিতাবে আমি কাঁটায় কাঁটায় হই, অর্থাৎ– আমার উপর গুনাহ বা সাওয়াব কিছুই নাই। আর এর ফলে আমাকে আ'রাফে রাখা হয়। (আ'রাফ বলা হয়, বেহেশত ও দোযখের মধ্যবর্তী স্থানকে, যেখানে ওই সকল লোককে রাখা হবে যাদের নেক ও বদ বরাবর)। তাহলে এটাই আমার জন্য যথেষ্ট হবে যে, আমি পার পেয়ে গেলাম। আসলে হযরত উমর (রা.) এর পবিত্র অন্তরে আমানতের ব্যাপারে যেরূপ অনুভূতি ছিল, তার সামান্যও যদি আমাদের অন্তরে থাকতো, তাহলে সকল সমস্যাই সমাধান হয়ে যেতো।

আমাদের প্রধান সমস্যা খেয়ানত

আমাদের প্রধান সমস্যা কি– এ জাতীয় আলোচনা এক সময় ব্যাপকভাবে হয়েছিল। আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা কী, যা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমাধান করা প্রয়োজন? মূলত আমাদের সমস্যার ব্যাপারে সঠিক ধারণা আমাদের নিকট নেই। স্বীয় কর্তব্য পালনের গুরুত্ব আমাদের অন্তর থেকে মুছে গেছে। মহান আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতার ভয় নেই। দ্রুত চলে যাচ্ছে আমাদের জীবন। এ জীবনে টাকা-পয়সা উপার্জন, সুস্বাদু খাবার ও ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতায় একজন আরেকজনকে ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য হন্যে হয়ে

ছুটছি। আজকের প্রধান সমস্যা এবং সকল ব্যাধির মূল একটাই যে, আমাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব ও ভয় নেই। আল্লাহ তা'আলা দয়া করে যদি পরকালের জবাবদিহিতার ভয় আমাদের অন্তরে সৃষ্টি করে দেন, তবেই আমাদের সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

অফিসের আসবাবপত্র আমানত

আপনি যে অফিসে চাকুরী করেন, সেখানকার আসবাবপত্র আপনার নিকট আমানত। এসব আসবাবপত্র আপনাকে দেয়া হয়েছে অফিসিয়াল কাজে ব্যবহার করার জন্য। তাই এগুলো আপনার ব্যক্তিগত কাজে ব্যয় করলে খেয়ানতের শামিল হবে। মানুষের ধারণা, অফিসের এসব জিনিসপত্র একটু-আধটু নিজের জন্য ব্যবহার করলে তেমন অসুবিধা নেই। জেনে রাখুন, খেয়ানত তো খেয়ানতই– চাই তা বড় জিনিসে হোক কিংবা ছোট জিনিসে, উভয়ই হারাম এবং কবীরা গুনাহ। উভয়টিতেই আল্লাহর নাফরমানি হয় বিধায় বড়-ছোট সকল খেয়ানত থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

সরকারি জিনিসও আমানত

পূর্বেই বলা হয়েছে, আমানত বলা হয় কেউ কোনো বস্তু বা কাজের দায়িত্ব আপনার উপর ভরসা ও আস্থা করে আপনাকে অর্পণ করা। পক্ষান্তরে আপনি তার আস্থা ও ভরসা অনুযায়ী কাজটি সম্পন্ন না করলে তবে তা হবে খেয়ানত। যেসব সরকারী রোডে আমরা চলি, যে সব বাস-ট্রেনে আমরা সফর করি, এগুলোও আমাদের নিকট আমানত। অর্থাৎ এগুলোকে যদি নিয়মের সাথে সুষ্ঠুভাবে, বৈধ উপায়ে ব্যবহার করা হয়, তাহলে তা আমাদের জন্য জায়েয হবে। আর যদি এগুলোকে নিয়ম বহির্ভূত অবৈধ পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হয়, তাহলে খেয়ানত হবে, যা অবশ্যই হারাম। যথা এগুলো ব্যবহার করার সময় ময়লা ফেলা হলো কিংবা অন্য কোনো ক্ষতি করা হলো। বর্তমানে তো মানুষ সরকারী রোডকে নিজস্ব সম্পদ মনে করে। কেউ রাস্তা খুঁড়ে নিজের বাড়ির ময়লা পানি যাওয়ার ড্রেন বানিয়ে নেয়। কেউ রাস্তা বন্ধ করে শামিয়ানা টাঙিয়ে অনুষ্ঠান করে। অথচ ফেকাহগ্রন্থে উলামায়ে কেরাম মাসআলা লিখেছেন, যদি কেউ নিজ বাড়ির ছাদের পানি নিষ্কাশনের পাইপের মাথা বাহিরের রাস্তায় লাগায়,তাহলে সে যেহেতু তার মালিকানায় নয় এমন জায়গা ব্যবহার করেছে,

তাই তার জন্য এরূপ করা জায়েয নয়। ভাবনার ব্যাপার হলো, এতে তেমন জায়গাও আটকায় না। তবুও নাজায়েয বলা হয়েছে। কারণ, এ জায়গা আমানত-নিজের মালিকানাধীন নয়।

হযরত আব্বাস (রা.) এর পরনালা

মহানবী (সা.) এর চাচা হযরত আব্বাস (রা.) 'পরনালা' সংক্রান্ত তাঁর একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা আছে। তাঁর বাড়ি ছিল মসজিদে নববীর সাথে লাগোয়া। বাড়ির একটি পরনালার মাথা মসজিদে নববীর আঙ্গিনায় এসে পড়তো। একবার হযরত উমর (রা.) এর দৃষ্টি ওই পরনালার উপর পড়লে তিনি দেখতে পেলেন, ওই পরনালা মসজিদের অংশে এসে পড়েছে।

লোকদের জিজ্ঞেস করলেন, 'এই পরনালাটি কার?' লোকেরা বলল, 'হযরত আব্বাস (রা.) এর।' তিনি তা ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দিলেন। কারণ, মসজিদের দিকে পরনালা বের করা জায়েয নয়। এ ঘটনা যখন হযরত আব্বাস (রা.) জানলেন, তিনি হযরত উমর (রা.) এর খেদমতে এসে বললেন, 'এটা আপনি কি করলেন?' উমর (রা.) উত্তর দিলেন, 'এ পরনালা যেহেতু মসজিদে নববীর অংশে এসে পড়েছিল, তাই তা ফেলে দিয়েছি।' হযরত আব্বাস (রা.) বললেন, 'পরনালাটি তো আমি নবী কারীম (সা.) এর অনুমতি নিয়েই লাগিয়েছি।' একথা শুনে হযরত উমর (রা.) বিচলিত হয়ে বললেন, 'আপনি আমার সাথে চলুন।' উভয় যখন মসজিদে নববীতে পৌঁছলেন, উমর (রা.) রুকুর মতো ঝুঁকে গেলেন এবং বললেন, 'আব্বাস! আল্লাহর দোহাই, আমার কোমরের উপর দাঁড়িয়ে এ পরনালা পুনরায় লাগিয়ে নিন। কারণ, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর অনুমতি নিয়ে লাগানো পরনালা ভেঙ্গে দেয়ার মতো এত বড় সাহস খাত্তাবের পুত্রের নেই। হযরত আব্বাস (রা.) বললেন, 'থাক, আমি লাগিয়ে নিবো।' কিন্তু হযরত উমর (রা.) বললেন, 'না, যেহেতু ভেঙ্গেছি আমি, তাই তার শাস্তিও আমাকেই ভোগ করতে হবে।'

শরীয়তের আসল মাসআলা তো এটাই ছিল যে, প্রশাসনের অনুমতি ব্যতীত পরনালা লাগানো জায়েয নেই। কিন্তু হযরত আব্বাস (রা.) কে যেহেতু মহানবী (সা.) অনুমতি দিয়েছিলেন, তাই তার জন্য জায়েয ছিল। [তাবাকাতে ইবনে সা'দ খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২০]

আজ আমাদের অবস্থা হল, যার যতটুকু ইচ্ছা সরকারী রাস্তা জমি দখল করে নিচ্ছি। একবারও আমাদের মনে হচ্ছে না যে, আমরা গুনাহর কাজ করছি। নামাযও পড়ছি আর এ জাতীয় খেয়ানতও করে যাচ্ছি। উল্লিখিত সকল কিছুই আমানতের খেয়ানত বিধায় এগুলো থেকে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে।

মজলিসের কথাবার্তা আমানত

এক হাদীসে নবী করিম (সা.) বলেছেন–

اَلْمَجَالِسُ بِا لْأَمَانَةِ (جامع الاصول ج ۲ ص ۵۰۵)

অর্থাৎ– মজলিসের কথাবার্তা শ্রোতাদের নিকট আমানত। যথা দুই-'তিন জন মিলে মজলিসে কর্তাবার্তা চলছিল। আনন্দঘন পরিবেশে কেউ ফস করে একটা গোপন কথা বলে ফেললো– এ জাতীয় ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া অন্যের নিকট কথাটি ব্যক্ত করে দেয়া খেয়ানতের শামিল হবে, যা একেবারেই হারাম। অনেকের কুঅভ্যাস যে, এখানের কথা ওখানে, ওখানের কথা এখানে লাগিয়ে বেড়ায়। আর সমূহ ফিতনা-ফ্যাসাদ ছড়ায়। অবশ্য মজলিসে যদি অন্যের ক্ষতিসাধনের কোনো কথা বলা হয়ে থাকে, তখন ভিন্ন কথা। যথা দুই-তিনজন মিলে যদি এ কুমতলব আঁটে যে, অমুকের বাড়ি আক্রমণ করবো, তখন এটাই স্বাভাবিক যে, এরূপ অবস্থায় এ জাতীয় কথা গোপন রাখা যাবে না। বরং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে এই ষড়যন্ত্রের কথা জানিয়ে দিতে হবে। কিন্তু এমন পরিস্থিতি ছাড়া অন্য সময়ে মজলিসের গোপন কথা ফাঁস করে দেয়া জায়েয নেই।

গোপন কথা একটি আমানত

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, কেউ হয়ত মজলিসের গোপন কথা আরেকজনের নিকট ফাঁস করে দিল এবং সাথে সাথে এও সতর্ক করে দিল যে, এটা একান্ত গোপন, তোমাকে বললাম। তুমি আর কাউকে বলো না। এভাবে সতর্ক করে সে ভেবেছে গোপনীয়তা রক্ষা করেছে। অথচ দেখা গেল, শ্রোতা নিজেও ঠিক এ পদ্ধতিতে আরেকজনকে বলে দিল। অনুরূপ পদ্ধতি অব্যাহতভাবে চলতে লাগল। আর সকলেরই ধারণা, তারা আমানত রক্ষা করেছে। অথচ এটাও খেয়ানত হয়েছে, যা মোটেও জয়েয নেই।

এ জাতীয় বিষয়গুলোর কারণেই আমাদের সমাজ আজ ধ্বংসের পথে যাচ্ছে। একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সামাজিক ঝগড়া-ফ্যাসাদ এভাবেই ছড়াচ্ছে। পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ-শত্রুতা এভাবেই সৃষ্টি হচ্ছে। এসব কারণেই নবী করীম (সা.) খেয়ানত করতে নিষেধ করেছেন।

টেলিফোনে আড়ি পেতে অন্যের কথা শোনা

দু'জন মানুষ হয়তো একটু আলাদা হয়ে গোপন আলাপচারিতায় লিপ্ত। আর আরেকজন তাদের কথা শোনার জন্য উদগ্রীব হয়ে গেল। তারা কী বলছে, এটা নিয়ে যেন তার বিরাট মাথা ব্যাথা। এরূপ করলে এটাও আমানতের খেয়ানত হবে।

অথবা টেলিফোন করার সময় কারো লাইন হয়ত আপনার লাইনের সাথে মিলে গেছে। আর আপনি তো তাদের কথা শুনা আরম্ভ করলেন। তাহলে এটাও আমানতের খেয়ানত হবে। এরূপ কাজ অহেতুক গুপ্তচরবৃত্তির শামিল, যা হারাম। অথচ আজকাল কারো গোপন কোনো বিষয় জানা থাকলে তা নিয়ে গর্ব করা হয়। 'অমুকের সব কথা জানি'। এভাবে বড়াইর সাথে নিজের চতুরতা প্রকাশ করা হয়। আমাদের নবীজি (সা.) অথচ এগুলোকে খেয়ানত ও না-জায়েয বলেছেন।

সারকথা

আমানতে খেয়ানত করার বিষয়টি ব্যাপক ও বিস্তৃত। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমানতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর খেয়ানত থেকে নিষেধ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত আমরা যতগুলো উপমা এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। এসবও আমানতের খেয়ানত, যা নিফাকের অন্তর্ভুক্ত। তাই আলোচ্য হাদীসটি সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে। হাদীসটির মর্মার্থ ছিল, মুনাফিকের নিদর্শন তিনটি। মিথ্যা কথা বলা, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা, আমানতের মাঝে খেয়ানত করা।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে খেয়ানত থেকে হিফাজত করুন। এসব বিষয় দ্বীনের অংশ। আমরা দ্বীনকে একেবারে সীমিত করে ফেলেছি। দৈনন্দিন জীবনের এসব বিষয়কে ভুলে বসেছি। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে আমাদের অন্তরে দ্বীনি চেতনা সৃষ্টি করে দিন। নবীজি (সা.) এর তরিকা মত চলার তাওফিক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সমাজ সংস্কার পদ্ধতি

“সমাজ কাকে বলে? ব্যক্তির সমষ্টিকেই সমাজ বলে। অতএব, যদি সমাজের প্রতিটি সদস্যের মাঝে নিজেকে সংশোধন করার চেতনা চলে আসে, তাহলে গোটা সমাজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু প্রত্যেকেই যদি নিজের চিন্তা ছেড়ে অপরের পেছনে লেগে থাকে, তাহলে সমাজশুদ্ধি কখনও হবে না।”

সমাজ সংস্কার পদ্ধতি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا - اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ (سورة المائده ١٠٥)

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ - وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের কথা চিন্তা করো। তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও, তাহলে যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তাদের ভ্রষ্টতা তোমাদের কোনো অনিষ্ট সাধন করতে পারবে না। তোমাদের সকলেই আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তিনি তোমাদের জানিয়ে দিবেন তোমাদের কৃতআমল সম্পর্কে।"

বিস্ময়কর আয়াত

এটি একটি আশ্চর্যজনক আয়াত, যা আমাদের একটি ভয়াবহ ব্যধি নির্দেশ করেছে। যদি বলা হয়, এ আয়াত আমাদের মধ্যে বিরাজমান উত্তপ্ত রগ পাকড়াওকারী, তাহলে অত্যুক্তি হবে না। মানুষের প্রবৃত্তি, প্রকৃতি ও তার বিবিধ ব্যধি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার চেয়ে বেশি আর কে জানে? সাথে সাথে এ আয়াতের মাধ্যমে আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর পেশ করা হয়েছে, যা সম্প্রতি আমাদের মনে প্রায়ই উদিত হয়।

সমাজ সংস্কারের বিভিন্ন প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয় না কেন?

সর্ব প্রথম প্রশ্নটি উত্থাপন করছি। তারপর আয়াতের অর্থ যথাযথভাবে বুঝে আসবে। অনেক সময় আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন ও সমাজ সংস্কারের জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি, কত দল, কত পার্টি,কত সংস্থা ও সংগঠন, কত সদস্য, কত সভা-সেমিনার, কত বৈঠক, কত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সকলের লক্ষ্য- উদ্দেশ্য একটিই- 'সমাজে বিরাজমান অন্যায় অবিচার, অশ্লীলতা অবৈধতা বন্ধ করা এবং সমাজকে সুষ্ঠু ও সঠিক ধারায় পরিচালিত করা।' এই লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করতে গিয়ে বড় বড় মুখরোচক শ্লোগান ও দাবি প্রত্যেকের মুখেই শোনা যায়। যেসব দল ও সংগঠন এ কাজে নিয়োজিত, তাদের সংখ্যা হিসাব কষলে দেখা যাবে, কয়েক হাজার ছাড়িয়ে গেছে।

তবে ব্যাপকভাবে সমাজে বর্তমান অবস্থা ও পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টি ঘোরালে এবং বাস্তব জীবনকে একটু কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করলে অনুভূত হয়, সমাজ সংস্কারের সকল প্রচেষ্টা একদিকে এবং সকল পাপাচারের সয়লাব আরেক দিকে। সমাজে এ সংস্কার প্রক্রিয়ার কোনো প্রভাব দৃষ্টিগোচর হয় না, বরং মনে হয় এই কিশতি বাঁকা হয়েই চলছে। অগ্রগতি হচ্ছে কেবল অনিষ্টতার। হাতেগোনা দু'-একটি উদাহরণ হয়তো ব্যতিক্রম হতে পারে। তবে সমষ্টিগতভাবে সমাজে বিশেষ কোনো পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না। এর কারণ কি?

রোগ নির্ণয়

উক্ত প্রশ্নেরও উত্তর আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতের মাধ্যমে দিয়েছেন। সাথে সাথে আমাদের একটি রোগ চিহ্নিত করেছেন। এটি এমন একটি আয়াত, যার

অন্তর্নিহিত অর্থ ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য সম্পর্কে আমরা অধিকাংশই উদাসীন। আয়াতটিতে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔

'হে মুমিনগণ! তোমাদের দায়িত্ব তোমাদেরই উপর। তোমরা যদি সৎ পথে পরিচালিত হও, তাহলে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে তার পথভ্রষ্টতা তোমাদের কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না। আল্লাহর দিকেই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন। এরপর তিনি তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন।'

নিজের খবর নেই আর অন্যের ফিকির

উক্ত আয়াত আমাদের মৌলিক একটি ব্যাধি চিহ্নিত করেছে। তাহলো, সমাজ সংস্কারের সকল প্রয়াস ফলপ্রসূ না হওয়ার কারণ হলো, প্রত্যেকেই সংস্কারের পতাকা হাতে নিতে চায়, সংশোধনটা যেন অপরের থেকে শুরু হোক। অপরকে আহবান করে, দাওয়াত দেয়, অপরের কাছে সংস্কারের বাণী শোনায়। কিন্তু নিজ অবস্থার পরিবর্তন সাধনে সম্পূর্ণ উদাসীনতা দেখায়। আজ আমরা যদি নিজেদের অবস্থা তলিয়ে দেখি, তাহলে দেখতে পাবো, বিভিন্ন সভা-সেমিনারে আমাদের কর্মপন্থা হলো, আমরা সমাজের মন্দ বিষয়গুলোর সমালোচনা করে তৃপ্তির ঢেকুর তুলি। বলি, সকলেই তো এমন করছে,' মানুষের এ দুর্দশা, সমাজ এত নষ্ট হয়ে গেছে, অমুককে আমি এমন করতে দেখেছি।' এই ঘুণেধরা সমাজে সবচেয়ে বড় সহজ কাজ হলো, অন্যের উপর অভিযোগ আরোপ করা, অন্যের সমালোচনা বা দোষর্চচা করা– "লোকেরা এমন করছে, সমাজে আজ এরূপ হচ্ছে" ইত্যাদি। আমাদের কোনো সভা-সেমিনারই মনে হয় এ ধরনের আলোচনা থেকে নিস্কৃতি পায় না। কিন্তু কখনো নিজের অবস্থা খতিয়ে দেখার ফুরসত পাই না। কত পরিবর্তন ঘটেছে আমার মধ্যে, কত করুণ হয়েছে আমার অবস্থা, কত ভুল-ভ্রান্তির শিকার আমি নিজে, কত সংস্কার আমার নিজের মধ্যে প্রয়োজন– এদিকে কেনোই ভ্রূক্ষেপ নেই। চলছে শুধু অন্যের সমালোচনা ফেনায়িত করার বিরামহীন কসরত। অন্যের দোষচর্চার ধার চলছে দুরন্তগতিতে। ফলে সকল আলোচনা-পর্যালোচনা পরিণত হচ্ছে সভা-সেমিনারের শোভা ও স্বাদ গ্রহণের জন্য। সমাজ সংস্কারের প্রকৃত ধারার প্রতি এক কদমও অগ্রসর হচ্ছে না।

সর্বাধিক পতিত ব্যক্তি

এক হাদীসে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন–

مَنْ قَالَ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ (صحيح مسلم، كتاب البر والصلة ٢٦٢٣)

যে বলবে, মানুষ ধ্বংস হয়ে গেছে, অন্যের উপর আপত্তি করে বলবে, তারা নষ্ট হয়ে গেছে, তারা অপসংস্কৃতির বিভীষিকায় নিমজ্জিত। সর্বাধিক ধ্বংসপ্রাপ্ত ওই ব্যক্তি নিজেই। কারণ, অন্যের উপর আপত্তি করার অর্থ বাস্তবেই সে যা বলছে, তার ভয় যদি তার অন্তরে থাকতো, তাহলে সর্ব প্রথম নিজেকে সংশোধন করার ফিকির করতো।

রুগ্ন ব্যক্তির অন্যের চিকিৎসা করার অবকাশ কোথায়?

যার পেটে ব্যথা, পেট মোচড়ে উঠে, অস্থির লাগে সে অপরের সর্দি কাঁশির কী খেয়াল করবে? আল্লাহ না করুন, যদি আমার পেটে প্রচণ্ড ব্যথা, তখন তো আমি নিজের চিন্তায়ই অস্থির থাকবো। আমার কষ্ট লাঘব করা এবং ব্যথা হয় নিরাময়ের ফিকিরেই তো আমি ব্যস্ত থাকবো। অন্যের অসুখ, অন্যের সাধারণ কষ্টের দিকে তাকানোর তখন অবকাশ কোথায়? বরং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, নিজের কষ্ট সাধারণ এবং অন্যের কষ্ট মারাত্মক হওয়া সত্ত্বেও নিজের কষ্ট তাকে এতটা মোহিত রাখে যে, অন্যের মারাত্মক কষ্টের প্রতি চোখ তুলেও তাকায় না।

কিন্তু তার পেটে তো ব্যথা নেই

আমার এক প্রিয় সহধর্মিনী ছিলো। তার পেটে ছিলো ব্যথা। ব্যথা খুব মারাত্মক ছিল না। তাকে ডাক্তার দেখানোর জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। লিফটে চড়ার সময় হুইল চেয়ারে বসা এক মহিলা দৃষ্টিগোচর হলো, তার হাত- পা ভাঙ্গা ও প্লাস্টার করা, বুক আগুনে পুড়ে গেছে। তার অবস্থা ছিল খুবই করুণ। আমার সহধর্মিনীকে শান্ত্বনা দিয়ে বললাম, দেখো, মহিলাটি কত নায়ক পরিস্থিতির শিকার, কত মারাত্মক কষ্টে সে নিমজ্জিত। মানুষ তাকে দেখে নিজের কষ্ট ভুলে গিয়ে আল্লাহর শোকর আদায় করে। তখন সে উত্তর দিলো, তার হাত পা-ভাঙ্গা হলেও পেটে তো আর ব্যথা নেই। আসলে আমার সহধর্মিনীর অনুভূতি ও বিশ্বাসে একথা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে,সর্বাধিক কষ্টের

রোগ পেটের ব্যথা। তাই অপরের পুড়ে যাওয়া চামড়া, ভাঙ্গা হাত-পা দেখেও নিজের কষ্টের কথা ভুলে যায়নি। কারণ, নিজের কষ্টের অনুভূতি পুরোপুরি তার আছে। তবে যার নিজের কষ্ট ও রোগের অনুভূতি নেই, তার কাছে অন্যের সাধারণ কষ্টও অনুভূত হয়।

মোটকথা,আমাদের মারাত্মক একটি ব্যাধি হলো, আমরা আত্মশুদ্ধির চিন্তা থেকে উদাসীন। অন্যের উপর অভিযোগ ও অন্যের সমালোচনা করার জন্য যেন আমরা সর্বদাই প্রস্তুত।

রোগের চিকিৎসা

তাই উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, হে মুমিনগণ! সর্বপ্রথম নিজের কথা ভাবো। আর তোমাদের যে আপত্তি-'অমুক নষ্ট হয়ে গিয়েছে, অমুক ধ্বংস হয়ে গেছে' মনে রেখো, তোমরা যদি সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত হও, তাহলে তাদের ভ্রষ্টতা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। প্রত্যেকের আমল তার সাথে যাবে। তাই নিজের ফিকির করো। তোমরা সকলেই আল্লাহ তা'আলার কাছে ফিরে যেতে হবে। সেখানে তিনি তোমাদেরকে জানাবেন, তোমাদের আমল বেশি ভালো ছিল, না অন্যের? কে জানে, যার সম্পর্কে অভিযোগ করছো, যার দোষ অন্বেষণে তুমি ব্যস্ত, তার কোনো কাজ আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রিয় হবে। এভাবে সে তোমাদেরকে ছাড়িয়ে যাবে।

সুতরাং মজা পাওয়ার জন্য, আসর জমানোর জন্য আমরা যেসব কথা-বার্তা বলে থাকি, তা সংশোধনের প্রকৃত পথ নয়।

আত্মসমালোচনার মজলিস

হ্যাঁ, কোথাও যদি কেবল এ কাজের জন্য মজলিস অনুষ্ঠিত হয় যে, 'আমাদের মাঝে কি কি দোষ আছে, তা সম্পর্কে আমাদের মাঝে আলোচনা হবে এবং লোকেরা সংশোধনের নিয়তে তাতে অংশগ্রহণ করবে, শুনবে এবং বুঝবে। অতঃপর তদনুযায়ী আমল করতে সচেষ্ট হবে। এ ধরনের মজলিস অনুষ্ঠিত হওয়া জায়েয।

মানুষের সর্বপ্রথম করণীয়

মানুষের সর্বপ্রথম করণীয় হলো, তার রাত-দিনের হিসাব নেয়া। তারপর দেখবে, আমি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অনুযায়ী এবং তাঁর বাতলানো পথ ও পদ্ধতি মোতাবেক কতটা কাজ করছি এবং কতটা কাজ তাঁর সন্তুষ্টি ও নির্দেশিত পদ্ধতির পরিপন্থী। যদি পরিপন্থী করে থাকি, তাহলে তা থেকে উত্তরণের উপায় কি? আল্লাহ তা'আলা আমাদের অন্তরে এই ফিকির সৃষ্টি করে দিন। তখনই তো সমাজ সংস্কারের প্রক্রিয়া ফলদায়ক হবে।

সমাজ কাকে বলে?

ব্যক্তির সমষ্টিগত নামই সমাজ। অতএব, যদি সমাজের প্রতিটি সদস্যের মাঝে আত্ম সংশোধনের চিন্তা চলে আসে, তাহলে গোটা সমাজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু প্রত্যেকেই যদি নিজের চিন্তা ছেড়ে অন্যের চিন্তায় মগ্ন হয়ে যায়, তাহলে পুরো সমাজ নষ্টই থেকে যাবে।

সাহাবায়ে কেরামের কর্মপদ্ধতি

সাহাবায়ে কেরামের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, তাঁদের প্রত্যেকের মাঝেই ফিকির ছিল, আমি কিভাবে ঠিক হয়ে যাবো, কিভাবে আমার ব্যাধি নিরাময় করবো। যেমন– আপনারা হযরত হানযালা (রা.) এর নাম অবশ্যই শুনেছেন, যিনি ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী। তিনি রাসূল (সা.) এর মজলিসে নিয়মিত উপস্থিত হতেন। রাসূল (সা.)-এর মজলিসে উপস্থিত হলে তাঁর কথা-বার্তা স্বাভাবিকভাবেই হানযালার হৃদয়কে প্রভাবিত করতো। সৃষ্টি হতো বিনয়, নম্রতা, আবেগ ও জযবা। একদিন তিনি অস্থির হয়ে চিৎকার করতে করতে মহানবী (সা.) এর দরবারে আঁছড়ে পড়লেন এবং আবেদন করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! (সা.) نَافَقَ حَنْظَلَةُ হানযালাহ মুনাফিক হয়ে গেছে।' রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন, 'কিভাবে মুনাফিক হয়ে গেছে?' হানযালাহ উত্তর দিলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! যতক্ষণ আপনার মজলিসে থাকি এবং আপনার কথা শুনি, ততক্ষণ হৃদয় বড় প্রভাবিত হয়। নিজের অবস্থা আরো উন্নত করার স্পৃহা জাগে। কিন্তু আপনার মজলিস থেকে বের হয়ে যখন পার্থিব কাজকর্মে জড়িয়ে পড়ি, তখন আপনার মজলিস থেকে অর্জিত সকল আবেগ-উদ্দীপনা চলে যায়। মুনাফিকী তো এটাই– ভেতরে একটা, বাইরে অন্যটা। তাই আমি ভয় পাচ্ছি,

আমি আবার মুনাফিক হয়ে গেলাম না তো?' রাসূল (সা.) সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'হানযালা! তুমি মুনাফিক হওনি। বরং এটা তো ক্ষণিকের ব্যাপার। মনের অবস্থা সব সময় এক রকম থাকে না। কখনো আবেগ-উদ্দীপনা বেশি থাকে, কখনো কম। এর থেকে এটা মনে করা যে, আমি মুনাফিক হয়ে গেলাম- সঠিক নয়।' [মুসলিম শরীফ, তাওবাহ অধ্যায়, হাদীস নং-২৭৫০]

হযরত হানযালাহ (রা.) এর মনে নিজের সম্পর্কে কল্পনা সৃষ্টি হলো যে, আমি মুনাফিক হয়ে গেছি। অন্য কাউকে তো তিনি মুনাফিক বলেননি। আত্মসমালোচনার তাড়নায় নিজেকে মুনাফিক ভেবে অস্থির। একেই বলে নিজেকে নিয়ে ভাবা-আমি আবার মুনাফিক হয়ে যাইনি তো?

হযরত হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা.)-এর বৈশিষ্ট্য

রাসূল (সা.) নিজের অনেক গোপন কথা হযরত হুযাইফাকে (রা.) জানিয়েছিলেন। তাঁর গোপনভেদীতে মুনাফিকদের পরিপূর্ণ তালিকাও ছিলো। মদীনায় কারা মুনাফিক এটা চিহ্নিত করার জন্য হযরত হুযাইফা (রা.) এত বড় নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন যে, মদীনায় কেউ ইন্তেকাল করলে সাহাবায়ে কেরাম লক্ষ্য করতেন, জানাযায় হযরত হুযাইফা (রা.) আছেন কি না? হযরত হুযাইফা (রা.) এর জানাযায় উপস্থিতি একথা বুঝিয়ে দিতো যে, এই ব্যক্তি মুমিন। আর কোনো জানাযায় তিনি উপস্থিত না হলে সাহাবায়ে কেরাম বুঝে নিতেন লোকটি মুনাফিক।

দ্বিতীয় খলিফার নিজের প্রতি নিফাকের আশঙ্কা প্রকাশ

হাদীসের কিতাবসমূহে আছে, হযরত উমর (রা.) যখন খলিফা হলেন, অর্ধ পৃথিবী যিনি শাসন করেছিলেন। অসৎ দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা যার দোররার ভয়ে তটস্থ থাকতো, তিনি খলিফা হওয়ার পর হুযাইফকে (রা.) তোষামোদ করে বলতেন, ' হুযাইফা! আল্লাহর ওয়াস্তে বলো, রাসূলুল্লাহ (সা.) তোমাকে মুনাফিকদের যে তালিকা দিয়েছেন, সেখানে খাত্তাবের ছেলে উমরের নাম নেই তো?

হযরত উমর ফারুক (রা.) এর মনে আশঙ্কা হচ্ছে, আমার নাম উক্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নয় তো? আমি আবার মুনাফিক হয়ে যাইনি তো?

অন্তরের কথাই প্রতিক্রিয়াশীল হয়

সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা ছিলো, প্রত্যেকেই চিন্তিত থাকতেন– আমার কোনো কাজ, আমার কোনো আমল, আমার কোনো কথা বা ওয়াদা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর হুকুমের পরিপন্থী নয় তো? এ ভাবনা নিয়ে যখন তাঁরা অন্য কাউকে সংস্কারমূলক কোনো কথা বলতেন, তখন অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল হতো। জীবনে পরিবর্তন চলে আসতো, বিপ্লব সৃষ্টি হতো। পৃথিবীর বুকে তাঁদের এই বিপ্লবের জ্বলন্ত প্রমাণও রয়েছে। আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) একজন প্রসিদ্ধ ওয়ায়েজ ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে লেখা হয়, তাঁর এককে ওয়াজে প্রায় নয়শ লোক তাঁর হাতে হাত রেখে তওবা করতো। একবার ওয়াজ করলেন তো সকলের হৃদয় কেড়ে নিলেন। তাঁর বয়ান যে খুব শক্তিশালী, আবেগপূর্ণ ও সাহিত্যসমৃদ্ধ ছিলো– তা নয়। বরং মূল ব্যাপার ছিলো, হৃদয়ের সকল আবেগ ও দরদ যখন মুখ দিয়ে বের হতো, তখন তা অন্যের হৃদয়েকেও প্রভাব সৃষ্টি করতো।

আমাদের অবস্থা

আমাদের অবস্থা হলো, আমি কাউকে একটি বিষয়ের উপদেশ দিচ্ছি। অথচ, তার উপর আমার নিজেরই আমল নেই। তাই এই উপদেশ অন্যের উপর প্রভাব সৃষ্টি করে না। সাময়িক প্রভাব সৃষ্টি করলেও তা স্থায়ী হয় না। কারণ, শ্রোতা যখন দেখবে, উপদেশদাতা নিজেই আমল করছে না, আমাকে যে উপদেশ দেয়া হচ্ছে যদি তা ভালো কাজ হতো, তাহলে অবশ্যই সে আমল করতো। এভাবে আমাদের উপদেশ-নসীহত বাতাসে হারিয়ে যায়, কোনো ক্রিয়া সৃষ্টি হয় না।

মহানবী (সা.)-এর নামায

মহানবী (সা.)-এর সীরাত বা আদর্শ যে তুফান সৃষ্টি করেছিল, শুধু তেইশ বছরের সময়সীমায় তা গোটা জাযীরায়ে আরবের রূপরেখা পাল্টে দিয়েছিল। বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল গোটা পৃথিবীর বুকে। এ বিপ্লব সৃষ্টির কারণ ছিল, উম্মতকে তিনি যে উপদেশ দিতেন; সর্বপ্রথম নিজে তার চেয়ে বেশি আমল করতেন। যথা– তিনি আমাকে-আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ো। অথচ তিনি আট ওয়াক্ত নামায পড়তেন। অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত নামায ছাড়াও

ইশরাক, চাশত এবং তাহাজ্জুদের নামায তিনি নিয়মিত পড়তেন। বরং তাঁর অবস্থা তো ছিল –

إذَا حَزَمَهُ أَمْرٌ صَلَّى (مشكاة،كتاب الصلوة، باب التطوع، حديث نمبر١٣٢٥)

অর্থাৎ– যখনই তিনি কোনো পেরেশানির সম্মুখীন হতেন, নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। আর আল্লাহর কাছে কাতর স্বরে দোয়া করতেন। তিনি ইরশাদ করেছেন–

جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ (نسائى،كتاب عشرة النساء)

অর্থাৎ– নামায আমার চোখের শীতলতা।

নবী করীম (সা.) এর রোযা

এমনিভাবে তিনি অন্যদেরকে বছরে এক মাস রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে তাঁর আমল ছিল, এমন কোনো মাস অতিবাহিত হত না, যাতে তিনি কমপক্ষে তিনটি রোযা না রাখতেন। কখনো তিনি তিনটির অধিকও রাখতেন।

অন্যদের ক্ষেত্রে তাঁর নির্দেশ হলো, ইফতারের সময় হলে বিলম্ব না করে ইফতার করে ফেলো। তিনি ইফতারবিহীন লাগাতার দু'টি রোযা একসাথে রাখাকে না জায়েয আখ্যা দিয়েছেন।

অবিচ্ছিন্ন রোযা রাখার নিষিদ্ধতা

কোনো কোনো সাহাবীকে তিনি দেখেছেন, 'সাওমে বেছাল' বা নিরবিচ্ছিন্ন রোযা রাখতে। তখন তিনি তাদেরকে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, তোমাদের জন্য 'সাওমে বেছাল' জায়েয নেই। তবে তিনি নিজে 'সাওমে বেছাল' রাখতেন, আর বলতেন, তোমরা আমার সাথে নিজেদেরকে তুলনা করো না। কারণ, আমার প্রভু আমাকে পানাহার করান। তোমাদের মাঝে এভাবে লাগাতার রোযা রাখার শক্তি নেই।' আমার মাঝে শক্তি আছে বিধায় আমি রাখি। প্রকারান্তরে তিনি অন্যের জন্য সহজপন্থা বলে দিয়েছেন– ইফতারের মধ্যে খুব পানাহার করো এবং পূর্ণরাত খাওয়ার অনুমতি রয়েছে।

[তিরমিযি, কিতাবুস সাওম, হাদীস নং-৭৭৮]

মহানবী (সা.) এর যাকাত

আমাদেরকে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, সম্পদের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করো। তাহলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু তাঁর নিজের অবস্থা ছিল, যত সম্পদ আসছে সবই সদকা করে দিচ্ছেন। একবারের ঘটনা, রাসূল (সা.) নামায পড়ানোর উদ্দেশ্যে জায়নামাযে গেলেন। ইতোমধ্যে ইকামত হয়ে গেলো। এখনই নামায আরম্ভ করবেন। হঠাৎ জায়নামায থেকে সরে ঘরে চলে গেলেন। অল্প কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে নামায পড়ালেন। এতে সাহাবায়ে কেরাম আশ্চর্যবোধ করে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজ আপনি এমন কাজ করেছেন, যা ইতিপূর্বে কখনো করেননি। এর কারণ কি? বিশ্বনবী (সা.) উত্তর দিয়েছেন, আমি ঘরে গিয়েছি, তার কারণ, যখন আমি জায়নামাযে দাঁড়িয়েছি তখন স্মরণ হলো, আমার ঘরে সাতটি দীনার আছে। মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়াবে আর তার ঘরে সাতটি দিনার থাকবে- এ ব্যাপারটিতে আমার খুব লজ্জা অনুভব হলো। তাই আমি এগুলো বিলিয়ে দিতে গেলাম। তারপর এসে নামায পড়ালাম।

আল্লাহর প্রিয় হাবীব (সা.) পরিখাও খনন করেছেন

আহযাব যুদ্ধের সময় পরিখা খনন করা হচ্ছিল। সাহাবায়ে কেরাম সকলেই খননের কাজে লেগে গেলেন। প্রিয়নবী (সা.) প্রধান সেনাপতি হওয়ার কারণে আরামের শয্যায় শুয়ে ছিলেন না। বরং অন্যান্যদের মতো তিনিও খননকাজে অংশগ্রহণ করেছেন। খননের জন্য অন্যান্যরা যতটুকু অংশ পেয়েছে, বিশ্বনবী (সা.) নিজের জন্যও তা-ই নির্দিষ্ট করলেন। এক সাহাবী বর্ণনা করেন, পরিখা খননের সময়টা ছিলো এক কঠিন সময়। পানাহারের ব্যবস্থা পরিপূর্ণভাবে ছিল না। ক্ষুধার তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে অস্থির হয়ে পেটে পাথর পর্যন্ত বেঁধেছিলাম।

পেটে পাথর বাঁধা

পেটে পাথর বাঁধার প্রবাদ আমরা কত শুনেছি। তবে কখনো দেখেনি। আল্লাহ তা'আলা যেন না দেখান। আমীন। একমাত্র ভুক্তভোগীই জানে এর যন্ত্রণা কত। মানুষ মনে করে পেটে পাথর বেঁধে কী লাভ? পাথর বাঁধলে কি ক্ষুধা চলে যায়? আসলে যখন প্রচণ্ড ক্ষুধা লাগে, ক্ষুধার তাড়নায় মানুষ তখন

দুর্বল হয়ে পড়ে। কোনো কাজ করতে পারে না। আর পাথর বাঁধলে কিছুটা ভারত্ব অনুভূত হয়। ফলে দাঁড়াতে পারে। অন্যথায় দুর্বলতার কারণে দাঁড়াতেও পারে না।

প্রিয়নবী (সা.)-এর পেটে দুই পাথর

এক সাহাবী বর্ণনা করেন, প্রচণ্ড ক্ষুধা সহ্য করতে না পেরে আমি আমার পেটে পাথর বেঁধেছিলাম। এ পরিস্থিতিতে নবীজির দরবারে এসে আরজ করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি ক্ষুধার তীব্রতায় পাথর বেঁধেছি। রাসূল (সা.) স্বীয় পেট থেকে জামা সরালেন। আমি লক্ষ্য করলাম, তাঁর পবিত্র পেটে দুটি পাথর বাঁধা।

এটাই সেই আদর্শ, যার শিক্ষা দেয়া হচ্ছে, যার তাবলীগ করা হচ্ছে, যার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। প্রথমে তো রাসূল (সা.) তার উপর নিজে পরিপূর্ণ আমল করে দেখিয়েছেন।

হযরত ফাতেমা (রা.) এর কঠোর পরিশ্রম

হযরত ফাতেমা (রা.)। যিনি জান্নাতী নারীদের সর্দার। একবার তিনি নবী কারীম (সা.) এর দরবারে উপস্থিত হলেন এবং নিজের হাত দেখিয়ে নিবেদন করলেন, আটা পিষতে পিষতে আমার হাতে দাগ বসে গেছে। পানির মশক বইতে বইতে বক্ষে দাগ পড়ে গেছে। ইয়া রাসূলাল্লাহ! খায়বার বিজয়ের পর সকল মুসলমানের মাঝে ঘরকন্যার কাজ সম্পাদনের জন্য গোলাম-বাদী বণ্টন করা হচ্ছে। তাই খেদমত করতে পারবে এমন একজন বাদী আমাকেও দিন। হযরত ফাতেমা (রা.) যদি কোনো খেদমতের বাদী পেতেন- আকাশ ভেঙ্গে পড়তো না। কিন্তু নবী কারীম (সা.) তাঁকে উত্তর দেন- ফাতেমা! যতক্ষণ পর্যন্ত সকল মুসলমানের একটা ব্যবস্থা না হবে, মুহাম্মদ ও তাঁর পরিবারের জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো গোলাম বা বাদী আসবে না। আমি তোমাকে তোমার কষ্টের বিনিময়ে গোলাম-বাদী থেকেও একটি উত্তম পরামর্শ দিচ্ছি। আর তা হচ্ছে, প্রত্যেক নামাযের পর সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার আর আল্লাহু আকবার ৩৪ বার পড়তে থাকো। [মুসলিম শরীফ খণ্ড-২, পৃ- ৩৫১]

এ কারণে একে অনেকে 'তাসবীহে ফাতেমী'ও বলেন। রাসূল (সা.) তাঁর কন্যা ফাতেমাকে (রা.) এই শিক্ষা দিয়েছেন। আর অন্যান্যদের ক্ষেত্রে তাঁর

আচরণ হলো, তিনি তাদের মাঝে গোলাম-বাদী, টাকা পয়সা দান করছেন- আর নিজের পরিবারে সাথে আচরণ এমন।

সুতরাং আবস্থা যখন এমন হবে যে, বক্তা নিজে তার কথায় অন্যদের তুলনায় অধিক আমলকারী হবে, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তার কথা ক্রিয়াশীল হবে। অন্যের হৃদয়ে তার কথা প্রভাব ফেলবে। মানুষের জীবনযাত্রা পাল্টে যাবে। জীবনের মাঝে সৃষ্টি হবে এক অন্যরকম বিপ্লব। এমন হওয়ার কারণেই তো প্রিয় নবী (সা.)-এর উপদেশবাণী সাহাবায়ে কেরামকে কোথা থেকে কোথা পৌঁছে দিয়েছিল!

৩০ শা'বান নফল রোযা রাখা

শাবানের ৩০ তারিখের ক্ষেত্রে বিধান হলো, ওই দিন রোযা রাখা যাবে না। কেউ কেউ এই ধারণা করে রোযা রাখে, আজ হয়তো রমজানের প্রথম দিন। হয়তো রমজানের চাঁদ উদিত হয়েছে। কিন্তু আমরা দেখি নি। তাই সতর্কতা অবলম্বন করতে গিয়ে শা'বানের ৩০ তারিখে রোযা রেখে ফেলে। অথচ রাসূলুল্লাহ (সা.) রমযানের সতর্কতায় ৩০ই শা'বান রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। আর এ রোযা রাখার নিষেধাজ্ঞা ওই ব্যক্তির জন্য, যে শুধু রমজানের সতর্কতার উদ্দেশ্য রোযা রাখে। যে সাধারণ নফল রোযা হিসেবে ৩০ই শাবান রোযা রাখে এবং রমজানের সতর্কতার নিয়ত তার নেই- তার জন্য এ দিনে রোযা রাখা জায়েয। (তিরমিযী শরীফ, কিতাবুস সাওম, অধ্যায় ৩)

ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) শাবানের ৩০ তারিখের রোযা রাখতেন। পাশাপাশি তিনি সর্বস্তরে ঘোষণা করে দিতেন, আজ কেউ রোযা রাখবে না। কারণ, সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে এই আশংকা থাকে যে, তাদের মনে রমজানের সতর্কতার নিয়ত এসে যাবে। আর তখন রোযা রাখা গুনাহ হবে। তাই তিনি কঠোরভাবে নিষেধ করে দিতেন।

হযরত থানভী (রহ.) এর সতর্কতা

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.), যার নাম আমরা প্রায়ই উল্লেখ করে থাকি। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলার তাওফিক দান করুন। আমীন। তিনি ফতওয়ার ক্ষেত্রে মানুষের সহজ দিকটার ফিকির করতেন, যাতে মানুষের কষ্ট না হয় এবং যথাসম্ভব সহজ হয়।

আজকাল বাজারে যেসব ফল-ফলাদি বিক্রি হয়; আপনারা আশা করি জানেন, তার অধিকাংশই এমন যে, ফুল আসে নি। আর এধরনের ফল বিক্রি করা শরীয়তে জায়েয নেই। রাসূল (সা.) এ ধরনের ফল ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন– যতক্ষণ পর্যন্ত ফল প্রকাশিত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বিক্রি করা জায়েয নেই। শরীয়তের এ বিধানের কারণে বাজারে প্রচলিত উল্লিখিত ফল ক্রয় করে খাওয়া জায়েয নেই বলে কোনো কোনো আলেম ফতওয়া দিয়েছেন। কিন্তু হযরত থানবী (রহ.) রায় প্রদান করেন, এ ধরণের ফল খাওয়া জায়েয আছে। অথচ তিনি নিজে সর্বদা এর থেকে বেঁচে থেকেছিলেন। জীবনভর কখনো বাজার থেকে এ ধরনের ফল ক্রয় করে খাননি। অন্যদেরকে খাওয়ার অনুমতি তো দিয়েছেন, কিন্তু নিজে সতর্কতাস্বরূপ খান নি। এরাই আল্লাহর খাঁটি বান্দা। অন্যদেরকে যে নসীহত করতেন, নিজে তার চেয়ে বেশি আমল করতেন। এই জন্যই তাদের কথা হৃদয়ে প্রভাব সৃষ্টি করতো।

সমাজ সংস্কারের পদ্ধতি

আমাদের ত্রুটি হলো, সংস্কারের যে প্রোগ্রাম শুরু করা হবে, যে ব্যক্তি, দল কিংবা সংগঠন এ উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসবে, তাদের মন-মস্তিষ্কে একথা বদ্ধমূল থাকবে যে, সব লোক খারাপ – তাদেরকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। নিজের ত্রুটির প্রতি একটুও মনোযোগ ও চিন্তা যায় না। তাই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ

'হে ঈমানদারগণ! নিজেদের খবর নাও। যদি তোমরা সত্য পথে চলে আসো, তাহলে ভ্রষ্ট ও ভুল পথে পরিচালিতরা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

সুতরাং শুধু মাহফিল জমানো ও পর্যালোচনার জন্য অন্যদের দোষচর্চা করায়ে কোনো লাভ নেই। বরং নিজের ফিকির করো এবং যথাসম্ভব আত্মশুদ্ধির কাজে নিয়োজিত হও। মূলত সমাজকে সংশোধন করার পথ ও পদ্ধতি এটাই। কারণ, সমাজ কাকে বলে? আমি, আপনি ও কিছুসংখ্যক মানবসদস্যের সমষ্টির নামই তো সমাজ। যদি প্রত্যেকে সর্বপ্রথম নিজের কথা ভাবে যে, আগে আমি ঠিক হয়ে যাবো, তাহলে ধীরে ধীরে সমাজ ঠিক হয়ে যাবে। এর বিপরীতে যদি আমি তোমাদের সমালোচনা করি, তোমার আমরা সমালোচনা কর আমি

তোমাদের দোষচর্চা করি, তোমরা আমার দোষচর্চা কর, এ পদ্ধতিতে কখনো সমাজ ঠিক হবে না। তাই বরং নিজের চিন্তা করো। তোমরা দেখতে পাচ্ছো, গোটা বিশ্বজুড়ে মিথ্যা চলছে। তোমরা বলো না- অন্য লোক সুদের কারবার করছে, তোমরা করো না। অন্যরা ঘুষ নিচ্ছে, তুমি নিও না। অন্যরা হারাম খাচ্ছে, তুমি খেওনা। কিন্তু এরতো কোনো অর্থ নেই যে, মজলিসে বলবে মানুষ মিথ্যা বলছে। তারপর নিজেই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মিথ্যায় ব্যস্ত থাকবে। সমাজ সংস্কারের এ পদ্ধতি সঠিক নয়। আল্লাহ তা'আলা এ চিন্তা আমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল করে দিন। প্রত্যেকেই যেন আত্মসংশোধনের কথা ভাবে।

নিজ কর্তব্য পালন করো

মনে রাখতে হবে, নিজের সংশোধনকল্পে আরো একটি বিষয় জরুরী। তাহলো, যেখানে নেক কথা পৌঁছানো আবশ্যক- সেখানে পৌঁছাতে হবে। এটা অপরিহার্য দায়িত্ব। এছাড়া সে হেদায়েতপ্রাপ্ত হিসেবে গণ্য হবে না এবং আত্মসংশোধনের দায়িত্বও পূর্ণ হবে না। এ কথাটিই হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি এই-

عَنْ اَبِىْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّكُمْ تَقْرَئُوْنَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَايَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ (سورة المائدة ١٠٥) وَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ النَّاسَ اِذَا رَاَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَاْخُذُوْا عَلٰى يَدَيْهِ اَوْ شَكَ اَنْ يَّعُمَّهُمُ اللّٰهُ بِعِقَابٍ مِّنْهُ.

'হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে লোক সকল! তোমরা এ আয়াতটি পড়- অর্থ হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের খবর নাও। তোমরা যদি সৎপথে চলো, তাহলে ভ্রষ্টরা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। এরপর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)কে বলতে শুনেছি। মানুষ যখন জালিমকে দেখেও তার হাত আঁকড়ে ধরে না, অচিরেই তারা আল্লাহর আযাবে নিপতিত হবে।

আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা

উল্লিখিত হাদীসটি হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) থেকে বর্ণিত। হাদীসে তিনি কুরআনের উক্ত আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা না বলতে লোকদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি হুযুর (সা.) এর একটি হাদীস ইরশাদ করেছেন, যার আলোকে এ আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। কেউ কেউ আয়াতটির ব্যাখ্যা বলে থাকেন, আল্লাহ তা'আলা যখন বলেছেন, নিজেদের খবর নাও, আত্মসংশোধনের ফিকির করো। ব্যস, আমাদের দায়িত্ব তো শুধু নিজেকে পরিশুদ্ধ করার চিন্তা করা। অন্যদেরকে ভুল কাজ করতে দেখলে তাদেরকে বাধা দেয়া, তাদের সংশোধনের ফিকির করা তো আমাদের দায়িত্ব নয়।

হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) বলেছেন, আয়াতের এ জাতীয় ব্যাখ্যা করা ভুল। কারণ, মানুষ যখন কোনো জালিমকে জুলুম করতে দেখবে আর তাকে জুলুম থেকে না ফিরাবে, এ অবস্থায় অচিরেই আল্লাহ তা'আলা শাস্তি আপতিত করবেন। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) বোঝাতে চাচ্ছেন, রাসূল (সা.)-এর এ হাদীস একথার প্রতি ইঙ্গিত করছে যে, তোমাদের সামনে জালিম যখন জুলুম করে, মজলুম যখন নির্যাতিত হয়, আর জালিমকে জুলুম থেকে বাঁধা দেয়ার শক্তি তোমাদের থাকে, এতদসত্ত্বেও তোমাদের চিন্তা হলো– তার জুলুম কিংবা তার ভুল বিচ্যুতি তো তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমি তো জুলুম করছি না। তাই তার কাজে আমার হাত না দেয়া চাই। তার থেকে আমার পৃথক থাকা চাই। তারা এই আয়াত দ্বারা দলিল পেশ করে যে, আল্লাহ তা'আলা তো নিজের চিন্তা করার কথা বলেছেন। যদি অন্য কেউ ভুল কাজ করে, তার এ ভুল কাজে আমার কোনো ক্ষতি হবে না। হযরত আবু বকর (রা.) বলেছেন, আয়াতের এ ব্যাখ্যা করা ভুল, যা এ হাদীসটি থেকে দৃশ্যত প্রমাণিত হয়। কারণ, আল্লাহ তা'আলা তো এও হুকুম করেছেন, যদি জালেমকে জুলুম থেকে বারণ করার শক্তি তোমাদের থাকে, তাহলে অবশ্যই জুলুম থেকে বারণ করতে হবে।

আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা

প্রশ্ন জাগে, তাহলে আয়াতের ব্যাখ্যা কি? আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, আয়াতে যে বলা হয়েছে, তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও, তাহলে কোনো ভ্রষ্টতা

তোমাদের অনিষ্ট সাধন করতে পারবে না। এর মূল বক্তব্য হলো, এক ব্যক্তি সাধ্য ও সামর্থানুসারে সৎ কাজের আদেশের কর্তব্য আদায় করেছে, তবুও অপর ব্যক্তি তার কথা মানে না। তখন তোমাদের উপর তার কোনো দায়দায়িত্ব বর্তাবে না। তার ভ্রষ্টতা তখন তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তোমরা নিজের চিন্তা কর, নিজের সবকিছু সঠিক রাখ। 'ইনশাআল্লাহ' আল্লাহ তা'আলার দরবারে এ ব্যাপারে তোমাদের কোনো জবাবদিহি করতে হবে না।

সন্তানের সংশোধনের প্রচেষ্টা কতদিন পর্যন্ত

সন্তানের কথাই ধরুন। সন্তানের ব্যাপারে শরীয়তের বিধান হলো, যদি মাতা-পিতা দেখে সন্তান ভুল পথে চলছে, তখন তাদের কর্তব্য হলো, তারা তাকে বারণ করবে, তাকে ভুল পথ থেকে ফিরিয়ে আনবে। যেমন কুরআন মজিদে ইরশাদ হয়েছে, 'তোমরা নিজেকে এবং পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।' মাতা-পিতার উপর এটি ফরয। এখন কেউ যদি তার পূর্ণ কৌশল ও শক্তি ব্যয় করা সত্ত্বেও সন্তান তার কথা না মানে, তখন সে ব্যক্তি মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট শাস্তিযোগ্য হবে না। হযরত নূহ (আ.) তাঁর ছেলেকে দাওয়াত দিয়েছিলেন, বুঝিয়েছিলেন, কিন্তু সে ঈমান গ্রহণ করেনি। দাওয়াতের হক তাঁর চেয়ে বেশি কে আদায় করেছে? তবুও সে ঈমান আনেনি। তাই এর জন্য হযরত নূহ (আ.) কে জবাবদিহি করতে হবে না।

এক ব্যক্তির বন্ধু ভুল পথে চলছে, অন্যায় কাজে লিপ্ত রয়েছে। আর এ ব্যক্তি তার সাধ্যানুযায়ী আন্তরিকতার সাথে ভালোবাসা দিয়ে তার বন্ধুকে বুঝাতে থাকে। বোঝাতে বোঝাতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে; কিন্তু সে বন্ধু ভুল পথ থেকে ফিরে আসে না। এখন এর দায়দায়িত্ব আর বন্ধুর কাঁধে বর্তাবে না।

নিজেকে ভুলো না

এ প্রসঙ্গে আল্লামা নববী (রহ.) একটি আয়াত উদ্ধৃত করেছেন–

أَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ (سورة البقرة ٤٤)

আয়াতটিতে আল্লাহ তা'আলা ইহুদিদেরকে সম্বোধন করে বলেন, তোমরা অন্যদেরকে সৎ কাজের আদেশ করো, আর নিজেদেরকে ভুলে যাও; অথচ

তোমরা কিতাব তেলাওয়াত করো, অর্থাৎ তোমরা তাওরাতের আলেম। যে কারণে লোকেরা তোমাদের কাছে আসে। এ হুকুমটি যদিও ইহুদিদের ক্ষেত্রে ছিলো, কিন্তু মুসলমানদের জন্য তো তা অবশ্যই প্রযোজ্য হবে। যে ব্যক্তি অন্যদেরকে নসীহত করে, তার উচিত সর্বপ্রথম উক্ত উপদেশ তার নিজের ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করা। আমি আগেও বলেছি, যে ব্যক্তি কোনো খারাপ কাজে লিপ্ত, সে তাবলীগ করবে না, অন্যকে নসীহত করবে না– দাওয়াতের ব্যাপারে বিধান এমন নয় বরং বিধান হলো– অবশ্যই নসীহত করতে হবে। তবে নসীহত করার সময় ভাবতে হবে; আমি যখন অন্যদের নসীহত করছি, এ নসীহত আমাকেও মানতে হবে। নসীহতের সময় নিজের কথা ভুলে গেলে চলবে না। মনে করবে না, এ নসীহত অন্যের জন্য, বরং খেয়াল রাখতে হবে, এ নসীহত আমার জন্যও, আমাকেও এর উপর আমল করতে হবে।

আলোচক ও বক্তাদের জন্য সতর্কবাণী

উক্ত আয়াতটি উল্লেখ করার পর আল্লামা নববী (রহ.) একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, যাতে অত্যন্ত কঠোর বাণী উচ্চারণ করেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা এর লক্ষ্য হওয়া থেকে আমাদের সকলকে হেফাযত করুন। আমীন।

হাদীসটি এই–

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بِنِ حَارِثَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ يُؤْتٰى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقٰى فِى النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْطَابُ بَطْنِهِ فَيَدُوْرُ كَمَا يَدُوْرُ الْحِمَارُ فِى الرَّحَا فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُوْلُوْنَ يَا فُلَانُ مَالَكَ؟ أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهٰى عَنِ الْمُنْكَرِ؟ فَيَقُوْلُ بَلٰى كُنْتُ اٰمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَا اٰتِيْهِ وَاَنْهٰى عَنِ الْمُنْكَرِ وَاٰتِيْهِ (البداية ج ١ص ١٨٧)

'হযরত উসামা ইবনে যায়েদ ইবনে হারেসা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। আগুনে পড়তেই প্রচণ্ড উত্তাপের কারণে তার নাড়ি ভুঁড়ি বেরিয়ে আসবে এবং গাধার চাক্কির পাশে ঘুর্ণনের ন্যায়

সে তার নাড়িভুড়ি নিয়ে ঘুরতে থাকবে। (তৎকালে একটি বড় চাকা হতো, সে চাকায় গাধাকে বেঁধে দেয়া হতো, গাধা তাকে ঘোরাতো) জাহান্নামীরা যখন এ দৃশ্য দেখবে, তারা তার আশে-পাশে একত্রিত হয়ে যাবে। জিজ্ঞেস করবে, তোমার এ শাস্তি কেন? তুমি তো সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করতে। সে উত্তরে বলবে, হ্যাঁ, আমি সৎকাজের আদেশ দিতাম; কিন্তু নিজে আমল করতাম না। অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতাম; কিন্তু নিজে অসৎ কাজ করতাম। এ কারণেই আজ আমার এই পরিণতি।

হাদীসটি যখন পড়ি, তখন ভয়ে কেঁপে উঠি। যারা সৎ কাজের আদেশ ও ওয়াজ নসীহত করেন, তাদের জন্য এটা বড় ভয়ানক কথা। আল্লাহ তা'আলা এর লক্ষ্য হওয়া থেকে আমাদেরকে হেফাযত করুন। আমীন।

প্রদীপ থেকে প্রদীপ জ্বলে

মোটকথা, মানুষ যদি নিজের চিন্তা না করে, শুধু অন্যের সংশোধনের ভাবনায় ব্যস্ত থাকে, অপরের ছিদ্রান্বেষণে লিপ্ত থাকে, তখন সংস্কারের পরিবর্তে সমাজে ধ্বংসের দ্বার উন্মোচিত হবে। সৃষ্টি হবে মহা ফ্যাসাদ। যা আজ আমরা দেখতেই পাচ্ছি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের মনে এ ফিকির ঢেলে দিন, আমরা সকলেই নিজেদের দোষ সম্পর্কে সচেতন হই, হিসেব করি, আমরা কি কি ভুল কাজে লিপ্ত। নিজেদের ভুল সংশোধনের চিন্তায় নিমগ্ন হই। চাই দশ পনেরো কিংবা বিশ বছরের জীবন অবশিষ্ট থাকুক। অবশেষে সকলেই তো কবরে যেতে হবে। স্বীয় কৃতকর্মের জবাবদিহি করতে হবে। তাই জবাবদিহিতার কথা সামনে রেখে জীবনের ও বর্তমান অবস্থার হিসেব লাগাতে হবে। যেখানে যেখানে ভুল ধরা পড়বে, তা সংশোধনের পথ খুঁজে বের করতে হবে। অতঃপর কোনো সংগঠন বা দল যদি তৈরি না করেও ন্যূণতম একজন মানুষও যদি নিজেকে পরিশীলিত করে এবং সরল পথে এসে যায়,তাহলেও কুরআনে কারীমের এ বিধানের উপর আমল হয়ে যাবে। এক থকে দুই, দুই থেকে তিন, প্রদীপ থেকে প্রদীপ জ্বলতে থাকবে। এভাবে দ্বীনের এ পদ্ধতি অন্যের নিকটও পৌঁছে যাবে।

আল্লাহ পাক আমাদের হৃদয়ে এ চিন্তা সৃষ্টি করে দিন। আত্মসংশোধনের সাহস ও যোগ্যতা দান করুন। এ পথে চলার তাওফীক দান করুন, আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

বড়দের মান্য করা এবং ভদ্রতার দাবি

সম্মান প্রদর্শনের দাবি হলো, বড়রা কোনো কাজের নির্দেশ দিলে তা পালন করা, যদিও তা ভদ্রতা পরিপন্থী হয় এবং ভদ্রতার দাবিমতে যদিও তা পালন করা উচিত নয়। কিন্তু বড় যেহেতু নির্দেশ দিয়েছেন, তাই তা মেনে চলো। কারণ ভদ্রতার চেয়েও নির্দেশ পালনের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ।'

বড়দের মান্য করা এবং ভদ্রতার দাবি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا۔ اَمَّا بَعْدُ!

عَنْ اَبِی الْعَبَّاسِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَغَهٗ اَنَّ بَنِیْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَرٌّ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فِیْ اُنَاسٍ مَّعَهٗ فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَانَتِ الصَّلٰوةُ۔ (صحیح بخاری، کتاب الاذان، باب من دخل لیؤم الناس، حدیث نمبر ۶۸۴)

হাম্‌দ ও সালাতের পর–

بَابُ الْاِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ

তথা মানুষের মাঝে মীমাংসা সৃষ্টি করা সম্পর্কে আলোচনা চলছে। এই অধ্যায়ের তিনটি হাদীস পূর্বেও আলোকপাত হয়েছে। চলমান হাদীসটি অধ্যায়ের শেষ হাদীস। হাদীসটি কিছুটা বিস্তীর্ণ। তাই সর্বপ্রথম তার তরজমা ও ব্যাখ্যা উপস্থাপন করছি।

মানুষের মাঝে মীমাংসা সৃষ্টি

হযরত সাহল ইবনু সা'দ আসসা'ঈদী (রা.) বলেছেন, 'রাসূল (সা.) একদা জানতে পারলেন যে, বনু আমর ও ইবনে আউফ পরস্পরের মাঝে তুমুল ঝগড়া শুরু হয়েছে। রাসূল (সা.) এ ঝগড়া মিটমাট করে দেয়ার লক্ষ্যে তাদের মাঝে গেলেন। সঙ্গে কিছু সাহাবাকেও নিয়ে গেলেন, যেন মীমাংসাকর্মে তাঁকে সহযোগিতা করতে পারেন। সেখানে দীর্ঘ কথাবার্তার প্রয়োজন হয়। এমনকি নামাযের সময় চলে আসে। তথা মসজিদে নববীতে গিয়ে নবীজি যে সময়টিতে নামায পড়াতেন সেই সময় চলে আসে। কিন্তু যেহেতু তিনি মীমাংসাকার্য এখনো শেষ করতে পারেন নি, তাই মসজিদে নববীতেও যেতে পারলেন না।

হাদীসটি এখানে উল্লেখ করার দ্বারা একথা বোঝানো উদ্দেশ্য যে, রাসূল (সা.) মানুষের মাঝে ঝগড়া ফ্যাসাদ মিটানো এবং পরস্পর সম্প্রীতি সৃষ্টি করার ব্যাপারে এত বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন এবং এ বিষয়ে এত বেশি সময় ব্যয় করেছেন, এমনকি এ কারণে তিনি নামাযের নির্দিষ্ট সময় চলে আসার পরেও মসজিদে যেতে পারেন নি।

বর্ণনাকারী বলেন, নবীজির মুয়াজ্জিন হযরত বিলাল (রা.) যখন দেখলেন, নামাযের সময় চলে আসার পরও হুযূর (সা.) এখনো আসেন নি, তাই তিনি হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এর নিকট গিয়ে আরজ করলেন, হে আবু বকর সিদ্দিক (রা.) নামাযের সময় উপস্থিত; অথচ রাসূল (সা.) এখনো আসেন নি। মানুষ নামাযের অপেক্ষায় আছে, হতে পারে নবীজির আসতে আরো কিছু দেরি হবে। তাই আপনি ইমামতি করবেন কি? সিদ্দিকে আকবর (রা.) উত্তর দিলেন, রাসূল (সা.) এর যখন আরো বিলম্ব করার সম্ভাবনা আছে, তাহলে যদি বলো, আমরা নামায পড়ে নিতে পারি। অতঃপর হযরত বিলাল 'আল্লাহু আকবার' বলে উঠলেন আর হযরত আবু বকর (রা.) ইমামতির স্থানে দাঁড়িয়ে গেলেন। আবু বকর (রা.) যখন 'আল্লাহু আকবার' বলে নামায শুরু করলেন, অবশিষ্টরা তাঁর ইকতিদা করলেন। ইতিমধ্যে হুযূর (সা.) তাশরীফ আনলেন এবং তিনিও আবু বকরের ইকতিদা করে কাতারের একপাশে দাঁড়িয়ে গেলেন। মানুষ যখন দেখলো, নবীজি এসেছেন অথচ আবু বকর (রা.) এখনও জানেন না, আবু বকরকে তো এখন জানানো উচিত, যেন তিনি পেছনে এসে ইমামতির জন্য হুযূর (সা.) কে সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে পারেন। সেই সময়ে এ বিষয়ে যেহেতু

মানুষের মাসআলা জানা ছিল না, তাই তারা তালি বাজিয়ে আবুবকরকে সতর্ক করার চেষ্টা শুরু করলো। কিন্তু হযরত আবু বকর তো নামায শুরু করলে অন্য জগতে চলে যেতেন, ডানে-বামে কি হচ্ছে সেই খবর তাঁর থাকতো না। তাই প্রথমে একজন তালি বাজানোর পরও তাঁর কানে যায়নি। তখনও তিনি নামাযেই ব্যস্ত ছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম যখন দেখলেন, এক-দু'জনের তালিতে কাজ হচ্ছে না, তাই তারা কয়েকজন মিলে আরো জোরে তালি বাজাতে লাগলেন। এতক্ষণে আবু বকর (রা.) এর বোধোদয় হলো এবং আড়চোখে ডানে-বামে তাকালেন। তখনই দেখতে পেলেন, হুযূর (সা.) এসেছেন। কাতারের মাঝে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। রাসূল (সা.)কে দেখামাত্র আবু বকর (রা) পেছনের দিকে সরে যেতে আরম্ভ করলেন। এই অবস্থায় হুযূর (সা.) তাকে ইঙ্গিতে বোঝালেন যে, পেছনে চলে আসার প্রয়োজন নেই, আপন অবস্থানে দাঁড়িয়ে থেকে নামায শেষ কর। এতদসত্ত্বেও হযরত আবু বকর (রা.) রাসূল (সা.) এর সামনে দাঁড়িয়ে ইমামতি করার সাহস পেলেন না। তাই উল্টো পদক্ষেপে পেছনের দিকে আসতে আসতে কাতারের মাঝে দাঁড়িয়ে গেলেন। তারপর হুযূর (সা.) অগ্রসর হয়ে ইমামতি করলেন এবং অবশিষ্ট নামায শেষ করলেন।

ইমামের মনোযোগ আকর্ষণ করার পদ্ধতি

নামায শেষে হুযূর (সা.) সকলের প্রতি সম্বোধন করে বললেন, 'নামাজের মাঝে কোনো বিষয় দেখা দিলে তোমরা তালি বাজানো আরম্ভ কর। এটা কি ধরনের পদ্ধতি? এটা তো নামাযের মর্যাদা পরিপন্থী। তাছাড়া তালি বাজানো তো মহিলাদের জন্য বৈধ হতে পারে। অর্থাৎ এমনিতে তো মহিলারা জামাত করা উচিত নয়। যদিও করে অথবা যদি তারা পুরুষের জামাতে শামিল হয় আর তখন কোনো ব্যাপারে ইমামের মনোযোগ আকর্ষণ করার প্রয়োজন হয়, এক্ষেত্রে তাদের প্রতি নির্দেশ হলো, হাতের উপর হাত মেরে তালি বাজাবে। তারা নামাযের মাঝে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، سُبْحَانَ اللّٰهِ বলা উচিত নয়। কারণ, এরূপ করলে তাদের স্বর পুরুষদের কানে পৌছবে। অথচ তাদের স্বরও পর্দার শামিল। কিন্তু পুরুষদের ক্ষেত্রে অনুরূপ কোনো ঘটনা ঘটলে বিধান হলো, তারা 'সুবহানাল্লাহ' অথবা 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে ইমামের মনোযোগ আকর্ষণ করবে। যেমন ইমাম যদি বসার স্থলে দাঁড়িয়ে যেতে চান অথবা দাঁড়ানোর স্থলে

যদি বসে যান, তাহলে মুক্তাদিরা 'সুবহানাল্লাহ' অথবা 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে ইমামের মনোযোগ আকর্ষণ করবে। অনেক সময় দেখা যায়, ইমাম সাহেব সশব্দে ক্বিরাত পড়ার স্থলে নিঃশব্দে পড়া শুরু করেছেন, তখনও এই একই বিধান প্রযোজ্য। অর্থাৎ মুক্তাদিরা 'আলহামদুলিল্লাহ' 'সুবহানাল্লাহ' বলে ইমাম সাহেবের মনোযোগ আকর্ষণ করবে। মোটকথা, নামাযে এরূপ কোনো প্রয়োজন দেখা দিলে হুযূর (সা.) বলেছেন, তখন তোমরা তালি বাজিয়ো না, বরং 'সুবহানাল্লাহ' বলবে।

আবু কুহাফার ছেলের এই স্পর্ধা নেই

অতঃপর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এর দিকে ফিরে রাসূল (সা.) বললেন, হে আবু বকর, আমি তো ইঙ্গিতে আপনাকে পেছনে না আসার জন্য বলেছিলাম। ইঙ্গিত করেছিলাম, আপনি ইমামতি চালিয়ে যান, তারপরেও আপনি পেছনে চলে আসলেন এবং ইমামতি করার ব্যাপারে সংকোচবোধ করলেন। আপনি এমন করলেন কেন? উত্তরে হযরত আবু বকর (রা.) বিস্ময়কর বাক্য উচ্চারণ করেছেন তিনি বললেন—

مَا كَانَ لِابْنِ اَبِىْ قُحَافَةَ اَن يُّصَلِّىَ بِالنَّاسِ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবু কুহাফার পুত্রের এই স্পর্ধা ছিলো না যে, রাসূল (সা.) এর উপস্থিতিতে মানুষের ইমামতি করবে।' আবু কুহাফা হযরত আবু বকরের পিতার নাম। তাহলে বক্তব্য দাঁড়ায়, আমার এত বড় স্পর্ধা ছিল না যে, আপনি আছেন আর আমি ইমামের স্থানে দাঁড়িয়ে থাকবো। আপনি যখন ছিলেন না, তখন ছিলো ভিন্ন কথা। কিন্তু আপনি চলে আসার পর ইমামতি চালু রাখার মত দুঃসাহস আমার ছিলো না। তাই পেছনে সরে এসেছি। হযরত আবু বকরের এই উত্তর শুনে মহানবী (সা.) আর কোনো প্রশ্ন করলেন না। তিনি নীরব থাকাই সমীচিন মনে করলেন।

আবু বকর (রা.) এর মর্যাদা

উক্ত ঘটনা দ্বারা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এর মর্যাদা কিছুটা অনুমান করা যায়। তাঁর হৃদয়ে মহানবী (সা.) এর প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা এত বেশি

প্রোথিত ছিল, যার কারণে তিনি এমন কথা বলতে পেরেছেন, মহানবী (সা.) এর সম্মুখে ইমামতি করার সাহসটুকু পর্যন্ত তিনি করলেন না।

আদবের চেয়েও নির্দেশের গুরুত্ব বেশি

এ সুবাদে একটি মাসআলা ও শিষ্টাচারের কথা বলছি, যা নবীজির সুন্নাতও বটে। আপনারা প্রসিদ্ধ একটি প্রবাদ হয়তো শুনেছেন যে,

اَلْأَمْرُ فَوْقَ الْأَدَبِ

আদবের চেয়ে আদেশ বড়।' কথা কাউকে সম্মান করার অর্থ হলো তার নির্দেশ পালন করা। যদিও তা আদব পরিপন্থী হয়। আদবের দাবি হলো নির্দেশিত কাজটি না করা। কিন্তু যেহেতু বড় মানুষের আদেশ, তাই পালন করতেই হবে। তাহলেই হবে বড়র প্রতি প্রকৃত সম্মান প্রদর্শন। বিষয়টি অত্যন্ত নাজুক। অনেক ক্ষেত্রে আমল করা মুশকিল হয়ে পড়ে। কিন্তু দ্বীনের প্রতি যত্নশীল সকল বুযুর্গের এমনই নিয়ম ছিল। তাঁদেরকে বড় কেউ কোনো আদেশ করলে তা পালন করতেন। এমন পরিস্থিতিতে আদবের প্রতি তাকাতেন না।

বড়দের আদেশ মেনে চলুন

মনে করুন, একজন বড় বুযুর্গ বিশেষ কোনো আসনে বসে আছেন। হয়তো তিনি খাটে উপবিষ্ট। এক লোক বুযুর্গের চেয়ে ছোট। বুযুর্গ আগন্তুককে বললেন, ভাই, তুমি এখানে চলে আসো, আমার কাছে বসো, তখন বুযুর্গের কথামত তাঁর সঙ্গে বসতে হবে। যদিও তাঁর মত বুযুর্গের সঙ্গে খাটে বসা আদব পরিপন্থী। এমন হুকুম মান্য করা যদিও আদবের অনুকূলে নয়, তবুও মানতে হবে। কারণ, এটি বড়'র নির্দেশ। এ নির্দেশ পালন করতে মন সায় না দিলেও পালন করতে হবে। তবেই হবে বড়কে সঠিকভাবে সম্মান প্রদর্শন। তাছাড়া আদবের চাইতে আদেশের গুরুত্ব অধিক।

দ্বীনের সার মেনে চলার মধ্যেই

আমি আগেও বহুবার বলেছি, দ্বীন মানার যিন্দেগির নাম। বড়দের নির্দেশ মেনে চলতে হবে, তাদের অনুগত হতে হবে। আল্লাহর নির্দেশমত চলতে হবে। মহানবী (সা.) এর হুকুমমাফিক এবং তাঁর ওয়ারিসগণ তথা উলামায়ে কেরামের নির্দেশনা মাফিক চলতে হবে। তারা যা বলেন, তা-ই মানতে হবে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে শিষ্টাচার পরিপন্থী মনে হলেও তাঁদের আদেশ-নিষেধই অগ্রগণ্য।

আব্বাজানের মজলিসে আমার উপস্থিতি

আব্বাজানের মজলিস বসতো সপ্তাহের প্রতি রোববার। কারণ, তখনকার দিনে সরকারী ছুটি ছিল প্রতি রোববার। এটি শেষ মজলিসের ঘটনা। এরপর আব্বাজানের আর কোনো মজলিস হয়নি। পরবর্তী মজলিসে আসার পূর্বেই তিনি ইন্তেকাল করেছেন। আব্বাজান যেহেতু তখন অসুস্থ ও শয্যাশায়ী ছিলেন, তাই তাঁর রুমে সব সময় লোকজনের আসা-যাওয়া লেগেই থাকতো। আব্বাজান খাটে থাকতেন আর লোকজন গিয়ে সামনে নিচে এবং সোফার উপর বসে যেতো। ওই দিন অনেক লোকের সমাগম হয়েছিল বিধায় রুম একেবারে ভরপুর ছিলো। কেউ কেউ তখন দাঁড়িয়েও ছিল। আমি সেদিন একটু বিলম্বে পৌঁছলাম। আব্বাজান আমাকে দেখেই বললেন, তুমি আমার নিকট চলে আসো। কিন্তু এত লোককে ডিঙ্গিয়ে আমি কীভাবে তাঁর নিকট যাবো। বিধায় একটু সংকোচবোধ করতে লাগলাম। যদিও আমি জানতাম, শিষ্টাচার পরিপন্থী বিষয়েও বড়দের নির্দেশ মানতে হয়, তবুও কেন যেন আমার দ্বিধাবোধ হলো। আব্বাজান এই অবস্থা দেখে পুনরায় বললেন, তুমি আমার নিকট চলে আসো, তোমাকে একটি গল্প শোনাবো। অবশেষে আমি কোনোমতে আব্বাজানের নিকট গিয়ে বসে পড়লাম।

হযরত থানভী (রহ.) এর মজলিসে আব্বাজানের উপস্থিতি

আব্বাজান বলতে লাগলেন, একবার হযরত থানভী (রহ.) এর দরবারে মজলিস চলছিলো। সেখানেও অনুরূপ ব্যাপার ঘটলো। ছোট্ট কামরা, সংকীর্ণ জায়গা আর মানুষ কানায় কানায় পূর্ণ। অথচ আমি পৌঁছলাম দেরি করে। হযরত আমাকে দেখে বললেন, আসো, আমার নিকট চলে আসো। আমি তখন এত লোকের মাঝখান দিয়ে হযরতের নিকট কিভাবে পৌঁছবো এ দ্বিধা-সংকোচে পড়ে গেলাম। হযরত পুনরায় আমাকে বললেন, আমার কাছে চলে আসো তোমাকে একটি গল্প বলবো। আব্বাজান বলেন, অতঃপর আমি কোনোভাবে হযরতের নিকট পৌঁছলাম। হযরত আমাকে এই গল্পটি শোনালেন।

আলমগীর ও দারাশাকুর মাঝে সিংহাসনের ফয়সালা

মোঘল সম্রাট আলমগীর (রহ.) এর পিতার ইন্তেকালের পর স্থলাভিষিক্তের বিষয়টি দেখা দিলো। আলমগীরগণ ছিলেন দুই ভাই। অপর ভাইয়ের নাম ছিল

দারাশাকু। তারা পরস্পর ছিল সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বী। উভয় ভাই ছিলেন সিংহাসনের প্রত্যাশী। তাদের সময়ে একজন বুযুর্গ ছিলেন। উভয় ভাইয়ের ইচ্ছে হলো বুযুর্গের নিকট থেকে নিজের জন্য দোয়া নেয়ার। প্রথমে গেলেন দারাশাকু। বুযুর্গ তখন নিজ আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি দারাশাকুকে বললেন, আসো, এখানে খাটের উপর আমার নিকট বসো। দারাশাকু উত্তর দিলেন, আমি নিচেই বসি; আপনার সামনে আপনারই খাটের উপর বসার দুঃসাহস আমার নেই। বুযুর্গ পুনরায় বললেন, আমি তোমাকে ডাকছি, তুমি আসো, এখানে আমার পাশে বসো। বুযুর্গের কথা দারাশাকু তবুও মানলো না, সে নিচেই বসে রইলো। অবশেষে বুযুর্গ বললেন, আচ্ছা, তোমার মর্জি। এই বলে তিনি তাকে যা নসীহত করার ছিলো করে দিলেন। উপদেশান্তে দারাশাকু চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পর আসলে আলমগীর। তিনি এসে যখন নিচে বসতে উদ্যত হলেন তখন বুযুর্গ বললেন, তুমি নিচে বসো না, বরং আমার নিকট এসে বসো। আলমগীর বুযুর্গের নির্দেশ শুনে তৎক্ষণাৎ গিয়ে উপরে উঠে বসে পড়লেন তারপর বুযুর্গের উপদেশ শুনলেন এবং নিজ গন্তব্যের পথে পা বাড়ালেন। উভয়ে বিদায় নেয়ার পর বুযুর্গ উপস্থিত লোকজনকে বললেন, তারা নিজেদের ব্যাপারে নিজেরাই তো ফয়সালা করে নিলো। দারাশাকুকে আমি সিংহাসন দিতে চেয়েছি, সে নিতে অস্বীকার করলো। আর আলমগীরকে দেয়ার পর সে তা লুফে নিল। সুতরাং ফয়সালা হয়ে গেছে। সিংহাসনের উপযুক্ত আলমগীরই। শেষ অবধি সিংহাসন আলমগীরের ভাগ্যেই জুটলো।

ঘটনাটি হযরত থানভী (রহ.) আব্বাজানকে শোনালেন। [মাওয়ায়েযে হযরত থানভী (রহ)]

ছলচাতুরি করা উচিত নয়

এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। আদব তো এটাই, বড়রা কোনো কাজের আদেশ করলে ছলচাতুরি করা উচিত নয়। তখন সম্মানের দাবি এটাই যে, বড়দের আদেশ পালনার্থে বসে পড়া। কারণ, আদেশ পালন করা ভদ্রতা প্রদর্শনের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

বুযুর্গদের জুতা বহন করা

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, কোনো বুযুর্গের জুতা বহন করার আশা কেউ কেউ করে। যদি ওই বুযুর্গ দৃঢ়তার সাথে বলেন, এটা আমার পছন্দ নয়। তখন সম্মান প্রদর্শনের দাবি হলো জুতা বহন না করা। অনেকে এসময় জুতা নিয়ে টানা-হেঁচড়া শুরু করে। এটা বুযুর্গকে সম্মান করা নয়। কারণ, প্রবাদ আছে—

الْأَمْرُ فَوْقَ الْأَدَبِ

নির্দেশ মানা আদবের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। হ্যাঁ, এরূপ ক্ষেত্রে দু'-একবার বলে দেখা যায়, 'হযরত, আমাকে খিদমতটুকুর সুযোগ দিন। এতে কোনো সমস্যা হবে না।' তবে নির্দেশ দিয়ে দিলে তা মানতেই হবে এটি সর্বাবস্থায় বিধান। সাহাবায়ে কেরামের অভ্যাসও এমনই ছিল।

সাহাবায়ে কেরামের দু'টি ঘটনা

হযরত আবু বকর (রা.) এর যে ঘটনাটি আমরা উপরে উল্লেখ করেছি, অর্থাৎ রাসূল (সা.) তাঁকে বলেছিলেন, স্বস্থানে দাঁড়িয়ে থাকুন। তবুও তিনি পেছনে সরে আসলেন। নির্দেশ না মেনে বরং আদবের দাবি পূরণ করলেন। সাহাবায়ে কেরামের গোটা জীবনীতে এরূপ ঘটনা মাত্র দু'টি পাওয়া যায়। একটি তো এটি। অপরটি হযরত আলী (রা.) এর।

আল্লাহর কসম! মুছবো না

হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়ে নবী করীম (সা.) এর কাফিরদের মাঝে যে সন্ধিপত্রটি লিখা হয়, তা লিখার জন্য তিনি হযরত আলী (রা.) কে ডেকে বললেন, 'সন্ধিপত্র লিখো।' নির্দেশ পেয়ে হযরত আলী (রা.) প্রথমেই লিখলেন, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। এতে কাফিরদের পক্ষের লোক আপত্তি করে বসলো। সে বলল, "সন্ধিপত্রটি যেহেতু আমাদের মাঝে আর তোমাদের মাঝে হচ্ছে, তাই আমরা এখানে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' লিখতে দিবো না। বরং শুরুতে এমন একটি বাক্য লিখতে হবে, যা উভয় পক্ষের জন্যই যুক্তিযুক্ত। সুতরাং তোমাদের এ বাক্যটি মুছে ফেলো এবং তদস্থলে লিখো, 'বিসমিকাল্লাহুম্মা অর্থাৎ হে আল্লাহ, আপনার নামে শুরু করছি।' জাহিলিয়াত

Contents

যুগে কোনো কাজ আরম্ভ করার পূর্বে এ বাক্যটিই বলে আরম্ভ করা হতো। কাফির পক্ষের এ আপত্তি শুনে হুযূর (সা.) বললেন, 'আমাদের বাক্যটি আর তোমাদের এ বাক্যটির মাঝে তো কোনো ফারাক নেই। ঠিক আছে, আলী! আগের বাক্য মুছে ফেলো এবং লিখো, বিসমিকাল্লাহুম্মা। আলী (রা.) তা-ই করলেন এবং অতঃপর তিনি লিখতে শুরু করলেন–

"এই সন্ধিচুক্তি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং মক্কার কাফির সরদারদের সাথে হচ্ছে।'

এবারও কাফির পক্ষের লোকটি আপত্তি জানালো। সে বলল, 'মুহাম্মদ শব্দের সাথে 'রাসূলুল্লাহ' আবার কেন? আমরা যদি মুহাম্মদকে আল্লাহর রাসূলই মানতাম, তবে তো আর কোনো ঝগড়াই থাকে না। সুতরাং 'মুহাম্মদ'এর সাথে 'রাসূলুল্লাহ' শব্দ থাকলে আমরা সন্ধিপত্রে দস্তখত করবো না। আপনি কেবল এভাবে লিখুন, 'মুহাম্মদ ইবনু আব্দুল্লাহর সঙ্গে কুরাইশ নেতাদের সন্ধিপত্র।'

আপত্তি শোনার পর রাসূল (সা.) আলী (রা.) কে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'ঠিক আছে আলী! তোমরা তো আমাকে রাসূল হিসাবে স্বীকার করোই, তাই আমার নামের সঙ্গে 'রাসূলুল্লাহ' লিখতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। 'রাসূলুল্লাহ' শব্দটি মুছে দাও। তদস্থলে লিখো, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ।'

হযরত আলী (রা.) হুযূর (সা.) এর প্রথমোক্ত কথাটি তো মেনে নিয়েছিলেন এবং বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম মুছে দিয়ে 'বিসমিকাল্লাহুম্মা' লিখেছিলেন। কিন্তু যখন রাসূল (সা.) বললেন, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর স্থলে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ লিখো, তখন তিনি মনের অজান্তেই তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, وَاللّٰهِ لَا أَمْحُوْهُ 'আল্লাহর কসম' আমি 'রাসূলুল্লাহ' শব্দটি মুছবো না।' হযরত আলী (রা.) এভাবে মহানবীর নির্দেশকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অস্বীকার করে দিলেন। হুযূর (সা.)ও তখন আলী (রা.) এর আবেগ বুঝতে পেরেছেন। তাই তিনি বললেন, ঠিক আছে, তুমি মুছো না বরং আমি নিজ হাতে মুছে দিচ্ছি।' এই বলে তিনি নিজের পবিত্র হাতে সন্ধিপত্র থেকে রাসূলুল্লাহ শব্দটি মুছে দিলেন। [মুসলিম শরীফ, বাবু সুলহিল হুদায়বিয়া, হাদীস নং- ৬১৩৩]

নির্দেশ পালন করা যদি সাধ্যের বাইরে চলে যায়

এখানেও কেমন যেন হযরত আলী (রা) রাসূল (সা.) এর নির্দেশকে অগ্রাহ্য করলেন। দৃশ্যত মনে হয় নির্দেশের চেয়েও তিনি আদবের গুরুত্ব দিলেন বেশি। অথচ আদবের চাইতে আদেশের মর্যাদা অধিক। তাই বিষয়টি অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বোঝা প্রয়োজন। মূলত বড়দের কথা মেনে নেয়াই স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে মানুষ আবেগের কাছে হার মানতে বাধ্য হয়। তখন নির্দেশ মানাটা সাধ্যের বাইরে চলে যায়। আদেশ মেনে নেয়ার মত অবস্থা তখন তার থাকে না। তখন নির্দেশ পালনে অযত্ন দেখালে বলা যাবে না, সে নাফরমানি করেছে। প্রকৃতপক্ষে তখন সে এ আয়াতটির প্রতিবিম্ব।

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا

আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কাজের ভার দেন না।'

প্রথম ঘটনাটি হযরত আবু বকর (রা.) নিজেই বলে দিয়েছিলেন, মহানবী (সা.) এর সামনে কুহাফার বেটা ইমামতি করবে, এ কখনো সম্ভব নয়। আর দ্বিতীয় ঘটনাটিতে আলী (রা.) তখন মহানবী (সা.) এর প্রেমে মাতোয়ারা ছিলেন। তাই 'মুহাম্মদ' নাম থেকে রাসূলুল্লাহ শব্দটি মুছে দেয়ার মতো সাধ্য তার ছিলো না। ভালোবাসার আতিশয্যে তিনি আত্মনিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়েছিলেন বিধায় মুছে দিতে অস্বীকার করে ফেললেন।

বন্ধু যেমন রাখেন তেমনই উত্তম

সর্বোপরি স্বাভাবিক বিধান এটাই যে, প্রিয়তম যা বলেন তাই শুনবে, যেভাবে চলতে বলেন সেভাবেই চলবে।

نہ ہی ہجر اچھا نہ ہی وصال اچھا ہے ☆ یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے

عشق تسلیم و رضا کے ماسوا کچھ بھی نہیں ☆ وہ وفا سے خوش نہ ہوں تو پھر وفا کچھ بھی نہیں

বিরহ আর মিলন কোনোটাই ভালো না। বন্ধু যেমন রাখতে চায় সেটাই সর্বোত্তম।

যদি তিনি চান আদব পরিপন্থী কাজ করতে, তাহলে মনে সায় না দিলেও সেটাই উত্তম। কারণ, এর মাঝেই বন্ধুর খুশি ও সন্তুষ্টি নিহিত।

সারকথা

ইমাম নববী (রহ.) হাদীসটি এজন্য উল্লেখ করেছিলেন, তিনি বলতে চাচ্ছেন, ঝগড়া-ফ্যাসাদ মিটানোর বিষয়টি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, যার কারণে মহানবী (সা.) নামাযের নির্দিষ্ট সময়ও মসজিদে পৌছতে পারেননি। মীমাংসা করতে গিয়ে তাঁর খানিকটা বিলম্ব হয়ে গেছে। অথচ আমরা আজ ঝগড়া-ফ্যাসাদে জড়িয়ে গেছি।

আল্লাহ আমাদেরকে পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ করা থেকে হেফাযত রাখুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

ব্যবসায় দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ই রয়েছে

“ইচ্ছা করলে আমরা এ ব্যবসার মাধ্যমে জান্নাতে পৌঁছার পথ তৈরী করতে পারি। নবীদের সঙ্গে হাশর করার সৌভাগ্য গড়তে পারি। আর চাইলে আমরা একে জাহান্নামের মাধ্যমও বানাতে পারি। পাপিষ্ঠদের সঙ্গে হাশর করার দুর্ভাগ্যও অর্জন করতে পারি। উভয়টিই আমাদের পক্ষে সম্ভব। দেখার বিষয় হলো, আমরা কোনটি গ্রহণ করছি, আর কোনটি বর্জন করছি।”

ব্যবসায় দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ই রয়েছে

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا ـ اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ ـ (سورة التوبة ١١٩)

وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ (ترمذى، كتاب البيوع، باب ماجاء فى التجارة ١٢٠٩) اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِىُّ الْكَرِيْمُ ـ وَنَحْنُ عَلٰى ذَالِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

মুসলিম জীবনের ভিত্তিপ্রস্তর

সম্মানিত সুধীবৃন্দ! ইতিপূর্বেও আমানুল্লাহ ভাইয়ের দাওয়াতে আমি এখানে এসেছিলাম। তাঁর এবং অন্যান্য বন্ধুবর্গের ভালোবাসার নির্দশন এই যে, তাঁরা পুনরায় এরূপ আরেকটি সেমিনারের আয়োজন করেছেন। আমার ধারণা ছিলো, পূর্বের ন্যায় কিছু প্রশ্ন আমার কাছে করা হবে আর আমি আমার অসম্পূর্ণ

জ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে উত্তর দেয়ার চেষ্টা করবো। কোনো বয়ান বা আলোচনা করার মানসিকতা আমার ছিলো না। কিন্তু ভাই সাহেব বললেন, শুরুতে দ্বীন, ঈমান ও ইয়াক্বীনের কিছু কথা হয়ে যাক; আর দ্বীনের কথা বলতে অস্বীকার তো করা যায় না। কারণ, দ্বীন তো হচ্ছে একজন মুসলমানের জন্য জীবনের ভিত্তিপ্রস্তরস্বরূপ। মহান আল্লাহ আমাদেরকে ভিত্তি প্রস্তরটি শক্তভাবে স্থাপন করার তাওফীক দিন। আমীন।

আম্বিয়ায়ে কেরামের সাথে ব্যবসায়ীদের হাশর

এই সেমিনারে উপস্থিত সুধীবৃন্দের অধিকাংশের সম্পর্ক যেহেতু ব্যবসার সাথে, তাই উপস্থিত দু'টি হাদীস আমার মনের মাঝে উদিত হলো। কুরআন মজীদের একটি আয়াতও আমি তেলাওয়াত করেছি। যে আয়াতটির মাধ্যমে উপরিউক্ত হাদীস দু'টি হৃদয়ঙ্গম করতে আরো সহজ হবে। দৃশ্যত হাদীস দু'টির মাঝে বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। বস্তুত বিষয়টি এমন নয়। প্রথম হাদীসটিতে নবী কারীম (সা.) বলেছেন–

اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ

যে ব্যবসায়ী ব্যাবসায় সততা ও বিশ্বস্ততার প্রতি যত্নবান হয়, কিয়ামতের দিন সে নবীগণ, সিদ্দীকগণ ও শহীদগণের সাথে থাকবে।

এই সেই ব্যবসা, যে ব্যবসাকে আমরা দুনিয়াবি কাজ মনে করি, যার সম্পর্কে আমাদের ধারণা, এ ব্যবসা আমরা পেটের দায়ে করছি। দ্বীনের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। অথচ নবী কারীম (সা.) বলেছেন– ব্যবসায়ীর মাঝে দুটি গুণ তথা সততা ও বিশ্বস্ততা থাকলে সে আম্বিয়া ও শহীদদের সাথে হাশর করবে।

ব্যবসায়ীদের হাশর পাপিষ্টদের সাথে

অন্য হাদীসে বাহ্যত এর বিপরীত কথা উচ্চারিত হয়েছে। তা হলো–

اَلتُّجَّارُ يُحْشَرُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا اِلَّا مَنِ اتَّقٰى وَبَرَّ وَصَدَقَ

'ব্যবসায়ীদের কিয়ামতের দিন পাপিষ্ঠ করে উঠানো হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি মুত্তাকী, আল্লাহভীরু ও সৎ সে ছাড়া।'

ব্যবসায়ীদের দুটি শ্রেণী

উপরিউক্ত এ দুটি হাদীস পরস্পর বিরোধী মনে হয়। কারণ, প্রথম হাদীসটিতে বলা হয়েছে– ব্যবসায়ীদের হাশর নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের সাথে হবে। আর দ্বিতীয় হাদীসটিতে বলা হয়েছে– তাদেরকে পাপিষ্ঠদের সাথে হাশর করানো হবে। হাদীস দুটির শাব্দিক অর্থ দেখে পরস্পর বিরোধী মনে করা স্বাভাবিক। বাস্তবে কিন্তু হাদীস দুটির মাঝে কোনো বিরোধ নেই। বরং এ হাদীস দুটির মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের দুভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এক. আম্বিয়া, সিদ্দীক ও শহীদগণের সাথে হাশর হবে এমন ব্যবসায়ী। দুই. পাপিষ্ঠদের সাথে হাশর হবে এমন ব্যবসায়ী।

এ দুটি শ্রেণীর মাঝে যেসব শর্ত দ্বারা পার্থক্য করা হয়েছে, তা হচ্ছে– সততা, বিশ্বস্ততা, তাক্বওয়া ও ন্যায়পরায়ণতা। এসব শর্ত পাওয়া গেলে প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। আর যার মাঝে শর্তগুলো পাওয়া যাবে না, সে শুধু টাকা কামানোর উদ্দেশ্যেই ব্যবসা করে। যার শুধু টাকা চাই– যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে চাই। হোক না তা অন্যের পকেট কেটে, ধোঁকাবাজি করে, মিথ্যা বলে, প্রতারণা করে। তার প্রয়োজন শুধু টাকা। তাহলে এমন ব্যবসায়ী দ্বিতীয় শ্রেণীর শামিল হবে। তার হাশর হবে ফাসিকদের সাথে।

ব্যবসা বেহেশতের কারণ নাকি দোযখের কারণ

হাদীস দুটোকে মিলিয়ে দেখলে আমাদের ব্যবসার পরিণাম কি তা স্পষ্ট হয়ে যাবে। আমরা চাইলে এ ব্যবসার মাধ্যমে জান্নাতে পৌছার পথ তৈরি করতে পারি। নবীদের সাথে হাশর করার সৌভাগ্য গড়তে পারি। আর চাইলে জাহান্নামের মাধ্যমও বানাতে পারি, পাপিষ্ঠদের সাথে হাশর করার দুর্ভাগ্যও অর্জন করতে পারি। উভয়টিই সম্ভব। আল্লাহ তা'আলা দ্বিতীয় পরিণাম থেকে আমাদের হেফাযত করুন। আমীন।

প্রত্যেক কাজের এপিঠ ও ওপিঠ

কথাটি শুধু ব্যবসার সাথে খাছ নয়; বরং দুনিয়ার সকল কাজের ক্ষেত্রে এই একই কথা প্রযোজ্য। চাকুরি, ব্যবসা, কৃষি কিংবা দুনিয়ার অন্য যে কাজই হোক না কেন, সকল ক্ষেত্রে উক্ত কথাটি প্রযোজ্য। পার্থিব প্রতিটি কাজ এক দৃষ্টিতে দুনিয়া, অন্য দৃষ্টিকোণে দ্বীন।

দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করুন

এই দ্বীন মূলত দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের নাম। যে কাজটি বাহ্যত নির্ভেজাল দুনিয়াবি বিষয় মনে হয়, সে কাজটিকেই যদি আপনি অন্য দৃষ্টিতে করেন; অন্য নিয়ত কিংবা অন্য খেয়ালে করেন, দৃষ্টিভঙ্গির মাঝে যদি পরিবর্তন আনেন, তাহলে নির্ভেজাল এ দুনিয়াবি কাজটিই দ্বীনে পরিণত হবে।

পানাহার করা একটি ইবাদত

মানুষ পানাহার করে বাহ্যত ক্ষুধা নিবারণের জন্য। কিন্তু পানাহারের সময় যদি নিয়ত করা হয়; আমার নফসের হক, আমার শরীরের হক, আমার অস্তিত্বের হক আদায় করার লক্ষ্যে আমি পানাহার করি এবং এটা আল্লাহ প্রদত্ত একটি নিয়ামত, আর এই নিয়ামতের হক হলো, আমি আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করবো। তাহলে এই পানাহার যা বাহ্যত মজা লাভ ও ক্ষুধা নিবারণের মাধ্যম ছিলো তা দ্বীন ও ইবাদতে পরিণত হবে।

হযরত আইয়ুব (আ.) এবং স্বর্ণের প্রজাপতি

মানুষ মনে করে, দ্বীন মানে দুনিয়া ছেড়ে দিয়ে নির্জনে বসে যাওয়া এবং আল্লাহ আল্লাহ করা। ব্যস, এটাই হলো দ্বীন। হযরত আইয়ুব (আ.) এর নাম তো অবশ্যই শুনেছেন। ঈমানের কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ একজন জলীলুল কদর নবী। তাঁর সম্পর্কে একটি ঘটনা সহীহ বুখারী শরীফে উল্লেখ রয়েছে– নবী কারীম (সা.) বলেছেন– একবার হযরত আইয়ুব (আ.)গোসল করছিলেন, তখন আসমান থেকে স্বর্ণ প্রজাপতির বৃষ্টি হচ্ছিল। তিনি গোসল ছেড়ে তা কুড়াতে লাগলেন। আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস করলেন, হে আইয়ুব, আমি কি তোমাকে ইতিপূর্বে অসংখ্য নেয়ামত দান করিনি? তোমার প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা কি করি নি? এরপরও কি তোমার লোভ রয়ে গেলো? প্রয়োজন হলো স্বর্ণ কুড়ানোর? উত্তরে হযরত আইয়ুব (আ.) বিস্ময়কর কথা বললেন–

لَا غِنَىٰ بِيْ عَنْ بَرَكَتِكَ

প্রভু হে! আপনি যখন আমার উপর নেয়ামত অবতীর্ণ করেছেন, তখন আমি তার প্রতি অনীহা প্রকাশ করা শিষ্টাচার পরিপন্থী।' এখন যদি আমি হাত গুটিয়ে বসে থাকি আর বলি, আমার তো স্বর্ণ-রৌপ্যের কোনো প্রয়োজন নেই, আপনি

কেন তা পাঠালেন? তাহলে তো বেয়াদবী হয়ে যাবে। আপনি যখন আমাকে নিজ করুণায় স্বর্ণ-রৌপ্য দান করেছেন, তখন আমার কর্তব্য হলো, আমি তা আগ্রহের সাথে গ্রহণ করবো এবং তার সঠিক মূল্যায়ন করবো আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো। তাই আপনার পাঠানো নেয়ামত আগ্রহের সাথে জমা করছিলাম।

এটি ছিলো একজন নবীর জন্য এক কঠিন পরীক্ষা। আমাদের মতো কোনো নিরামিশ দরবেশ হলে তো বলতো- এসব স্বর্ণ রৌপ্যের আমার প্রয়োজন নেই। আমি তো এই দুনিয়াকে লাথি মারি। কিন্তু এর বিপরীতে হযরত আইয়্যূব (আ.) যেহেতু দ্বীনের হাকীকত বুঝতেন, তিনি জানতেন, এ জিনিসটিই যদি আমি এ দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রহণ করি যে, এটি আমার প্রভুর দেয়া একটি নেয়ামত, আমি তার কদর করবো, তার শোকর আদায় করবো। ফলে এটি আর দুনিয়াবী কোনো ব্যাপার থাকবে না। এটিও দ্বীনের কাজ হয়ে যাবে। [বুখারী শরীফ গোসল অধ্যায় হাদীস নং-২৬৭]

দৃষ্টি থাকবে নেয়ামত দানকারীর প্রতি

আমরা পাঁচ ভাই ছিলাম। রীতিমতো চাকরি বাকরি করতাম। কখনো কখনো ঈদ ইত্যাদি উপলক্ষে মিলিত হতাম। তখন আব্বাজান আমাদেরকে ঈদের হাদিয়া দিতেন। সে হাদিয়া কখনো বিশ টাকা, কখনো পঁচিশ টাকা, কখনো ত্রিশ টাকা হতো। আমার স্মরণ আছে, আব্বাজান যখন পঁচিশ টাকা দিতেন, আমরা বলতাম, না, হবেনা। আমাকে ত্রিশ টাকা দিতে হবে। এভাবে ত্রিশ টাকা দিলে বলতাম, পঁয়ত্রিশ টাকা লাগবে। সম্ভবত আমাদের মতো প্রত্যেক পরিবারেই এমন হয়ে থাকে। সন্তান বড় হয়ে কামাই করলেও পিতার কাছে এরূপ মুহূর্তে এমনই করে থাকে। আব্বাজানের কাছ থেকে আমরা যে টাকা পেতাম, তা যদিও নিতান্ত কম ছিলো, কিন্তু যেহেতু আব্বার হাত থেকে নিচ্ছি, তাই তার প্রতি অন্যরকম এক আগ্রহ আমাদের ছিলো। অন্যথায় আমরা সকলেই তো তখন হাজার হাজার টাকা উপার্জন করতাম। মূলত ত্রিশ টাকার প্রতি আমাদের দৃষ্টি ছিল না। দৃষ্টি তো ছিল যিনি দিচ্ছেন তাঁর বরকতময় হাতের প্রতি। এটা তো ছিলো একজন পিতার তাঁর সন্তানদের প্রতি নিখাদ ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। তাই শিষ্টাচার হচ্ছে, তা নেয়ামত ভেবে আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করা এবং তার যথাযথ মূল্যায়ন করা। আর আমরাও তাই

আব্বাজানের হাতের টাকা ইনভেলাপের ভেতর যত্নের সাথে রেখে দিতাম। অথচ এই ত্রিশ টাকাই যদি অন্য কেউ দেয় এবং তার সাথে পীড়াপিড়ি করা হয় যে, আমাকে পঁয়ত্রিশ টাকা দিতে হবে, তাহলে তখন তা শিষ্টাচার পরিপন্থী হবে।

একেই বলে তাক্বওয়া

দ্বীন দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের নাম। দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনই কুরআনের পরিভাষায় তাক্বওয়া। অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনে আমি যা কিছু করছি– সবই আল্লাহর জন্যই করছি। আমার পানাহার, ঘুম, ওঠা-বসা, আয়-উপার্জন সবকিছু তাঁরই জন্য। তাঁরই নির্দেশমাফিক করছি। তাঁর হুকুম পালন করে তাঁর রেজামন্দি কামনা করছি। এভাবে এই দৌলত অর্জন করার নামই তাক্বওয়া। আপনার মাঝে যদি তাক্বওয়ার এই অনুভূতি সৃষ্টি হয়, তাহলে এই তাক্বওয়াভিত্তিক ব্যবসা আর দুনিয়াবি কোনো বিষয় হিসেবে গণ্য হবে না। বরং এটিও তখন দ্বীনই হবে। আর ব্যবসা তখন আপনাকে জান্নাতের উপযোগী করে তুলবে। নবীদের সাথে হাশর করার যোগ্যতা সৃষ্টি হবে।

সংসর্গে তাক্বওয়া অর্জিত হয়

মনে সাধারণত একটি প্রশ্ন জাগে, কিভাবে তাক্বওয়া হাসিল হয়, এ দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আসে কিভাবে? এর উত্তরের জন্য এ আয়াতটি তেলাওয়াত করেছিলাম–

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُو اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ

'হে ঈমানদারগণ! তাক্বওয়া অবলম্বন কর। আর কুরআন মজীদের মূলনীতি হলো, যখন কোনো কাজ করার আদেশ দেয়া হয়, তখন পাশাপাশি তার উপর আমল করার পদ্ধতিও বলে দেয়া হয় এবং এমন পদ্ধতি বলে দেয়া হয়, যা আমাদের জন্য সহজ। আর এটাই হলো আল্লাহ তা'আলার একান্ত করুণা। তিনি শুধু কাজের নির্দেশ দেন না; বরং আমাদের দুর্বলতার প্রতি লক্ষ্য করে সহজ পদ্ধতিও বলে দেন। তিনি 'তাক্বওয়া' হাসিল করার সহজ পদ্ধতি বলে দিয়েছেন كُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ সত্যবাদী মানুষের সোহবত বা সংসর্গ অবলম্বন করো। এই সোহবতের মাধ্যমে তোমার মাঝে তাক্বওয়া সৃষ্টি হবে। শুধু কিতাবে তাক্বওয়ার শর্তাবলী পড়ে তাক্বওয়া লাভ করা সম্ভব নয়। কুরআনে

তা অর্জনের সহজ পথ বলে দেয়া হয়েছে। যাকে আল্লাহ তাক্বওয়া দান করেছেন, তার সোহবত তথা সংসর্গ অর্জন করো। কারণ, সংসর্গের অনিবার্য ফলই হলো যার সংসর্গ নেয়া হয় তার রং ক্রমান্বয়ে সংসর্গ গ্রহণকারীর মাঝে চলে আসে।

হেদায়েতের জন্য শুধু কিতাব যথেষ্ট নয়

দ্বীন মেনে চলা ও বুঝার জন্য পথ এটিই। নবী কারীম (সা.) এ লক্ষ্যেই আগমন করেছেন। অন্যথায় শুধু কুরআন নাযিল করলেই তো যথেষ্ট হতো। মক্কার মুশরিকদেরও দাবি ছিলো– আমাদের কুরআন নাযিল হয় না কেন? মানুষ ঘুম থেকে জেগে উঠে খুব সুন্দর ঝকঝকে একটি কুরআন মাথার কাছে পেয়ে যাবে। আকাশ থেকে ধ্বনি আসবে এই কিতাব তোমাদের জন্য পাঠানো হয়েছে। এর উপর আমল করো।' এ কাজটি আল্লাহ তা'আলার জন্য মোটেই কঠিন ছিল না। অথচ তিনি কোনো কিতাবই রাসূল ছাড়া পাঠান নি। প্রত্যেক কিতাবের সাথেই তিনি রাসূলও পাঠিয়েছেন। রাসূল কিতাব ছাড়া এসেছেন; কিন্তু কিতাব রাসূল ছাড়া আসেনি। কারণ, মানুষের হেদায়েত ও প্রদর্শনের জন্য এবং তাদেরকে একটি বিশেষ আদর্শের উপর আনার জন্য কেবল কিতাব যথেষ্ট নয়।

শুধু বই পড়ে ডাক্তার হওয়ার পরিণাম

যদি কেউ চায়, আমি মেডিকেল সায়েন্সের বই পড়ে ডাক্তার হয়ে যাবো। তারপর যদি সে ওই বই পড়ে এবং বুঝে ডাক্তারী শুরু করে, তাহলে সে কবরস্তান ছাড়া কিছুই আবাদ করতে পারবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত সে কোনো ডাক্তারের সংসর্গ না নিবে এবং তার সাথে কিছুদিন প্র্যাকটিস না করবে, সে কখনো ডাক্তার হবে না।

যেমন বাজারে বিভিন্ন ধরনের রান্নার বই পাওয়া যায়। যাতে রান্না-বান্নার নিয়ম পদ্ধতি লিপিবদ্ধ আছে। বিরানী, কোরমা, পোলাও কিভাবে পাকাতে হবে– সবই লিখা আছে। যদি কোনো ব্যক্তি শুধু বই পড়ে কোরমা পাকাতে চায়,তাহলে আল্লাহই ভালো জানেন সে কী পাকাবে। কোনো অভিজ্ঞ বাবুর্চি থেকে প্রশিক্ষণ নেয়া ব্যতীত সে সুস্বাদু ও ভালো কোরমা পাকাতে পারবে না।

মুত্তাকীদের সংসর্গ অবলম্বন

দ্বীনের ব্যাপারটিও ঠিক এরকম। শুধু কিতাব মানুষকে ধর্মের রঙে রঙিন করতে পারবে না– যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো বুযুর্গের সোহবত তথা সংসর্গ লাভ না করবে। এজন্য আম্বিয়ায়ে কেরামকে পাঠানো হয়েছে। তারপর সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা হাসিল হয়েছে।

সাহাবী কাকে বলে? সাহাবীর পরিচয় হলো, যারা নবী কারীম (সা.) কে দেখেছেন এবং তাঁর সোহবত লাভে ধন্য হয়েছেন। সাহাবীদের অর্জনকৃত সবই নবী কারীম (সা.) এর সান্নিধ্য থেকে। তারপর তাবেয়ীনরা সাহাবীদের সান্নিধ্য থেকে এবং তাবে তাবেয়ীনরা তাবেয়ীনদের সান্নিধ্য থেকে অর্জন করেছেন। অতঃপর দ্বীনের যা কিছু আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে সোহবত তথা সান্নিধ্য ও সংসর্গের মাধ্যমেই পৌঁছেছে।

এই জন্যই মহান আল্লাহ তাক্বওয়া লাভের পন্থা বলে দিয়েছেন। তাক্বওয়া যদি লাভ করতে চাও সহজ পদ্ধতি হলো- কোনো বুযুর্গের সান্নিধ্য লাভ করো। পরিণামে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মাঝে তাক্বওয়া সৃষ্টি করে দিবেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে দ্বীনের তাৎপর্য বুঝে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

বিয়ের খুতবার তাৎপর্য

"অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে, যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ের অন্তরে আল্লাহ তা'আলার ভয় না থাকে, আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতার অনুভূতি যদি জাগরুক না থাকে, যদি এই উপলব্ধি না থাকে যে, আমাদের প্রতিটি কথা ও কাজের হিসাব পরিপূর্ণভাবে দিতে হবে, তাহলে বাস্তবতা হলো, পরস্পরের অধিকার অনাদায়ী থেকে যায়। তখন স্বামী স্ত্রীর অধিকার এবং স্ত্রী স্বামীর অধিকার আদায় করতে সক্ষম হয় না।"

বিয়ের খুতবার তাৎপর্য

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى - اَمَّا بَعْدُ

সম্মানিত সুধীবৃন্দ!

আল্লাহর ইচ্ছা হলে একটু পরেই আনন্দানুষ্ঠান শুরু হবে। যেখানে অনুষ্ঠানের বর-কনে মাসনূন বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হবে। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ সম্বন্ধকে বরকতময় করুন। আমীন।

বিয়ের অনুষ্ঠান

আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, বিয়ে পড়ানোর পূর্বে যেন কিছু কথাবার্তা আপনাদেরকে আরজ করি। যদিও বিয়ে-শাদির অনুষ্ঠানে ওয়াজ-নসীহত করা বর্তমান পরিবেশের সঙ্গে বেমানান; কিন্তু আয়োজকবৃন্দ যেহেতু আমাকে বলেছেন, অধিকাংশ উপস্থিত সুধীও চাচ্ছেন দ্বীনের কিছু কথা শুনতে, তাই নির্দেশ পালনার্থে আপনাদের খিদমতে কিছু কথা উপস্থাপন করতে চাই।

বিয়ের খুতবায় পঠিত তিনটি আয়াত

এখনই 'ইনশাআল্লাহ' বিয়ের খুতবা পড়া হবে। এ খুতবা নবী করীম (সা.) এর সুন্নাত। বিয়েও তাঁরই সুন্নাত। তিনি ইরশাদ করেন–

اَلنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِيْ (ابن ماجه - كتاب النكاح - رقم الحديث ١٨٥١)

বিয়ে আমার সুন্নাত। ইসলামের দৃষ্টিতে দুইজন স্বাক্ষীর উপস্থিতিতে 'ইজাব' ও 'কবূল' এর মাধ্যমে বিয়ে সম্পাদিত হয়ে যায়। কিন্তু রাসূল (সা.) বিয়ের সুন্নাত পদ্ধতি বাতলে দিয়েছেন এভাবে– ইজাব– কবূলের পূর্বে একটি খুতবা বলা হবে। খুতবাটি হবে আল্লাহ তা'আলার হাম্‌দ ও নবী কারীম (সা.)

এর দুরূদ সম্বলিত। আর সাধারণত নিম্নোক্ত তিনটি আয়াতও খুতবায়ে তেলাওয়াত করা হয়। বিয়ের ক্ষেত্রে এ তিনটি আয়াত তেলাওয়াত করার শিক্ষা দিয়েছেন রাসূল (সা.)। সর্বপ্রথম তেলাওয়াত করা হয় সূরা নিসার প্রথম আয়াতটি, যা নিম্নরূপ–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (سورة النساء ١)

"হে মানবসমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর তথা তাক্বওয়া অবলম্বন কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি (হযরত আদম (আ.) থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তাঁর থেকেই তার স্ত্রী (হাওয়া (আ.)কে সৃষ্টি করেছেন, আর তাদের দু'জন (আদম ও হাওয়া) থেকে বিস্তার করেছেন অগণিত পুরুষ ও নারী। (এ মহান দম্পতির আওলাদই গোটা দুনিয়া আবাদ করেছে) আর আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট (নিজের অধিকার) প্রার্থনা কর। (কারণ, কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তি থেকে নিজের অধিকার চাওয়ার সময় সাধারণত বলে থাকে, আল্লাহর ওয়াস্তে আমার হক দিয়ে দাও) এবং আত্মীয়-জ্ঞাতীদের (হকের) ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। (অর্থাৎ লক্ষ্য রাখবে, যেন আত্মীয়-স্বজনের হক নষ্ট না হয়) নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের (সকল কর্মকাণ্ডের) ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন। (তিনি তোমাদের সকল কথা ও কাজ পর্যবেক্ষণ করছেন।" [সূরা নিসা : আয়াত-১]

দ্বিতীয় পর্যায়ে পঠিত আয়াতটি হচ্ছে সূরা আলে-ইমরানের ১০২নং আয়াত যা নিম্নে প্রদত্ত হলো–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ (سوره العمران ١٠٢)

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে যেমনিভাবে ভয় করা উচিত ঠিক তেমনিভাবেই ভয় করতে থাক। এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। [সূরা আলে-ইমরান : আয়াত- ১০২]

তৃতীয় যে আয়াতটি রাসূল (সা.) বিয়ের খুতবায় তেলাওয়াত করার জন্য শিক্ষা দিয়েছেন, তা এই–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

(سورة الاحزاب ٧٠-٧١)

"হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক (সত্য) কথা বল। (যদি সত্য ও সঠিক কথা বলার অভ্যাস লাভ করতে পারো- তাহলে) তিনি তোমাদের আমল আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে।" [সূরা আল-আহযাব : আয়াত-৭০,৭১]

আয়াতত্রয়ে যে বিষয়টি অভিন্ন

আলোচ্য তিনটি আয়াত, যেগুলো বিয়ের খুতবায় তেলাওয়াত করার শিক্ষা মহানবী (সা.) দান করেছেন। যেগুলোর বক্তব্য একটি বিষয়ে এক ও অভিন্ন দেখা যায়। যে বিষয়টির নির্দেশ তিনটি আয়াতের প্রতিটিতেই দেয়া হয়েছে। বিষয়টি হলো তাকওয়া অবলম্বন করা। সব কটি আয়াতের শুরুতেই বলা হয়েছে, আল্লাহকে ভয় কর, তাকওয়া অবলম্বন কর। বিয়ের অনুষ্ঠানে তাকওয়ার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে এবং অত্যন্ত গুরুত্বসহকারেই দেয়া হচ্ছে। সবিশেষ বারবার বলা হচ্ছে এই তাকওয়ার কথা। এর কারণ কি? এমনিতে উভয় জাহানের সফলতার জন্য তাকওয়া পূর্বশর্ত, যে তাকওয়া ছাড়া মানুষ দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা অর্জন করতে পারে না।

তাকওয়া ব্যতীত অধিকার আদায় হয় না

কিন্তু বিশেষভাবে দাম্পত্যজীবন এমন এক বিষয়, যেখানে পদে পদে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মাঝে আল্লাহর ভয় থাকা জরুরী। অন্যথায় পারস্পরিক অধিকার ও বিয়ের বরকত অর্জিত হবে না। অভিজ্ঞতাই প্রমাণ, যদি দু'পক্ষের উভয়ের অন্তরে আল্লাহর ভয় না থাকে, জবাবদিহিতার অনুভূতি যদি জাগরুক না থাকে, যদি এই উপলব্ধি না থাকে যে, আমাদের প্রতিটি কথা ও কাজের হিসাব পরিপূর্ণভাবে দিতে হবে, তাহলে বাস্তবতা হলো, পরস্পরের অধিকার

ভূলুণ্ঠিত হবে। তখন স্বামী স্ত্রীর অধিকার, স্ত্রী স্বামীর অধিকার আদায় করতে সক্ষম হবে না। বন্ধু বন্ধুর অধিকার, স্বজন স্বজনের অধিকার আদায় করতে পারবে না। পারস্পরিক অধিকার রক্ষা করার একটাই পথ। তাহলো আল্লাহর ভয় অন্তরে জাগরুক রাখা, আল্লাহর দরবারে জবাবদিহিতার অনুভূতি থাকা। অন্যথায় কেবল সংবিধান রচনা করে আদালত ও বিচারের মাধ্যমে অধিকার আদায় করা যায় না। হকদাতার অন্তরে এ ভয় বিরাজমান থাকতে হবে যে, আমি অন্যের অধিকার মেরে হয়তো বিচার ও আদালতের কাঠগড়া থেকে রক্ষা পাব, কিন্তু আল্লাহর আদালত থেকে তো রেহাই পাবো না। আল্লাহ তা'আলার শাস্তি থেকে রেহাই পেতে হলে আমাকে আজ থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। এরূপ অনুভূতি যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তরে না আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত অন্যের অধিকার আদায়ের প্রশ্নই উঠে না।

এ তিনটি আয়াত তেলাওয়াত করা সুন্নাত

তাই নবী কারীম (সা.) বিশেষভাবে বিয়ের অনুষ্ঠানে এ তিনটি আয়াত পাঠ করার বিধান দিয়েছেন। এ তিনটি আয়াত নির্ধারণ করে সবিশেষ তাকওয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। তাছাড়া মানুষ এমনিতেই মুসলমান হওয়ার সময় আল্লাহর দরবারে তাকওয়ার প্রতিশ্রুতি দিতে হয়।

নবজীবনের সূচনা

বিয়ে জীবনের এক নতুন অধ্যায়, যার মাধ্যমে সূচনা লাভ করে এক নতুন জীবনের। জীবনের একটি পরিবর্তন আসছে। এই সময় তাকওয়ার অঙ্গীকার পুনরায় সতেজ করতে হয়, তাকে নবায়ন করতে হয়। এ তিনটি আয়াত পাঠ করার পেছনে মূলত রহস্য এটাই। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সঠিকভাবে বোঝার তাওফীক দান করুন। এই মুহূর্তে তাকওয়া অর্জনের ফিকির ও উদ্যমকে তেজোদীপ্ত করার তাওফীক দিন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ